অমরাবতী আসাম

বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯।

আমার

অসমীয়া বোন

শ্রীমতী প্রগতি শর্মা

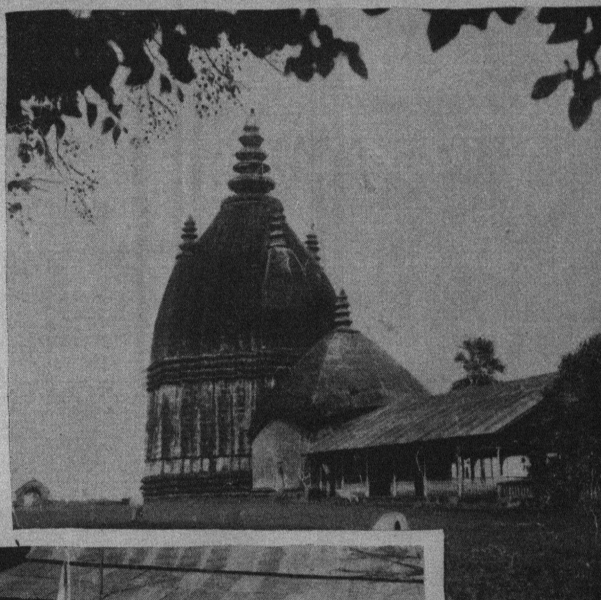
ও

আসামের বাঙালী ভাই

শ্রীমান প্রমথচন্দ্র ভাওয়াল-কে



আসামের
চা বাগান

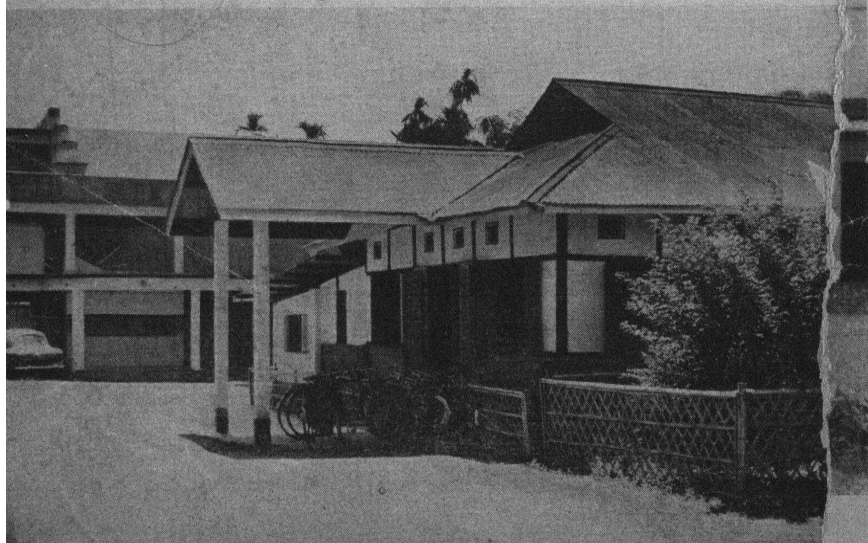


শিবদ'ল,
শিবসাগর



সাহিত্য
সম্মেলনের
উদ্বোধন,
জোড়হাট

কাজিরাঙা'র অরণ্যে ট্যুরিস্টদল ঃ সামনে অরণ্যবাসী গণ্ডার



বুড়ি গোহানী দেবালয়, জোড়হাট



তলাতল ঘৰ, শিবসাগৰ

নেঘেরীটিঙ শিবদ'ল

অমর শহীদ মণিরাম দেওয়ানের ফাঁসির স্থান, জোড়হাট

আসাম আমায় ডাকে।

এ আহ্বান রক্তের। কারণ আমার বাবা বহুদিন আসামে ছিলেন।

আসাম আমায় ডাকে।

এ আমন্ত্রণ অন্তরের। কাবণ আমার লেখার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে অসমীয়া ভাষায়।

আসাম আমায় ডাকে।

এ নিমন্ত্রণ হৃদয়েব। কারণ আসামের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে আমাব সবচেয়ে বেশি চিঠি আসে। তাঁবা অনেকেই আমাকে আসামে যাবার নিমন্ত্রণ করেন।

এই নিমন্ত্রণ প্রথম এসেছে জোড়হাটের মেয়ে শ্রীমতী প্রগতি শর্মার কাছ থেকে। তাব চিঠিখানি আমাকে অমবাবতী-আসামের প্রতি আরও বেশি অনুবক্ত করে তুলেছে। সে লিখেছে—

'আমি আসামের একটি মেয়ে। অপবিচিতা হয়েও আপনাকে চিঠি লিখতে সাহস করেছি, আপনাব বইগুলির মধ্যে চিত্রিত হয়ে আপনার সুন্দব মনের পরিচয় পেয়েই।

বাংলা আমি পড়তে পারি কিন্তু লিখতে তেমন জানি না। লেখা ভুল হলে ক্ষমা করবেন।...

আপনার বই পড়ে হিমালয় আরু ব্রজমণ্ডলের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব কবি। অবশ্য জানি, ভারতের মেয়ে হয়েও হয়তো কোনদিন হিমালয় আরু ব্রজ-পরিক্রমায় যেতে পারব না। তবু আপনার বই পড়ে দূর হইতে হিমালয়ের রূপসুধা আর ব্রজের অমৃত পান করে আনন্দ লাভ করতে বাধা কি?

একবার আসামে আসেন! আপনি সৌন্দর্যের পূজারী সবার অনাদরে আসামের বুকে আত্মগোপন করে থাকা সৌন্দর্য আপনি চোখ মেলে দেখে যান।

তাই এবারে যখন আসাম থেকে ডাক এলো, তখন আর সাড়া না দিয়ে পারলাম না। তবে এই সাড়া দেবার পেছনে ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। দমদম থেকে প্লেন ছাড়ার পরেই সেই ইতিহাসটুকু মনে পড়ছে আমার।

আমি আজ সত্যই আসামে চলেছি। ঘণ্টা দুয়েক পরে এই 'প্রপেলার' চালিত 'ফকার ফ্রেণ্ড্‌শিপ' বিমানখানি আমাকে আসামের মাটিতে নামিয়ে দেবে।

কিন্তু তার আগে সেই ইতিহাসটুকু স্মরণ করা যাক্। গত ডিসেম্বরে (১৯৫৫) নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শরৎতীর্থ ভাগলপুরে। সম্মেলনের সেই আটচল্লিশতম অধিবেশনটি শরৎ-জন্মশত-বার্ষিকী উৎসব রূপে পালিত হয়েছে।

সভার প্রতি আমার অনাস্থা আজন্মের। তবু অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীবিনয় মাহাতোর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমাকে সাহিত্যিকদের সঙ্গে যেতে হয়েছিল ভাগলপুরে। আর সেখানেই আলাপ করেছিলেন ওরা—আসামের প্রতিনিধিরা।

কথায় কথায় সেদিন ওঁদের বলেছিলাম—আসামের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সঙ্গে সঙ্গে জনৈক সপ্রতিভ তরুণ দাবী করেছে—তাহলে সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করুন।

—বেশ, করব। বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছিল আমাকে।

—একবার আসামে আসুন। দেখতে পাবেন, কত মানুষ ভালোবাসেন আপনাকে। একটি মেয়ে মাঝখান থেকে বলে উঠেছিল।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছি।

তারপরেই জনৈক প্রতিনিধি প্রস্তাব রেখেছেন—আগামী এপ্রিল মাসে

জোড়হাটে আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিক রাজ্য সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে-সময় কিন্তু আপনাকে আসামে আসতেই হবে।

তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করেছি—আসামে নিশ্চয়ই যাবো, কিন্তু সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে নয়। আমি সাহিত্যিক নই, একজন নিতান্ত নগণ্য লেখক মাত্র।

—আপনাকে যে সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষেই আসতে হবে।

—কেন বলুন তো?

—রেলে যেতে হলে আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আপনাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে প্লেনে। কোনো সম্মেলন ছাড়া তো আমরা সে ব্যয়ভাব বহন করতে পারব না দাদা!

সুতরাং আব কোনো আপত্তি করতে পারি নি। চুপ করে রয়েছি। ওঁদের একজন ডায়েরী খুলে আমার ঠিকানা লিখে নিয়েছেন। তারপরে কিছু মামুলি কথাবার্তার পরে ভাগলপুরে সেই শীতের রাতে আমি বিদায় নিয়েছিলাম আসামের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। এবং যথারীতি তাঁদের কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম।

কিন্তু আসামের মানুষ বিস্মৃত হন নি আমাকে। দিন দশেক আগে হঠাৎ একখানি চিঠি এসে হাজির হল—

> '…আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনি ভাগলপুরে আমাদের বলেছিলেন যে আসাম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করবেন। সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১৭।১৮-ই এপ্রিল, জোড়হাট শহরে।…
>
> পত্রপাঠ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরই সঙ্গে চলে আসুন।…আপনার উপস্থিতি আমাদের চরম আশা।…
>
> শ্রদ্ধাবনতঃ
>
> প্রমথ ভাওয়াল।

এর ঠিক চারদিন পরে টেলিগ্রাম এসেছে—

"...Pray reach Jorhat sixteenth April......

Subodh Bhowmik"

তাই আজ আমি আসামে চলেছি। তিরিশ বছর আগে প্রথম বাংলার বাইরে গিয়েছি, পঁচিশ বছর আগে প্রথম হিমালয় দর্শন করেছি। দার্জিলিং থেকে কাশ্মীর, ওয়ালটেয়ার থেকে ওখা পর্যন্ত—ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। বালুকাময় রাজস্থানের মরু-ভূমি থেকে উনিশ হাজার ফুট উঁচু তুষারাবৃত হিমবাহে পদচারণা করেছি। কিন্তু আমার পিতার কর্মভূমি ও প্রমথেশ বরুয়ার জন্মভূমি প্রতিবেশী রাজ্য আসামে যাই নি কখনও। গিরিতীর্থ গোমুখীতে চোদ্দটি রাত কাটিয়েছি কিন্তু কামাখ্যা দর্শন করি নি। আমি সৌভাগ্য-বান, এবারে মা-কামাখ্যা কাছে টেনেছেন আমাকে। আমি আজ সত্যই আসামে চলেছি।

হ্যাঁ, দক্ষিণাদাও চলেছেন এই একই বিমানে। চলেছেন কবি ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও গায়ক শ্রীসুনীল ঘোষ। তবে তাঁরা আমার পাশে বসেন নি। তাঁরা জায়গা পেয়েছেন সামনের দিকে আর আমার ঠাঁই হয়েছে একেবারে শেষ সারিতে। কারণ আমি সবার আগে এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করেছি, আর ওঁরা 'সিকিউরিটি কন্ট্রোল'-য়ে ঢুকেছেন সবার শেষে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বিমানদস্যুদের সেই ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানটি লাহোরে নিয়ে যাওয়া এবং ধ্বংস করে ফেলবার পর থেকেই ভারতের সমস্ত বিমানবন্দরে এই খানাতল্লাসীর নিয়ম চালু হয়েছে।

যাক্ গে, যে-কথা বলছিলাম। একসময়ে না আসায় আমরা এক-সঙ্গে বসতে পারি নি। দক্ষিণাদারা রয়েছেন সামনে, আমি পেছনে। আধুনিকতার বিচারে আমাদের এই ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানটিকে পৌরাণিক বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি এটি প্রপেলার চালিত অর্থাৎ জেট বিমান নয়। আকারেও ছোট। মাঝখানে কার্পেট পাতা

প্যাসেজ। দু-পাশে এক-এক সারিতে দুটি করে চারটি সিট। সবসুদ্ধ দশ সারি অর্থাৎ চল্লিশটি সিট আছে।

পথে আর কোনো বিমানবন্দরে নামতে হবে না আমাদের! আমরা সরাসরি জোড়হাট অর্থাৎ রোরিয়া বিমানবন্দরে পৌঁছব। রানওয়ে ছোট বলে সেখানে জেট অর্থাৎ বোয়িং ৭০৭ নামতে পারে না। পারলে প্রায় অর্ধেক সময়ে অর্থাৎ এক ঘণ্টায় পৌঁছে যেতাম গন্তব্যস্থলে।

আমাদের লাগবে দু-ঘণ্টা। তাব মানে, আর মাত্র ঘণ্টা দুয়েক পরেই আমি আসামের মাটি স্পর্শ করব। বিমানবন্দরেই দেখা হবে প্রগতির সঙ্গে। আমি যে তাকে চিঠি লিখে দিয়েছি। বিমানবন্দর শহর থেকে ৩ মাইল। সে বোধহয় এতক্ষণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

ভাবতে অবাক লাগছে, যে জোড়হাট থেকে সে আমাকে আসামে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সেই জোড়হাটেই সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবং কিছুক্ষণ পরেই প্রগতির সঙ্গে দেখা হবে আমার। সত্যি কথা বলতে কি গত কয়েকদিন ধরেই আমি সেই সুন্দর মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু কেন? কেন আমার এই আকুলতা? সে তো আমার কেউ নয়। তার সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্বন্ধ নেই। সে যে-দেশে জন্মেছে, আমি এখনও সে-দেশ দেখি নি। সে যে-ভাষায় কথা বলে, আমি সে-ভাষা জানি না। তবু একি আশ্চর্য আকর্ষণ!

প্রগতির ভাবনায় ছেদ পড়ে। এয়ার হোস্টেস্ কফি নিয়ে এসেছেন। আমাদের দু-জন এয়ার হোস্টেস্ অবাঙালী। মুখের আদল দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ী মেয়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শুনে তাঁদের নিবাস অনুমান করতে পারছি না।

তাঁরা প্রথমে খবরের কাগজ ও তারপরে চকোলেট পরিবেশন করেছিলেন। এবারে কফি ও বিস্কুট নিয়ে এসেছেন। কফির কাপে চুমুক দিয়ে বাইরে তাকাই। নিচের জগৎকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যাবেই তো, ফক্কার ফ্রেণ্ড্‌শিপ যে সাধারণত পাঁচ/ছ' হাজার ফুট ওপর দিয়ে

যায়। বোয়িং হলে এত ভালো দেখা যেতো না। বোয়িং যায় প্রায় তিরিশ/চল্লিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে।

এখন একটা বেশ বড় নদীর ওপর দিয়ে বিমান যাচ্ছে। নদীটা বহুধারায় বিভক্ত। ধারাগুলির মাঝে-মাঝে সাদা-সাদা চড়া। আর নদীর উপত্যকায় সবুজ ক্ষেত-খামার ও গাছপালা। পথ আর বাড়ি-ঘরও দেখতে পাচ্ছি। পথগুলো ভারী সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে বিরাট বিরাট কালো কয়েকটা সরীসৃপ এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে।

এয়ার হোস্টেস্‌দ্বয়ের আসা-যাওয়া ছাড়া বিমানে আর কোনো চলা-ফেরা নেই। মনে হচ্ছে স্থির ও অকম্প একখানি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঝক্‌-ঝকে কামরায় চল্লিশটি মানুষ চুপচাপ বসে আছি। শুধু একটানা একটা গোঁগোঁ শব্দ ছাড়া এখানে আর যেন জীবনের কোনো সাড়া নেই। প্রায় সবাই সীটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। কেউ জেগে আছেন, কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেউ বই পড়ছেন, কেউ বা পাশের যাত্রীর সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে কথা বলছেন। কিন্তু সে কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে না।

আমার পাশের সীটের ভদ্রলোক আজই সকালের বিমানে দিল্লী থেকে দমদম এসেছেন। তিনি ট্রান্সপোর্টের কারবার করেন। সেই সূত্রে শিব-সাগর চলেছেন। আমার চেহারা ও পোশাক দেখে ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছেন, আমি কোনো চা-বাগানের বড়বাবু নই। তবে এতগুলো টাকা ভাড়া দিয়ে যখন বিমানে বসেছি, তখন নিশ্চয়ই আমারও জোড়হাটে কোনো কারবার আছে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য···'।

সবিনয়ে বলি—আজ্ঞে না, আমার কোনো ব্যবসা-পত্তর নেই।

—তাহলে ?

—একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

এবারে তাঁর বিস্মিত হবার পালা। এই চেহারা ও পোশাক নিয়ে কেউ এতটাকা খরচ করে বেড়াতে যেতে পারে, একথা তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো বা করলেনও না।

কিন্তু আমি চুপ করে থাকি।

সামনের ডানদিকের সীটে যুবতী বউটি তার মাথার ওপরে এয়ার-কুলার বন্ধ করে দিচ্ছেন। ওঁর কোলের বাচ্চাটির বোধহয় শীত লাগছে। একজন এয়ার হোস্টেস্ ছুটে এলেন তাঁর কাছে। ওপরের বাঙ্ক থেকে একখানি কম্বল বের করে বাচ্চাটাকে ঢেকে দিলেন।

আমিও উঠে দাঁড়াই। 'নব' ঘুরিয়ে আমার এয়ার-কুলারটা বন্ধ করে দিই। এতে কারও কিছু মনে করার নেই। কারণ প্রত্যেকের আলাদা এয়ার-কুলার।

আবার বাইরে তাকাই। নিচে সাদা মেঘের প্রলেপ আর ওপরে নীল আকাশ। মেঘের ওপর দিয়ে চলেছি। আমি মেঘনাদ।

আরও উঁচুতে উঠে এসেছি বলেই বোধহয় মাটির জগতে রঙের সংখ্যা কমে এসেছে। বাড়ি-ঘর ও মাঠ-ময়দানের মোটামুটি একই রঙ—ধূসর সবুজ। কেবল বড় বড় গাছগুলিকে ঘন-সবুজ দেখাচ্ছে। ছোট নদী ও বড় রাস্তাকে অনেকটা একই রকমের আঁকাবাঁকা রেখা বলে মনে হচ্ছে। তবে তাদের রঙ আলাদা— নদী সাদা আর রাস্তা কালো।

আমি বসেছি বাঁদিকে। জানলা দিয়ে 'পোর্ট-উইং'-টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওটাও স্থির হয়ে আছে। কেবল বিমানের দিক পরিবর্তনের সময় একটু উঁচু-নিচু হচ্ছে মাত্র। তখন অবশ্য বিমানটাও নড়ে উঠছে। তবে পায়লট বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দিচ্ছেন না। অর্থাৎ সামনে 'Fasten Seat Belt' লেখা লাল আলোটা জ্বলে উঠছে না। কিংবা মাইকে এয়ার-হোস্টেস্ বেল্ট বাঁধতে বলছেন না।

এয়ার হোস্টেস্‌রা একেবারে সামনের সারিতে দুটি সীটে বসে আছেন। 'ক্রু কেবিন' বা 'কক্‌পিটের' দরজাটা খোলাই রয়েছে। ক্যাপ্টেন অর্থাৎ যে যন্ত্রবিদের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার ওপরে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি প্রাণ নির্ভরশীল, তাঁর মুখ না দেখতে পেলেও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। তিনি স্থির ও অবিচল চিত্তে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন।

নিচে আবার একটা বড় নদী। তারই সুপ্রশস্ত উপত্যকার ওপর দিয়ে

চলেছি আমরা। এ নদীটাও আগের বড় নদীর মতই বহুধারায় বিভক্ত। তার উপত্যকার বুকে কোথাও সাদা চড়া, কোথাও বা সবুজ বনানী। নদীর জলকে এখান থেকে লালচে মনে হচ্ছে। তাই হবে। ব্রহ্মপুত্রের আরেক নাম 'রেড রিভার'।

এখন নদীর তীরে বড় একটা শহর। বাড়ি-ঘর গাছপালা, পথ ও প্রান্তর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা কি ইতিমধ্যে আরও নেমে এসেছি ? হয়তো তাই, এখন যে আর নিচে মেঘ নেই। কখন ওপরে উঠছি, কখন নিচে নামছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আগের নদীটা, যদি ব্রহ্মপুত্র হয়, এটা তাহলে কোন্ নদী ?

—এটাও ব্রহ্মপুত্র। পাশের ভদ্রলোক উত্তর দেন।

—আর ঐ শহরটা ? আমরা কি গৌহাটির ওপর দিয়ে চলেছি ?

ভদ্রলোক ঘড়ি দেখেন। বলেন—সাড়ে দশটা বাজে। তার মানে দমদম থেকে দেড়ঘন্টা আগে প্লেন ছেড়েছে। না, না, গৌহাটি হতে পারে না। গৌহাটি ছাড়িয়ে এসেছি। নওগাঁ কিংবা তেজপুর হবে হয়তো। আর আধঘন্টার মধ্যে তো আমরা জোড়হাটেই পৌঁছে যাবো।

ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। জোড়হাটের ল্যাণ্ডিং টাইম এগারোটা। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমতা রেখে বিমান চলাচল করে। বিমান বন্দরে 'লেট' শব্দটার ব্যবহার খুবই কম।

শহরটা ছাড়িয়ে এসেছি, নদীটা এখনো রয়েছে সঙ্গে। থাকবেই তো। আসাম যে ব্রহ্মপুত্রের অবদান। আসামের অপর নাম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। না, ব্রহ্মপুত্র হারিয়ে গেল, তার মানে বিমান ইতিমধ্যে দিক পরিবর্তন করেছে। আমরা এখন বন-জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। চলেছি মেঘের ওপর দিয়ে। ওপরে নীলাকাশ আর নিচে প্রখর রোদ। মেঘের ছায়া পড়েছে মাটিতে। ছায়া ও কায়া উভয়েই চলমান। ভারী মজা লাগছে দেখতে।

হঠাৎ কাগজখানির দিকে নজর পড়ে—আজকের যুগান্তর। বিমানে উঠেই আমি চেয়ে নিয়েছিলাম এয়ার হোস্টেসের কাছ থেকে। কিন্তু বিমানের

ভেতর আর বাইরের জগৎ নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত ছিলাম এতক্ষণ। কাগজে নজর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। অথচ আসন্ন সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে দক্ষিণাদার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে এই কাগজে।

তাড়াতাড়ি কাগজখানি কাছে টেনে নিই। প্রবন্ধটিতে মনোনিবেশ করি। নাম 'আসামে জাতীয় সংহতির উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ'। দক্ষিণাদা লিখেছেন—'জাতীয় সংহতি বিধান ও সেই সংহতি রক্ষার প্রশ্নই স্বাধীন ভারতের সম্মুখে কঠিনতম সমস্যা। ···স্বাভাবিক কারণেই আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আসামে বছর কয়েক ধরে জাতীয় সংহতি ভাবনার সার্থক রূপায়ণ প্রয়াস লক্ষ্য করে। এই সংহতি বোধের অভাবের ফলেই যে আসামকে টুকরো টুকরো করে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য সৃষ্টি করতে হয়েছে, তা ঐতিহাসিক সত্য। অথচ ভারতের স্বার্থেই অখণ্ড শক্তি-শালী ও সুবৃহৎ পূর্ব প্রান্তিক আসাম রাজ্যই ছিল কাম্য।···

'গতবছর (১৯৭৫) গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পূর্ব-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমার এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে।···সেবার গৌহা-টির পথে পথে যখন একটি পোস্টার-ঘোষণা চোখে পড়তে থাকল— "আমি আটায়ে ভারতীয়" অর্থাৎ আমরা সকলেই ভারতীয়, তখনই একটি প্রশ্ন জেগেছিল আমার মনে—সারা দেশময় কেন এরকম শ্লোগান বা এই ঘোষণাটিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।'···সকলের প্রয়াসে জগ-ন্নাথের রথ আপনা থেকেই এগিয়ে চলে।···আসামে আমি সেই সুলক্ষণেরই আভাষ পেয়েছি।

'···অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় দুঃখজনক ভাষা বিরোধের বিপদ কাটিয়ে উঠতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার এবং সুবিজ্ঞ সুধী অসমীয়া বুদ্ধি-জীবীরা নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আসন্ন আসাম রাজ্য অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা জাতীয় সংহতির পক্ষে আসামের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।···

"গতবছর গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনার পর থেকে আমি এই আশা পোষণ করে আসছি যে আসামের কোনো নাগরিককেই আর মাতৃভাষায় শিক্ষা-লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। ১৯৫৪ সালের অগাস্ট মাসে রাজ্যসভায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় তেল ও রসায়ন-মন্ত্রী এবং বর্তমানের কংগ্রেস সভাপতি প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যরথী শ্রীদেবকান্ত বরুয়া বলেছিলেন যে, কেউ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অর্থাৎ জাতীয় সঙ্গীতের ভাষায় বক্তৃতা দিলে, তাতে আপত্তি করা চলে না।

'...গতবছর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—"এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধীরা কখনও ভাষা, কখনও ধর্ম, কখনও বা অন্য কিছুর অজুহাতে বিভেদ সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে।" এই চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে 'ভারত ভাবনায়' উদ্বুদ্ধ হতে বলেছিলেন।

'শিল্পী-সাহিত্যিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই কল্যাণমুখী মনের অধিকারী। তাঁদের সকলের সহযোগিতায় মুখ্যমন্ত্রী "আমি আটায়ে ভারতীয়"—এই ভারতবোধকে আসামের সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে জাগ্রত করে জাতীয় সংহতির এক দিগন্ত উন্মোচন করতে পারবেন বলে আশা করি।"

২

বেলা ঠিক এগারোটার সময় ফকার ফ্রেণ্ড্‌শিপ রোরিয়া বিমান-বন্দরের মাটি স্পর্শ করল। পায়লট অফিসার ও তাঁর সহকর্মীদের সহাস্য বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করে আমরা রানওয়েতে নেমে এলাম। রেলের প্রায় দু-দিনের পথ দু-ঘণ্টায় চলে এসেছি। শরীর ও মনে কোনো ক্লান্তির ছাপ পড়ে নি, জামা-কাপড় নোংরা হয় নি।

আমার পক্ষে অবশ্য জামা-কাপড়ের কথা না তোলাই ভালো। তাঁতের মোটা ধুতি ও খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবির নোংরা হবার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং পোশাকের কথা থাক্‌, বিমানবন্দরের কথাই বলা যাক্‌।

ছোট বিমান বন্দর। সামনেই টার্মিনাল বিল্ডিংস, তবু আমরা গাড়ি চেপেই সেখানে এলাম। কাছে এসে বুঝতে পারি একে ঠিক 'বিল্ডিংস' বলা যায় না, বড় একখানি ঘর। তারই একপাশে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-য়ের অফিস, অপর পাশে কয়েকখানি সোফা—যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়। কয়েকজন নারী-পুরুষ প্রতীক্ষা করছেন সেখানে। ওদের মধ্যে প্রগতি আছে কি? কেমন করে বুঝব? আমি যে তাকে কখনও চোখে দেখি নি। সে দেখতে কেমন, তার কত বয়স—কিছুই জানি না। তাই আমি শুধু বার বার সোফাগুলোর দিকে তাকাই। আমার চোখদুটি প্রগতিকে খুঁজে বেড়ায়।

আমি কাউকে না চিনলেও, দক্ষিণাদা একজনকে চিনতে পারেন। তিনি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। নাম—রত্নশম্ভু নাগ। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ। চোখে মুখে বুদ্ধি ও আভিজাত্যের দীপ্তি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি 'এ্যালক্যালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশান অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেড'-য়ের স্থানীয় মার্কেটিং অফিসার। বয়স বছর চল্লিশ।

প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোককে ভালোবেসে ফেললাম।

রতনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সহকর্মী নিখিল নন্দী এবং সম্মেলনের কার্যালয় সম্পাদক সুবোধ ভৌমিকের সঙ্গে। চেনা নামের মানুষটিকে পেয়ে খুশি হলাম। সুবোধবাবু কয়েক বছর আগেই পাঁচের ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু দেখে তাঁকে খুবই কর্মঠ বলে মনে হচ্ছে।

রতনবাবু আমার অনুমান সমর্থন করেন, "সুবোধবাবুর সাহায্য ছাড়া জোড়হাটে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল হতে পারে না।"

নিখিলবাবুকেও ভালো লাগে আমার। বয়সে রতনবাবুর চেয়ে বড়ই হবেন। ভারী স্মার্ট এবং সপ্রতিভ চেহারা। শান্ত স্বভাব। তিনি এ্যালক্যালি এ্যাণ্ড কেমিক্যালের ডিব্রুগড় কেন্দ্রের সিনিয়ার রিপ্রেজেণ্টেটিভ। এই সম্মেলনের জন্য এখানে এসেছেন।

খুশি হলাম এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কারণ কয়েক মিনিটের মধ্যেই এঁরা অপরিচয়ের ব্যবধান মুছে ফেললেন। তবু আমার মনটা ভারী হয়ে উঠল। একটা বিচিত্র অভাববোধ আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। আমাকে স্বাগত জানাতে প্রগতি বোধহয় আসে নি বিমানবন্দরে। কারণ এখানে প্রতীক্ষারতা অসমীয়া মেয়েরা প্রায় সকলেই তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকে পেয়ে গেছেন। তাদের কেউ জিজ্ঞেস করে নি আমার কথা, কেউ ছুটে আসে নি আমার কাছে।

তাহলে কি প্রগতি আমার চিঠি পায় নি? না, সে ইচ্ছে করেই আসে নি বিমান বন্দরে। হয়তো তার মা-বাবা মেয়েকে আসতে দেয় নি এই অপরিচিত বাঙালী লেখকের কাছে?

একটু বাদেই আমাদের মালপত্র এসে গেল। ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে দক্ষিণাদা রতনবাবুর বাড়িতে থাকবেন আর আমরা চারজন উঠব 'ম্যাড্রাস' হোটেলে।

মালপত্র গাড়িতে তোলা হল। দু'খানি গাড়িতে আমরা রওনা হলাম জোড়হাট শহরের দিকে—বিমানবন্দর থেকে মাত্র ৩ মাইল। পথের দু-পাশে বাড়ি-ঘর আর ক্ষেত-খামার। শুধু সবুজ আর সবুজ।

আমি বাংলার মানুষ। সবুজ আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু এমন ঘন সবুজ আমিও খুব বেশি দেখি নি। আসামের সবুজ আমার মন ভরে দিল। প্রগতি ঠিকই লিখেছিল—এ সৌন্দর্য চোখ মেলে চেয়ে দেখার মতো। কিন্তু কোথায় প্রগতি? আমাকে স্বাগত জানাতে সে আজ আসে নি বিমানবন্দরে।

বনের সবুজের চেয়েও ভালো লাগছে বাড়ি-ঘর। ঘর নয়, যেন খেলা-ঘর। লোকালয় নয়, যেন পটে আঁকা ছবি। খড় অথবা টিন কিংবা এ্যাসবেস্টাজের চাল। কোনোটিতে ইট অথবা মাটির দেওয়াল, কোনোটির কাঠ কিংবা বাঁশের বেড়া। কোঠাবাড়ি বড় একটা চোখে পড়ছে না। আসামে যেমন বৃষ্টি, তেমনি ভূমিকম্প। তাই কোঠা-বাড়ি খুবই কম এখানে।

গাড়ি ছুটে চলেছে, আমরা জোড়হাটে চলেছি। প্রায় আশি বছর আগে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ'-এর সপ্তম খণ্ডে জোড়হাট সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার একটি গ্রাম ও জোড়হাট থানার সদর। ২৬° ৪৬´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৯৪° ১৬´ পূর্ব দ্রাঘিমায় দিশই নদীর ডানতীরে কোকিলামুখ থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখানেই আসামের শেষ স্বাধীন আহোম রাজা স্বর্গদেব গৌরীনাথ সিংহের রাজধানী ছিল। চা-বাগানের জন্য জায়গাটি ক্রমেই বিখ্যাত হয়ে উঠছে। এখানকার অনেক বাগানের চা সোজা-সুজি বিলেতে রপ্তানী হয়।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারে' জোড়হাট মহকুমাকে বলা হয়েছে—'Central Subdivision of Sibsagar District ···About two-fifths of the Subdivision lies north of the main channel of the Brahmaputra, and is known as the MAJULI island···The part south of the river is one of the most populous portions of Assam Valley,

···The subdivision contains one town, **JORHAT**, the headquarters ; and 651 villages······In 1904 there were altogether 56 tea gardens with 30,851 acres under plant, which gave employment to 62 Europeans and 368,49 Indians.'

১৯০১ সালে জোড়হাট শহর ও মহকুমার জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২, ৮৯৯ ও ২, ১৯, ১৩৭ জন। আর ১৯৫১ সালে সেই জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০, ২৪৭ ও ৬, ৪৬, ৪৪৫ জন।

স্বাধীন আসামের শেষ রাজধানী জোড়হাট। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এখানে আহোম রাজাদের পতাকার পরিবর্তে ব্রটিশ পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল। রাজধানী হিসাবে জোড়হাটের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত—১৭৯৪ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস, মাত্র সাড়ে ত্রিশ বছর। কিন্তু এই সময়টা আসামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কাল। সুতরাং জোড়হাট আসামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

আমি সেই ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করে চলি—

জোড়হাট আসামের ইতিহাসে প্রথম স্থান লাভ করে ১৭৯০ সালে। মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে আহোম রাজা স্বর্গদেব গৌরীনাথ সিংহ রাজ্যরক্ষার ভার 'বুড়া গোঁহাই'-য়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে গৌহাটি পালিয়ে গেলেন। অনেক চেষ্টা করেও বুড়া গোঁহাই রাজশক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ গড়াগাও রক্ষা করতে পারলেন না। পশ্চাদপসরণ করে তিনি ১৭৯০ সালে জোড়হাটে এলেন। এবং এখানে একটি সেনানিবাস গড়ে তুললেন।

১৭৯২ সালে গৌরীনাথ গর্ভনর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠলেন। সে আবেদন মঞ্জুর করে কর্নওয়ালিশ ৩৬০ জন সিপাহীর এক বাহিনী গৌরীনাথকে সাহায্য করবার জন্য

আসামে পাঠালেন। সেটি বিদেশী সেনাবাহিনীর আসামের মাটিতে প্রথম পদক্ষেপ। ক্যাপ্টেন টমাস ওয়েল্‌শ সেই ব্রিটিশ অভিযানে নেতৃত্ব করেন। আহোম ইতিহাসের প্রথম আবিষ্কারক ডক্টর জন পিটার ওয়েড এই বাহিনীর চিকিৎসক হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মহামতি ওয়েড-এর কথা পরে ভাবা যাবে, এখন জোড়হাটের কথাই ভাবা যাক্।

জোড়হাট তখন বুড়া গোঁহাইয়ের প্রধান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। ব্রিটিশ বাহিনী পৌঁছবার আগেই বিদ্রোহীরা জোড়হাট দখল করে নিতে চাইল। দু-হাজার বিদ্রোহী বুড়া গোঁহাইয়ের সেনানিবাস আক্রমণ করল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিনই (১৭৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) সকাল আটটার সময় লেঃ মাক্‌গ্রেগরের নেতৃত্বে বিশজন ব্রিটিশ সৈন্যের একটি দল জোড়-হাট পৌঁছলেন। তাঁদের সঙ্গে দূরপাল্লার উন্নত কামান ছিল। অসমীয়া সেনাদলের সাহায্যে তাঁরা মাত্র পাঁচঘণ্টার যুদ্ধে বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দিলেন। জোড়হাটের সেই যুদ্ধে সেদিন আশিজন বিদ্রোহী হতাহত হয়েছিল। আর ব্রিটিশ বাহিনীর মাত্র চারজন সৈন্য সামান্য আহত হয়েছিলেন।

১৭৯৪ সালের মে মাসে ওয়েল্‌শ রাজধানী রংপুর বিদ্রোহীদের কবল-মুক্ত করলেন। ইতিমধ্যে (১৭৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে) লর্ড কর্ন-ওয়ালিশের পরিবর্তে স্যার জন শোর নতুন গভর্নর জেনারেল হয়েছেন। আসামের গৃহযুদ্ধে তিনি ব্রিটিশদের জড়াতে চাইলেন না। তাই ওয়েল্‌শকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।

ওয়েল্‌শ ফিরে যাবার পরেই বিদ্রোহীরা আবার রংপুর অধিকার করে নিল। রাজা গৌরীনাথ তাঁর পরিবার ও সভাসদদের নিয়ে জোড়হাটে পালিয়ে এলেন। ১৭৯৪ সালের সেই জুলাই মাস থেকেই জোড়হাট আসামের রাজধানীর মর্যাদা পেল।

বরফুকন বদনচন্দ্রের প্ররোচনায় ব্রহ্মদেশের রাজা ১৮১৬ সালে আসাম আক্রমণ করলেন। বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে রাজশক্তি তখন রীতিমতো দুর্বল। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বুড়া গোঁহাই বর্মীবাহিনীর

অগ্রগতি রোধ করতে পারলেন না। বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক হতাশায় দেহ-ত্যাগ করলেন। বর্মীরা জোড়হাট দখল করে নিল। বদনচন্দ্রের নির্বাচিত রাজপুরুষকে সিংহাসনে বসিয়ে তারা দেশে ফিরে গেল।
কিছুদিনের মধ্যেই সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে মারামারি শুরু হল। প্রাক্তন রাজা চন্দ্রকান্তের সমর্থকরা আবার বর্মীদের ডেকে নিয়ে এলো। ১৮২১ সালে তারা জোড়হাট দখল করল। তিন বছর ধরে সারা আসাম জুড়ে চলল অমানুষিক বর্মী অত্যাচার। সেটি আসামের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের অধ্যায়।
তারপরেই ব্রিটিশ আক্রমণ। তখনও বর্মীরা এই জোড়হাটকেই তাঁদের প্রধান ঘাঁটি করেছিল। আবার জোড়হাট জয়ের মধ্য দিয়েই আসামে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছিল।

ম্যাড্রাস হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামল। এটি দু-তলা কোঠা-বাড়ি। নিচের তলায় বন-বিভাগের অফিস, ওপরতলায় হোটেল। আমরা সামনের দিকেই ঘর পেলাম।
ঘরের সামনে খোলা ঝুলনো বারান্দা, সঙ্গে বাথরুম। প্রতিঘরে টেবিল চেয়ার, দেওয়াল আলমারী ও ডানলোপিলোর বিছানা। মেঝেতে দড়ির কার্পেট, মাথার ওপরে ফ্যান। এক কথায় চমৎকার ব্যবস্থা।
পাশাপাশি চারখানি ঘর পেয়েছি আমরা। আমার ঘরের নম্বর আট। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ডানদিকের প্রথম ঘরখানি সমরেন্দ্রবাবুর, তারপরে যথাক্রমে সুনীলবাবু (গঙ্গোপাধ্যায়), আমি ও সুনীলবাবু (ঘোষ)। গায়ক সুনীল ঘোষকে আমি ঘোষবাবু বলেই ডাকব।
নিখিলবাবুও এই হোটেলেই আছেন। তবে তিনি রয়েছেন পেছনের দিকে একখানি ঘরে।
চা খেয়ে বাথরুমে ঢুকি। স্নান করে বেরিয়ে দেখি নিখিলবাবু বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "সুনীলবাবু ও সমরেন্দ্রবাবু এখানেই

খাবেন, তাঁদের ঘরে খাবার দিতে বলেছি। আপনি কি এ হোটেলে খাবেন, না আমাদের সঙ্গে খেতে যাবেন ?"

"কোথায় ?"

"কাছেই, অন্য একটা হোটেলে। আমি জোড়হাটে এলে সেখানে খাই। তারা রান্নায় ঝাল ও মশলা একটু কম দেয়। ঘোষবাবু আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।"

"আমিও যাবো।"

জামা-কাপড় পরে প্রগতির চিঠিটা পকেটে নিই। তারপরে দোর বন্ধ করে নিখিলবাবুর সঙ্গে নিচে নেমে গাড়িতে বসি। এখন বেলা একটা। নিখিলবাবু কলকাতায় থাকেন না, তবু তিনি আমাদের মতো পেটের রোগী। এ হোটেলে সত্যিই রান্নায় মশলার প্রাচুর্য নেই।

বিল মিটিয়ে দেবার পরে নিখিলবাবুর হাতে প্রগতির চিঠিখানি দিয়ে বলি, "একবার এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

এক নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়ে ফেলে মুগ্ধকণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, "ভারী সুন্দর চিঠি লিখেছে তো মেয়েটি। আর এতো চন্দ্রকমল বেজবরুয়া বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমাদের দ্বিজেনবাবুর মেয়ে। চলুন, এখুনি ঘুরে আসা যাক্।" তিনি ঘোষবাবুর দিকে তাকালেন।

ঘোষবাবু বলেন, "আমার আপত্তি নেই। হোটেলে ফিরে তো একা একা ঘরে বসে থাকতে হবে।"

আবার এসে গাড়িতে বসি। গাড়ি চলল শহরের ভেতর দিয়ে। শহর হলেও মোটেই ঘন বসতি নয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। এপ্রিল (বৈশাখ) মাস কিন্তু এখানে এখনও গাঁদাফুল ফুটছে। আপার-আসামে বছরে তিনটি ঋতু—শীত, বসন্ত ও বর্ষা। নভেম্বর থেকে এপ্রিল শীতকাল, মে-জুন বসন্তকাল আর জুলাই থেকে অক্টোবর বর্ষাকাল। তার মানে এখানে এখনও শীতকাল চলেছে। সুতরাং গাঁদাফুল ফুটছে।

পথের পাশে একটা জটলা। নিখিলবাবু গাড়ি থামান। এখন বুঝতে

পারছি জটলা নয়, নাচ-গানের আসর—লোকনৃত্য ও লোকগীতি। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত নাচ-গান। সঙ্গে বাজনদারের দল—ঢোল আর বাঁশি। বাঁশির ভেতর রয়েছে একটি শিঙ্গা। সেটির যেমন বিচিত্র চেহারা, তেমনি শব্দ।

নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা ও বাজনদারদের সকলেরই গায়ে রঙীন স্থানীয় পোশাক। ছেলেরা মালকোঁচা করে ধুতি পরেছে. কোমরে গামছার কটিবেষ্টনী. গায়ে রঙীন জামা। মাথায় কারও রঙীন পাগড়ি, কারও বা টুপি। কারও গলায় ঝুলছে ঢোল, কারও হাতে বাঁশি কিংবা শিঙ্গা। আর কেউবা খালি হাতে নানা ভঙ্গিমা করে মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচছে।

মেয়েরাও সবাই সেজেছে উজ্জ্বল রঙীন পোশাকে : হাতে বাহুতে গলায় কানে ও নাকে পুঁতি কিংবা পাথরের অলঙ্কার। কপালে টিপ, ঠোটে রঙ, চোখে কাজল। মাথায় বেশ বড় বড় খোঁপা। তাতে ফুলের মালা : সবাই একযোগে সুর করে গান গাইছে আর হাত ও পায়ের নানা ভঙ্গিমা করে তালে তালে নাচছে।

আমাকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখেই বোধহয় নিখিলবাবু বললেন বিহুর নাচ-গান হচ্ছে। বিহু আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক-উৎসব।"

আমি তাঁর দিকে তাকাই। নিখিলবাবু বুঝতে পারেন এ উৎসব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তিনি বলতে থাকেন, "বিহু হচ্ছে আসামের প্রাকৃতিক উৎসব। ঋতু পরিবর্তন ও কৃষিকার্যকে কেন্দ্র করে লোকনৃত্য ও লোকগীতির মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। বছরে তিনবার এই উৎসব হয়। তিন বিহুর তিন নাম—মাঘ, কাটি ও রঙ্গাগ।

"কাটি বিহু হয় শরৎকালে ফসল কাটার সময়। বাড়ির তুলসীতলায় মাটির প্রদীপ জ্বেলে সেই বিহু উৎসব আরম্ভ হয়। এর স্থানীয় নাম রঙালী বিহু।

"মাঘ বিহু হয় শীতকালে ফসল ঘরে ওঠবার পরে। এই উৎসবের অপর

নাম ভোগালী বিহু। আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে জড়ো হয়ে খাওয়া-দাওয়া ও নাচ-গানের মধ্য দিয়ে সেই বিহু পালিত হয়।

"বহাগ বিহু হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যপূর্ণ।..."

"এখন কোন্ বিহু হচ্ছে।"

"বহাগ। অসমীয়া ভাষায় বহাগ মানে বৈশাখ। এই বিহুর অপর নাম রঙালী বিহু।" একবার থামেন নিখিলবাবু। তারপরে আবার বলেন, "উজলী-আসাম বা আপার-আসামে গ্রীষ্মকাল নেই। বৈশাখ মাস হচ্ছে বছরের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব হল বহাগ বিহু। এই উৎসব থেকেই অসমীয়াদের নতুন বছর আরম্ভ হয়।"

কিছুক্ষণ নাচ-গান দেখার পরে নিখিলবাবু গাড়ি ছাড়েন। ফাঁকা রাস্তা তাই তিনি সামনের দিকে মুখ রেখে বলতে থাকেন, "আসামের অপ-রূপা প্রকৃতি এখন কুয়াশার পর্দা সরিয়ে শীতের প্রভাবমুক্ত। গাছের শাখায়-শাখায় পাখির কাকলি। কোকিল আপনমনে প্রকৃতির জয়গান গাইছে। উজ্জ্বল নীলাকাশের বুকে সাদা মেঘের শোভাযাত্রা চলেছে সারাদিন। মাঝে-মাঝে মেঘের গুরু-গম্ভীর গর্জন আর দু-এক পশলা বৃষ্টি। এই নিয়ে আসামের বৈশাখ মাস।

"বৈশাখের বর্ষণ বর্ষার বৃষ্টির মতো মারাত্মক নয় আসামে। এতে কোমল মাটি কোমলতর হয়, সবুজ ঘাস হয় আরও সতেজ। আসামের মানুষের দেহ ও মন এখন এক অনিন্দ্যসুন্দর সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সে খুশিতে উচ্ছল, তার পা-দুখানি নৃত্যের ছন্দে চঞ্চল। কণ্ঠ ভরে উঠেছে সুরে। নিজের মনের মাধুরী মিশায়ে সে এই প্রাকৃতিক উৎসবের সামিল হয়েছে। কখনও খোলা মাঠে, কখনও বা নদীর ধারে কিংবা বনের ছায়ায় বিহুর আসর বসছে।

"শুধু এই উৎসব আসামের নিজস্ব নয়, এর নাচ-গানও সম্পূর্ণ অসমীয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নাচ-গানে সাধারণত যুবক-যুবতীরা অংশ গ্রহণ করে। বাজনার সঙ্গে মাঝে মাঝে শিঙা বাজানো হয়। এমন শিঙার শব্দ আপনি আসাম ছাড়া আর কোথাও শুনতে পাবেন না।

এ সম্পর্কে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে বিহু প্রাক-আর্য যুগের কৃষি উৎসব। পরবর্তীকালে আর্যরা এদেশে এসে এই উৎসবের ভেতরে ধর্মীয় *এবং আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ* ঘটিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ উৎসব আজও লোক-উৎসব রয়ে গিয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই এর সঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীরা যুক্ত হয়ে আছেন।

"তাহলেও বলব বিহুর অধিকাংশ গান মানুষের জয়গান, আর এর নাচ যৌবনের আগমনী বার্তা। অনেকের মতে বিহু নাচের অঙ্গভঙ্গি যৌন-আবেদন মূলক এবং এর গান কামবাসনা সঞ্জাত। তবে তাঁরাও স্বীকার করেন—বিহু ভারতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষি-কেন্দ্রিক লোক-উৎসব। এই উৎসব সেকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একালের একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

"সীমাহীন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার আসামের প্রকৃতি যখন যুব-হৃদয়কে প্রেম ও সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ করে, তখুনি পালিত হয় বিহু উৎসব। অবশ্য কিছু কিছু বিহু গানে দেহতত্ত্বের উল্লেখ আছে, নাচেও রয়েছে যৌন আবেদন। তবে সেগুলো সবই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ঠিক অশ্লীল হয়ে ওঠে নি। যেমন ধরুন এমন কতগুলো বিহুগান আছে যাতে মেয়েদের বক্ষআবরণী অর্থাৎ লাল রিহাকে ফসলের পরিপক্কতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যবহার অকারণে নয়। এর কারণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীহেম বরুয়া বলেছেন—

'Bihus are fertility festival···It was originally believed that these added to production and to the fertility of the earth and that of woman, and the two are connected. Bertrand Russel says thus : "It was thought that by promoting human fertility, the fertiliy of the soil could be encouraged."*

একবার থামেন নিখিলবাবু। আমি সবিস্ময়ে বলি, "আপনার তো আশ্চর্য

* 'Fairs & Festivals of Assam.'

স্মরণশক্তি, এমন করে মনে রেখেছেন !”

কিন্তু নিখিলবাবু আমার প্রশংসার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। তিনি আবার বলতে থাকেন, “প্রায় প্রত্যেকটি বিহু গানে আমরা নারী ও প্রকৃতির প্রতি নির্ভরতার কথা শুনতে পাই। এবং নারী ও প্রকৃতির এই একাত্মতাই বিহুগানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

আর বিহু নাচ নিঃসন্দেহে সেকালের সামাজিক উৎসবের একটি উজ্জ্বলতম নিদর্শন। বিহু উৎসবের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করছে যে সভ্যতার যত বিবর্তনই হয়ে থাক্‌, আসাম আজও সেকালের মতই কৃষিপ্রিয় রয়ে গিয়েছে।”



উঁচু বাঁধানো পথ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। পথের দুপাশে অনেকখানি খালি জায়গা। তারপরে গাছ-পালা ও ক্ষেত-খামার। আমরা বোধকরি শহরের উপকণ্ঠে চলে এসেছি। তাই বাড়ি-ঘর কমে এসেছে। বেড়েছে সবুজ। এমন স্নিগ্ধ সবুজের ছড়াছড়ি আমি পূর্ব-বঙ্গের বাইরে বড় একটা দেখি নি। আসামে এসে তাই আমি প্রতি পদক্ষেপে আমার ছেড়ে আসা জন্মভূমির মধুর স্পর্শ লাভ করছি।

স্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে নিখিলবাবু এতক্ষণ বিহু উৎসবের কথা বলছিলেন। এবারে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বল-লেন "আমরা জোড়হাট শহরের শেষপ্রান্তে এসে পড়েছি। এ জায়গা-টার নাম সর্বাইবন্ধ।"

"বড় রাস্তাটা তো এগিয়েই চলছে! এটা কোথায় গিয়েছে?" প্রশ্ন করি। নিখিলবাবু উত্তর দেন, "এ পথটার নাম জগন্নাথ বরুয়া রোড। এটি চলে গিয়েছে কোকিলামুখ। দূরত্ব এখান থেকে ১২ মাইলের মতো। জায়গাটি চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান। কোকিলামুখ থেকে যাওয়া যায় মাজুলী। তবে কোকিলামুখের নৌকোগুলো খুব ছোট বলে সবাই সাধারণত নিয়ামতীঘাট দিয়েই মাজুলী যায়।"

"মাজুলী মানে ব্রহ্মপুত্রের সেই ক্ষুদ্রদ্বীপ?" জিজ্ঞেস করি।

হেসে নিখিলবাবু বলেন, "ওটিকে 'Islet' বলা হলেও খুব ছোট নয়, আয়তন ৪৮৫ বর্গমাইল। সারা ব্রহ্মপুত্রে মাত্র দুটি দ্বীপ। একটি এই মাজুলী আরেকটি গৌহাটির উপকণ্ঠে উমানন্দ। মাজুলী বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থ। সেখানে বহু সত্র মানে বৈষ্ণবদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। দর্শনার্থীদের সে-সব সত্রে খুবই আদর-যত্ন করা হয়। মাজুলী

শুধু তীর্থক্ষেত্র নয়, আসামের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির অন্যতম পাদপীঠও বটে। মাজুলীর কাছে সুবনসিরি নদী এসে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। সুবন-সিরির সলিলে স্বর্ণচূর্ণ পাওয়া যায়।"

থামলেন নিখিলবাবু। আমি কোনো প্রশ্ন করতে পারার আগেই তিনি গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়ে বাঁদিকের ইটের রাস্তা ধরলেন। সামান্য কিছুটা এগিয়েই আবার ধাঁয়ে বাঁক নিলেন। এবারে মাটির পথ। বন-ফুলের গন্ধ আসছে ভেসে। কোকিলের কুহুতান কানে আসছে। বাংলার কোকিল নীরব হয়েছে, কিন্তু আসামের কোকিল আজও গেয়ে চলেছে তার গান। আপার-আসামে যে গ্রীষ্মকাল নেই, এখানে শীত আর বসন্ত মিলে-মিশে একাকার।

পথের দু-পাশের ছোট-বড় গাছের সারি। বড় গাছগুলো পথের ওপরে তাদের ডালপালা ছড়িয়ে সবুজ চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে। সেই ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম্যপথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। আমি আমার অসমীয়া পাঠিকা প্রগতির বাড়িতে চলেছি। প্রগতি আমাকে আসামে আসার নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি আসামে এসেছি। সে নিশ্চয় খুবই খুশি হবে আমাকে দেখে।

কিন্তু সে বিমান বন্দরে দেখা করল না কেন? আমি তাকে সুবোধবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে লিখেছিলাম। সে তা-ও করে নি। অসমীয়া সমাজ আমার অপরিচিত। হয়তোবা তার কোনো বাধা থাকায় সে বিমানবন্দরে যেতে পারে নি। তবু আমি তার বাড়িতে চলেছি। ওর বাবা-মা আবার কিছু মনে করবেন না তো?

কিন্তু এ-সব ভাবনা এখন অর্থহীন। এতদূর এসে ফেরার কথা বলা যায় না। তাছাড়া নিখিলবাবু প্রগতির বাবাকে চেনেন। নিখিলবাবু বহু-কাল আসামে আছেন, অসমীয়া সমাজ তাঁর সুপরিচিত। তেমন হলে তিনি নিশ্চয়ই নিয়ে আসতেন না আমাকে।

আর কিছু ভাববার সময় পাই না। পথ থেকে একটু নেমে এসে ডান দিকে একটা বাড়ির পাশে গাড়ি থামিয়েছেন নিখিলবাবু। বাড়িটির

সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া একফালি জাম আর দু-ধারে বাঁশবন। মাঝারী আকারের একখানি 'বাংলো টাইপ'-য়ের বাড়ি। পরিবেশের সঙ্গে সমতা রেখে তৈরি। প্রগতির বাবার রুচিবোধ প্রশংসনীয়।
গাড়ির শব্দ শুনেই বোধকরি বছর ষোলো বয়সের একটি ছেলে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। নিখিলবাবু গাড়ি থেকে নেমে অসমীয়া ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করেন, "দ্বিজেনবাবু বাড়ি আছেন?"
"হ্যাঁ।" ছেলেটি সবিনয়ে উত্তর দেয়। বলে, "আপনারা ভেতরে এসে বসুন, আমি বাবাকে খবর দিচ্ছি।"
আমরা ভেতরে আসি। বেশ বড় একখানি ঘর, একপাশে সোফা-সেট ও সেন্টার টেব্‌ল, আরেকপাশে কয়েকটি বইয়ের আলমারী। আমরা সোফায় বসি। কিশোরটি ভেতরে চলে যায়।
একটু বাদেই ধুতি ও গেঞ্জি পরা একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ত্রস্ত পায়ে ঘরে আসেন। তিনি হাতজোড় করে নমস্কার করেন আমাদের। নিখিলবাবু এগিয়ে যান তাঁর কাছে। পকেট থেকে সম্মেলনের একখানি নিমন্ত্রণপত্র বের করে তাঁর হাতে দেন। বলেন, "আগামীকাল সকাল আটটায় লক্ষ্মী য়ুনিয়ন বেঙ্গলী ক্লাব হলে অধিবেশন শুরু হচ্ছে। বৈচিত্র্যমুখর ভেদাভেদ বিরহিত এই সম্মেলনে আমরা আপনার উপস্থিতি কামনা করি।"
"ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই যাবো।" শ্রীশর্মা পরিষ্কার বাংলায় বললেন। তিনি আসন গ্রহন করেন।
আমি নিশ্চিন্ত হই। তাহলে শুধু মেয়ে নয়, বাবাও বাংলা বলতে পারেন। পরে দেখেছি আসামের প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষ বাংলা জানেন। বইয়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে জেনেছি—অসমীয়ারাই বেশির ভাগ বাংলা বই কেনেন।
কিন্তু ভাষার প্রসঙ্গ এখন থাক্। দ্বিজেনবাবুর কথায় ফিরে আসি। নিখিল বাবুও নিজের জায়গায় বসলেন। বললেন, "দু-দিনই সন্ধ্যায় গানবাজনা নাটকের আয়োজন করা হয়েছে। আমার এই বন্ধু গায়ক

সুনীল ঘোষ কলকাতা থেকে এসেছেন। পূর্ণদাস বাউল কাল আস-ছেন। সবাইকে নিয়ে অবশ্যই আসবেন।"
ঘোষবাবুর সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর নমস্কার বিনিময় হয়। কিন্তু নিখিলবাবু আসল কথাটা বলতে বড্ড দেরি করছেন! তিনি প্রগতির প্রসঙ্গ তুল-ছন না কেন? তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই যে আমি এসেছি এ বাড়িতে। না, তাঁর মনে পড়েছে কথাটা। তিনি দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেনবাবু বলে উঠলেন, "আমার বড় মেয়ে মিনু মানে প্রগতি আপনাকে চিঠি লিখে-ছিল।"
আমি সহাস্যে মাথা নাড়ি।
তিনি বলতে থাকেন, "আপনি আমার কলেজের ঠিকানায় একটা উত্তরও দিয়েছিলেন। আপনার উত্তর আসার পরেই তো আমরা জানতে পার-লাম ব্যাপারটা।" তারপরেই তিনি জোরে জোরে ডাকতে থাকেন, "প্রাঞ্জল, প্রাঞ্জল।"
সেই ছেলেটি এ-ঘরে আসে। দ্বিজেনবাবু অসমীয়াতে বলেন, "তোর মাকে আসতে বল একবার। বল, লেখক শঙ্কু মহারাজ এসেছেন।" তাঁর চোখে মুখে খুশির আমেজ।
ছেলেটি আমাদের প্রণাম করে ভেতরে চলে যায়। এবারে মায়ের সঙ্গে নিশ্চয় প্রগতিও আসবে। আমি প্রতীক্ষায় থাকি।
দ্বিজেনবাবু আবার বলেন, "আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য, আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন।" তারপরেই তিনি যেন কেমন ম্লান হয়ে যান। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেন, "সে থাকলে কত খুশি হত।"
চমকে উঠি। কার কথা বলছেন দ্বিজেনবাবু?
প্রগতির কথা? সে নেই! কেন তার কি হয়েছে?
কিন্তু কোনো প্রশ্নই করতে পারি না আমি। কে যেন আমার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। প্রগতি নেই! কিন্তু আমি যে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই ছুটে এসেছি এখানে। মা-কামাখ্যা! এ তুমি আমাকে কি শাস্তি

দিলে ?

"তার বড়ই দুর্ভাগ্য··· !" ক্ষীণকণ্ঠে দ্বিজেনবাবু বলেন।

আমি তাঁর দিকে তাকাতে পারি না। আমি ঝাপসা দেখছি। অচেনা সেই পাঠিকার জন্য আমার বুক কান্নায় ভরে উঠেছে।

"আজই সকালে সে চলে গিয়েছে।···"

"কোথায় ?" দ্বিজেনবাবুকে শেষ করতে দিই না, আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি।

"গৌহাটি।"

আনন্দ। আমার সমস্ত মন একটা অনাস্বাদিত আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। আমি চোখ মুছি। এখানে নেই কিন্তু প্রগতি আছে। তার কোনো বিপদ হয় নি। দ্বিজেনবাবুর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

দ্বিজেনবাবু বলতে থাকেন, "সে গৌহাটি কটন কলেজে পড়ে, সেখানেই হস্টেলে থাকে। ১৯ তারিখ অর্থাৎ আগামী সোমবার থেকে তার ফাইন্যাল পি. ইউ পরীক্ষা। তাই আজ সকালের বাসে গৌহাটি চলে গিয়েছে। আপনি আসবেন জানলে, সে কিছুতেই আজ যেতো না।"

"কিন্তু আমি তাকে চিঠি দিয়েছিলাম।"

"পাই নি তো !"

আমি ভাবি অন্য কথা। প্রগতি পি. ইউ. পরীক্ষা দিচ্ছে। তার মানে ওর বয়স বছর আঠারো। অর্থাৎ সে আমার প্রায় কন্যাসমা। আচ্ছা, সে দেখতে কেমন ?

আর কিছু ভাবতে পারি না। প্রগতির মা ঘরে ঢোকেন। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোটই হবেন। শুধু সুরূপা নন, ভারী মার্জিতা ও রুচি সম্পন্না। পরে শুনেছি, তিনি একটা মেয়েদের স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং সংসার ও চাকরি করেও এবছর বি. টি. পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রগতির মা হাত জোড় করে নমস্কার করেন আমাদের। তারপরে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, "ওরা দু-ভাই, দু-বোন। মিলু সবার বড়। তারপরে এই ছেলে প্রাঞ্জল এবার স্কুল

ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। ওর পরে পাপড়ি ক্লাস টেন-য়ে পড়ে আর এইটি সবার ছোট, বয়স সাত বছর। নাম রঞ্জনরথি। যাও, প্রণাম করো।"

সে-ই এতক্ষণ মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছিল। এবারে দাদা ও দিদির সঙ্গে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। আমি তাকে কোলে তুলে নিই। কিন্তু বার বার পাপড়ি আর প্রাঞ্জলকে দেখি। প্রাঞ্জল বেশ লম্বা, তবে তার গায়ের রংটা খুব ফর্সা নয়। পাপড়ি ফর্সা, সে দেখতে বেশ ভালই। প্রগতিও নিশ্চয় দেখতে ভালো।

"সে আজ থাকলে যে কত খুশি হত, তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।" মা প্রগতির কথাই বলতে থাকেন, "আমাদেরই দুর্ভাগ্য, আপনার চিঠি পাই নি। আপনি আসছেন জানলে আজ সে কিছুতেই চলে যেতো না।"

সত্যি ব্যাপারটা বিস্ময়কর। আজই সকালে সে চলে গেল! আমি একদিন আগে এলে কিংবা সে একদিন পরে গেলেই দেখা হতো তার সঙ্গে। "চিঠিটা কি আমার কলেজের ঠিকানায় লিখেছেন?" সহসা দ্বিজেনবাবু প্রশ্ন করেন আমাকে।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"তাই পাই নি। বিহুর জন্য কলেজ ছুটি। কলেজে এসে পড়ে রয়েছে হয়তো।"

"প্রগতির পরীক্ষা কবে শেষ হবে?" জিজ্ঞেস করি।

মিসেস শর্মা উত্তর দেন, "প্র্যাক্‌টিকাল শেষ হবে আগামী মাসের বারো তারিখে।"

"তাহলে তো ওর সঙ্গে দেখা হবে আমার। আমি ফেরার পথে গৌহাটি হয়ে ফিরব।"

"আপনি কবে গৌহাটি পৌঁছবেন, কোথায় উঠবেন বলুন, আমি কালই চিঠি লিখে দেব মিলুকে। সে দেখা করবে আপনার সঙ্গে।"

"না, না, তার দরকার নেই। ওর পরীক্ষা, এসময় ওকে ডিস্টার্ব করা

উচিত হবে না। আপনি ঠিকানা দিন, আমি ওর সঙ্গে দেখা করব।"
"ঠিকানা খুবই সহজ, কটন কলেজ গার্লস হস্টেল।" দ্বিজেনবাবু বলেন, "যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বললেই নিয়ে যাবে। আমি ওকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি। যাবেন কিন্তু।" তাঁর কণ্ঠে অনুরোধ।
সহাস্যে বলি, "শুধু পাঠিকা বলে নয়। আসামে আসার জন্য সে-ই আমাকে প্রথম নেমন্তন্ন করেছিল আর তার সঙ্গে দেখা না করেই আমি আসাম থেকে চলে যাবো ? গৌহাটি গিয়েই দেখা করব ওর সঙ্গে।"
আমি উঠে দাঁড়াই।
নিখিলবাবু এবং ঘোষবাবুও আমাকে অনুসরণ করেন।
"সে কি। এখুনি উঠছেন যে ?" প্রগতির মা ও বাবা দুজনেই বলে ওঠেন একসঙ্গে।
"আজ চলি। কাল তো দেখা হচ্ছেই সম্মেলনে।"
"না, না।" প্রগতির মা প্রতিবাদ করেন। তিনি উঠে দাঁড়ান। বলেন, আমাদের কত সৌভাগ্য, আজ আপনারা আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। একটু কিছু মুখে না দিয়ে যেতে পারবেন না।"
আমি নিখিলবাবুর দিকে তাকাই।
নিখিলবাবু বলেন, "আমরা হোটেল থেকে খেয়েই সোজা এখানে এসেছি।"
"আপনি তো আসামে থাকেন, আপনি তো জানেন ভাই", দ্বিজেনবাবু বলেন, "বিহুর সময় কেউ বাড়ি এলে আমরা তাকে কিছুতেই খালি মুখে যেতে দিই না।"
আজ মিলু চলে যাবার জন্য, এমনিতেই আমাদের মন ভালো নেই।" প্রগতির মা যোগ করেন, "তার ওপর আপনি আজই এলেন। সে থাকলে আজ যে কত খুশি হত, তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। সে যদি শোনে, আপনারা কিছু মুখে না দিয়ে এ-বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন, তাহলে যে বড়ই কষ্ট পাবে।"
তাড়াতাড়ি বলি, "ঠিক আছে। চা করুন, আমরা খাবো।"

মিলুর মা-র মুখে হাসি ফুটে ওঠে—তৃপ্তির হাসি, প্রাপ্তির হাসি। এ হাসি শুধু বাংলা কিংবা আসামের নয়, ভারতীয় মাসের হাসি। যাঁর চেয়ে স্নেহময়ী জননী জগতে আর কোথাও আছে বলে জানা নেই আমার।

প্রগতির মা ভেতরে চলে যান। পাপড়ি ও রঞ্জন তাঁর সঙ্গে যায়। প্রাঞ্জল দাঁড়িয়ে থাকে বাবার পাশে। আমরা দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে গল্প করতে থাকি।

গল্পে গল্পে কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে এক সময়ে প্রগতির মা আবার ঘরে আসেন। সবিনয়ে তিনি বলেন, "চলুন, আপনাদের খাবার দিয়েছি।"

পেছনের বারান্দা ও রান্নাঘরের মাঝখানে খাবার ঘর। ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে আঁতকে উঠতে হয়। একি কাণ্ড! এ যে দেখছি—লুচি তরকারী মিষ্টান্ন ও তিন রকমের পিঠে।

দ্বিজেনবাবু অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা বড় পিঠে দেখিয়ে বলেন, "এটা হচ্ছে আমাদের বিহুর পিঠে, চালের গুঁড়ো আর তিল দিয়ে তৈরি, নাম তিলপিঠা।"

"তাহলে শুধু ওটা আর চা খাবো।" আমি বলি।

"না, না, তা হবে না।" মিসেস শর্মা প্রতিবাদ করেন, "মিষ্টান্ন এবং সব পিঠে খেতে হবে। অসুবিধে হলে লুচি তরকারী খাবেন না।"

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হয়। খাওয়া শেষে নমস্কার করে প্রগতির মাকে বলি, "আজ চলি তাহলে।"

তিনি বলেন, "বাইরের ঘরে গিয়ে একটু বসুন, আমি আসছি দু-মিনিটের মধ্যে।"

আমরা দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে বাইরের ঘরে আসি।

মিনিট পরেই মা ও মেয়ে এ-ঘরে আসে। মেয়ের হাতে কয়েক টুকরো পাড়ওয়ালা তাঁতের সাদা কাপড়। এগুলো আবার কি? কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই পাপড়ি আবার প্রণাম করে আমাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে তারই একটুকরো কাপড় আমার কাঁধের ওপর রেখে বলে, "বিহুর ফুলাম গামোছা।"

দ্বিজেনবাবু বলেন, "এ আমাদের হাতে বোনা গামছা। বিহুর সময় কোনো আপনজন বাড়িতে এলে আমরা তাঁকে এই নতুন বস্ত্র উপহার দিই।"

"এর থেকে বড় সম্মান আর কিছু নেই আসামের সামাজিক জীবনে।" নিজের গামছাখানি হাতে নিয়ে নিখিলবাবু মন্তব্য করেন।

গামছাখানিকে গলবস্ত্র করে দ্বিজেনবাবুকে বলি, "আপনাদের প্রীতির অর্ঘ্য আমি মাথায় করে নিয়ে গেলাম।"

মনে মনে ভাবি--এতো শুধু ফুলাম গামোছা নয়, অন্তরের রাখী বন্ধন। অমরাবতী-আসামের সঙ্গে রূপসী-বাংলার অচ্ছেদ্দ মিলন। আর অসমীয়া একটি পরিবারে প্রথম আগমনের এই মধুর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল আমার মনের মণিকোঠায়।

৪

সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের সভা বসল দশ কোম্পানীর চত্বরে, রতনবাবুর অফিসে। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমরা চারজন উপস্থিত হলাম সেখানে।

রতনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জোড়-হাট পৌরসভার অধ্যক্ষ শ্রীরাধানাথ বরঠাকুরের সঙ্গে। বয়সে প্রবীণ, পেশায় ব্যবসায়ী, চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তি, আচরণে ভদ্র ও বিনয়ী। ভদ্র-লোককে ভালো লাগে আমার।

ভালো লাগে দশ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীসুশীল কুমার দশ ওরফে তুষ্টুবাবু এবং তাঁর পুত্র তপন বা পল্টনকে। ভালো লাগে গৌহাটি হাইকোর্টের তরুণ এ্যাডভোকেট ও নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মে-লনের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীসোমেশ ভট্টাচার্যকে।

সোমেশ স্পষ্ট বক্তা অথচ বিনয়ী, বুদ্ধিমান ও নিরলস কর্মী। সে আমার পূর্ব পরিচিত। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভাগলপুরে।

আলাপ হল অভার্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বরুণদেব বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সঙ্গে। ভদ্রলোকের যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি অমায়িক ব্যবহার। বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। কিন্তু এরই মধ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বৃত্তি নিয়ে কলকাতা, ইলিনয় (আমেরিকা), লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন। হল্যাণ্ড সরকারের আমন্ত্রণে সেখানকার বিখ্যাত কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৪-৭৫ সালের বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পে কেনিয়ার নায়রবী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক রূপে অধ্যাপনা করে এসেছেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে ডঃ ব্যানার্জী জানালেন, "হ্যাঁ, আমি বিবাহিত।

আমার স্ত্রী কৃষ্ণা বেনারসের মেয়ে। আগে মুখোপাধ্যায় ছিল। আমাদের একটি ছেলে, বয়স তিন বছর। ভালো নাম আনন্দদেব তবে আমরা তাকে বাবাই বলেই ডাকি। এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করাতে পারলাম না বলে ক্ষোভ থেকে গেল। এর পরে যখন জোড়হাটে আসবেন, তখন আমার ওখানে থাকবেন।"

"আপনি তো টোক্‌লাই এক্‌সপেরিমেণ্টাল স্টেশনেই থাকেন ?"

"হ্যাঁ, টোক্‌লাই গবেষণাগারের সঙ্গে আমি দশ বছর ধরে যুক্ত রয়েছি।···"

"ডাঃ ব্যানার্জী সেখানকার 'Entomology' মানে পতঙ্গ-বিজ্ঞান বিষয়ের প্রধান।" রতনবাবু বলেন।

ডাঃ ব্যানার্জীর দিকে তাকাই। তিনি বলেন, "আমার গবেষণা প্রধানত কীট-পতঙ্গের সংখ্যা, বিশেষ করে তার গাণিতিক দিকটা নিয়ে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এ-বিষয়ে আমার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সম্প্রতি একখানা বইও লিখেছি।"

সহাস্যে রতনবাবু বলেন, "বৈজ্ঞানিক মানুষ, বিজ্ঞানের বই লিখবেন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু উনি শুধু বৈজ্ঞানিক নন। ওঁর সাহিত্যপ্রীতি অসাধারণ। এই সম্মেলন উপলক্ষে সংকলিত আমাদের স্মারক পত্রিকা 'অভিজ্ঞানে' ওঁর 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধটি দেখলেই তা বুঝতে পারবেন।"

বরুণবাবু বোধহয় একটু লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "সাহিত্যপ্রীতি আমার সামান্যই আর তা-ও পিতৃদত্ত। আমার পিতৃদেব শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহারিক জীবনে ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তিনি আশৈশব সাহিত্যসেবক। কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন এবং কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' বইতে বাবার উল্লেখ করেছেন।"

বরুণবাবু থামতেই আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি, "টোক্‌লাই এক্‌সপেরি-

মেন্টাল স্টেশন সম্পর্কে কিছু বলুন।”

ব্যক্তিগত আলোচনার থেকে মুক্তি পেয়ে ডাঃ ব্যানার্জী হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। তিনি সানন্দে শুরু করেন, “এই স্টেশনটি প্রকৃত পক্ষে ‘ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেণ্টে’র উত্তর-পুরুষ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার যাদুঘরে সেই ডিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডঃ এইচ. এইচ মান প্রথম সেই প্রতিষ্ঠানের সায়েন্টিফিক অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে কাছাড়ে একটি পতঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর মরিয়ানীর কাছে হীলিয়াকায় একটি রাসায়নিক গবেষণাগার খোলা হয়।

“বিভিন্ন জায়গায় গবেষণাগার ছড়িয়ে থাকায় গবেষণার খুব অসুবিধে হচ্ছিল বলে ১৯১১ সালে জোড়হাট শহর থেকে মাত্র আড়াই মাইল দূরে টোকলাইতে এই এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন খোলা হয়। সেই সঙ্গে অন্যান্য গবেষণাগারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল।

“১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ‘ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন’ এই স্টেশনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। ঐ বছর ‘টি রিসার্চ এসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্টেশনটি এখন তারই প্রধান কর্মকেন্দ্র। এটি সমবায় ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা। এর অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করেন ‘কাউন্সিল অব্ সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড রিসার্চ’ এবং ‘টি বোর্ড’ বাকী অর্ধেক যোগান বিভিন্ন সদস্য চা-বাগান।

“আমাদের স্টেশনে রয়েছে একটি করে ‘এক্সপেরিমেণ্টাল টি ফ্যাক্টরী’, ‘ডিস্পেনসারী’ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ আবহাওয়া বিভাগ এবং দুটি পরীক্ষামূলক চা-বাগান।”

“আরেকটা কথা…” ডাক্তার ব্যানার্জী থামতেই আমি বলি।

“বেশ বলুন।” ডাক্তার ব্যানার্জী শুনতে চান।

আমি জিজ্ঞেস করি, “আপনারা কিভাবে চা-বাগানগুলোকে সাহায্য করেন?”

“আমরা উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত চা-বাগানগুলিকে গবেষণার ফলাফল

এবং আবহাওয়ার খবর জানাই। উৎপাদন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁদের যাবতীয় পরামর্শ দিই। স্টেশনে নিয়মিত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'টু এ্যাণ্ড্ এ বাড' নামে একটি ষাণ্মাষিক পত্রিকা প্রকাশ করি। এ ছাড়া আমরা একখানি 'টি এনসাইক্লোপিডিয়া' সংকলিত করছি। এটি অদূর ভবিষ্যতে চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।"

থামলেন ডাঃ ব্যানার্জী। কিন্তু আমার আরও প্রশ্ন আছে। জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, আসামের সবচেয়ে বড় চা-বাগান কোন্‌টি ?

"ম্যাক্‌নীল এ্যাণ্ড্ ম্যাগোর-য়ের বাঘজান বাগানটি, এর আয়তন ৯৯৯ হেক্টর।"

"কত চা হয় সেখানে ?"

"সব বছর কোনো বাগানে সমান চা হয় না। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত হিসেব আমাদের হাতে এসেছে। ঐ বছর বাঘজানে ৭, ৫১, ৬৯৯ কিলোগ্রাম চা উৎপন্ন হয়েছে।"

"আসামের সমস্ত চা-বাগানগুলির মোট আয়তন কত ?"

"১,৮৫, ১১৩ হেক্টর।"

"আসামের সব বাগান মিলিয়ে বছরে কত চা উৎপন্ন হয় ?

"১৯৭৩ সালে উৎপাদন হয়েছে ২৫ কোটি ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার কিলোগ্রামের মতো।"

"সেই চা বিক্রি করে বাগানগুলো কতটাকা পেয়েছে ?"

"ঐ বছর চা-য়ের দাম কম ছিল। তাই আসামে গড়ে চায়ের বিক্রয় মূল্য পাওয়া গিয়েছে কিলো প্রতি ৭·০৮পয়সা। তার মানে ১৯৭৩ সালে প্রায় ১৭৯ কোটি টাকার চা উৎপন্ন হয়েছে এই রাজ্যে। তবে তারপরেই দাম বেড়ে গিয়েছে। এবছর মানে ১৯৭৩ সালে চা-য়ের গড়পড়তা দাম প্রায় ১১ টাকা।"

"কিন্তু ১১ টাকা কিলো চায়ের দাম কি বলছেন! আমরা যে ১৫।২০ টাকার কমে চা খেতে পাই না।"

"পরিবহণ খরচ, সরকারী শুল্ক ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা যোগ হয়। তা-ছাড়া আপনারা সাধারণত ব্লেণ্ড্ করা চা খান। আসামের চায়ের সঙ্গে ডুয়ার্স কিংবা দার্জিলিংয়ের চা মেশানো হয়।" একটু থেমে ডঃ ব্যানার্জী আবার বলেন, "চা-য়ের দাম চা-য়ের গুণের ওপরে নির্ভর করে। ভালো চা ফলিয়ে একটি ছোট বাগান একটা বড় বাগানের চেয়ে বেশি আয় করতে পারে। দার্জিলিঙে এমন বাগান আছে, যার এক কিলো চায়ের দাম ১৫০ টাকা। ১১ টাকা খুব সাধারণ চায়ের দাম।"

ডাঃ ব্যানার্জীর পরে আলাপ হল সুনন্দাদের সঙ্গে। শ্রীমতী সুনন্দা দাশ ও শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ। একই নাম, একই পেশা—দু'জনেই অধ্যাপনা করে স্থানীয় ডি. সি. বি. গার্লস কলেজে। বিষয়ও এক বাংলা। দু'জনে একই হস্টেলে থাকে। দু'জনেই কুমারী ও বয়সে তরুণী। দু'জনের মাঝে খুবই মিল। দুটিতে সর্বদা একসঙ্গে চলাফেরা করে।

অমিল কেবল চেহারায়। শ্রীমতী দাশ দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী ও শ্যামবর্ণা। আর শ্রীমতী ঘোষ ছোট-খাটো রোগা ও ফর্সা। তাকে দেখে মোটেই অধ্যাপিকা মনে হয় না, মনে হয় কলেজে পড়ে।

ব্যস, কথাটা বলতেই শ্রীমতী ঘোষ মানে ছোট-সুনন্দা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রতি-বাদ করে ওঠে, "সবার মতো আপনিও একই কথা বললেন ?"

"তুমি কি ভেবেছিলে, আমি অন্য কিছু বলব ?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে আমাকে অন্য ভাবে আক্রমণ করে, "আপনাকে দেখেও তো মনে হয় না যে···"

"লেখক, মনে হয় কেরানী। আমি সত্যই তাই।" ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেলি।

খুবই লজ্জা পায় বেচারী। তাড়াতাড়ি জবাবদিহি করে, "না, না। ছি, ছি! আমি এসব বলতে চাই নি। আমি বলতে চাইছিলাম, আপনার নাম শুনেও তো আমাদের ধারণা হয়েছিল—আপনি বেশ বুড়ো। আপনার পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, ইয়া লম্বা দাড়ি। আপনাকে দেখেও তো মনে হয় না যে···"

একথাটা আমাকে এমন নিয়মিত শুনতে হয়, যে আজকাল আর এর কোনো জবাব দিই না। কিন্তু সুনন্দার কথা শুনে উপস্থিত সকলেই সোচ্চার স্বরে হেসে উঠলেন। বাধ্য হয়ে আমাকেও সেই সমবেত হাস্য-রোলের সঙ্গে তাল মেলাতে হয়।

সভার শেষে সুনীলবাবু ও সমরেন্দ্রবাবু হোটেলে ফিরে গেলেন। আমি ও দক্ষিণাদা রতনবাবুর গাড়িতে করে লক্ষ্মী য়ুনিয়ন বেঙ্গলী ক্লাবে এলাম। আমাদের সঙ্গে সুবোধবাবু, নিখিলবাবু ও ছুই সুনন্দা।

এই ক্লাবের তরফ থেকেই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এখানেই অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয়। এঁদেরই প্রেক্ষাগৃহে আগামীকাল সকালে সম্মেলন শুরু হবে।

সুবোধবাবু সবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখি। সুন্দর একটি বাংলা গ্রন্থাগার রয়েছে। দেখে ভালো লাগল তার মধ্যে আমার কয়েকখানা বইও আছে।

গ্রন্থাগার থেকে এলাম প্রেক্ষাগৃহে। এখনও সাজ-গোছের পালা শেষ হয় নি। ছেলে-মেয়েরা অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। সবচেয়ে ভালো লাগল সুলিখিত পোস্টারগুলো। প্রথম যেটায় নজর পড়ল, তাতে লেখা, 'সবারে করি আহ্বান—'

সুবোধবাবু রয়ে গেলেন ক্লাবে। পল্টন যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। সুনন্দাদের হস্টেলে নামিয়ে দিয়ে আমরা যখন রতনবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় নটা।

রতনবাবু তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রত্নার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্র-মহিলার যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি মধুর স্বভাব। বেশভূষা, আচার আচরণ, কথাবার্তা, কোনো কিছুই বড় অফিসার-গিন্নীদের মতো নয়। মনে হয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কুলবধূ।

আলাপ হল রতনবাবুর ছুই কন্যার সঙ্গে। বড়টির বয়স ছয়, নাম— রাজসী আর ছোটটির চার, নাম—বিদুষী।

তারা কিন্তু আমার দিকে তেমন একটা নজর দিল না, দক্ষিণাদাকে

নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিমানবন্দর থেকে আসার পরেই তারা দাত্থর কাছে গল্প শুনতে চেয়েছিল। দক্ষিণাদা তখন বলেছিলেন—তুপুরে একটু ঘুমিয়ে নাও। ঘুম ভাঙলেই এঘরে চলে এসো, দারুণ সব গল্প বলব। ঘুম ভাঙতেই তারা ছুটে এসেছিল এঘরে। আর এসেই মাথায় হাত—দাত্থ হাওয়া।

মা অবশ্য ভরসা দিয়েছেন—নারে, না। দাত্থ হাওয়া হবেন কি। দাত্থ আরও অনেক দিন থাকবেন। বাবার সঙ্গে সভায় গিয়েছেন, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবেন।

সেই থেকে তুই শিশুর শুরু হয়েছে প্রতীক্ষা। খেলার সাথীরা এসে ফিরে গিয়েছে। ওরা আজ খেলতে যায় নি। পাছে দাত্থ কোন্ ফাঁকে এসে স্যুটকেসটা নিয়ে পালিয়ে যান, তাই তারা বারান্দায় বসে পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর মাঝে মাঝেই ঘরে এসে স্যুটকেসটা দেখে গিয়েছে। স্যুটকেস যখন আছে, তখন দাত্থকে ফিরে আসতেই হবে। এতক্ষণে তাদের সেই প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। দাত্থ ফিরে এসেছেন। সুতরাং তারা আমার কাছে আসবে কেন?

চায়ের টেবিলে বসে রতনবাবুর আরেকটি পরিচয় পেলাম। ভারতীয় দর্শনে ভদ্রলোকের বেশ পাণ্ডিত্য আর তিনি অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন। কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী সহ বহু তীর্থ দর্শন করেছেন।

নিখিলবাবু ও পল্টনের সঙ্গে যখন হোটেলে ফিরে এলাম, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে কিন্তু কয়েকজন ডেলিগেট এবং স্থানীয় ছেলে-মেয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আর তাদের মধ্যে উমা এবং প্রমথও রয়েছে।

কুমারী উমা ভৌমিক লামডিং কলেজে বাংলার লেকচারার। তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ভাগলপুরে।

প্রমথচন্দ্র ভাওয়াল কোকরাঝাড়ে থাকে। সে এ্যাডভোকেট। চেহারা দেখে অবশ্য কলেজের ছাত্র বলেই মনে হয়। ছোট-খাটো স্বাস্থ্যবান

তরুণ। ওরই জন্য আমার আজ জোড়হাটে আসা।

উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রমথ বলে ওঠে, "দাদা! আপনি আমার মুখরক্ষা করেছেন। সেদিন গৌহাটিতে রাজ্য কমিটির সভায় আমি যখন আপনার নাম প্রস্তাব করেছিলাম, তখন অনেকেই বলেছিলেন—আপনি আসবেন না। আমি তখন জোর করে বলেছিলাম—আপনি কথা দিয়েছেন; আপনি আসবেনই।"

"আমিও কিন্তু জানতাম দাদা যে আপনি আসবেন।" উমা যোগ করে।

"আর সেদিন ভাগলপুরে আমি আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে আপনার?"

"কি কথা বলো দেখি?"

"বলেছিলাম—একবার আসামে আসুন, দেখে যান আসামের মানুষ আপনাকে কত ভালোবাসে।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। আমি চুপ করে থাকি।

প্রমথ বলে, "এবারে আমরা আপনাকে তার প্রমাণ দেব দাদা!"

সহাস্যে বলি, "সে প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি ভাই!"

ওরা বিদায় নেবার পরে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিলাম। রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে। দমদমে আসার জন্য শেষরাতে উঠতে হয়েছিল। সত্যি বলতে কিএখন বেশ একটু ক্লান্ত লাগছে।

তাহলেও শুতে যাবার উপায় নেই। আমি বক্তৃতা করতে পারি না। অথচ এঁরা আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চান। অনেক পয়সা খরচ করে আমাকে এনেছেন, এমন ভালো ভাবে রেখেছেন, এত আদর-যত্ন করছেন।

সুতরাং আজ রাতেই আমাকে একটি ভাষণ লিখে ফেলতে হবে। আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসি। লেখা শুরু করি—

ভারত এক বিশাল ও বিচিত্র দেশ। এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম এবং

নানা মত। কিন্তু এই বিভিন্নতার মাঝেও রয়েছে এক আশ্চর্য সাম্য, বৈচিত্র্যের মাঝে এক মহান ঐক্য। এই ঐক্যের কথা ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার একটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আজ। আর সে প্রয়োজন পূর্ণ করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে সাহিত্য। এখন বোধহয় ভারতীয় ঐক্যের নিকৃষ্টতম অন্তরায় ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ভাষাগত সংকীর্ণতা। ধর্মের কথা থাক্, ভাষার কথাতেই আসা যাক্! আপাতদৃষ্টিতে ভাষার পার্থক্যকে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে ভারতে একটা আশ্চর্য ভাষাগত মিল রয়েছে।

বর্তমান ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষাগুলি দুটি প্রধান ভাষা থেকে উদ্ভূত —আর্য ভাষা ও অনার্য ভাষা। অনার্য ভাষা আবার দুটি অংশে বিভক্ত —অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা। অষ্ট্রিক ভাষা কোল,ভীল ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষার মধ্যে টিকে আছে কোনো মতে। আর দ্রাবিড় ভাষা বেঁচে আছে তামিল, মালয়ালাম, কানাড়ী ও তেলেগু ভাষার ভেতরে। এছাড়া পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষাগুলি আর্য ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে সৃষ্ট।

উত্তর ভারতের ভাষাগুলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলির এখন যত অমিলই হোক, দক্ষিণ ভারতে কিন্তু আজও সংস্কৃতের প্রচুর প্রভাব রয়েছে। আর সে প্রভাব শুরু হয়েছে সুদূর অতীত থেকে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথমেই মনে পড়ছে আদিগুরু শঙ্করাচার্যের কথা। শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের মানুষ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীতে তিনি আসমুদ্র-হিমাচলকে এক অচ্ছেদ্য ধর্মীয় বন্ধনে গ্রথিত করেছিলেন। আর তাঁর সেই ঐক্যবন্ধনের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। তার মানে আজ থেকে বারো-তেরো শ' বছর আগেও উত্তর ভারতের সংস্কৃত দক্ষিণ ভারতে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এবং এ জনপ্রিয়তা আজও কমে নি।

পরবর্তী যুগে ভক্তকবি বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব এবং যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশঙ্করদেব সংস্কৃতকেই তাঁদের কাব্য রচনা ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যম করেছেন। শ্রীশঙ্করদেব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে তাঁর সঙ্গীত

ও নাটকের মাধ্যমে আসামের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনে যে নবযুগের সূত্রপাত করেছেন, তাতে বাংলা উড়িয়া ও হিন্দী সহ প্রায় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়েছে।

এবারে রামায়ণের প্রসঙ্গে আসা যাক্। রামায়ণের অনুবাদ বর্তমান ভারতের প্রতিটি ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানেও লক্ষ্য করবার যে আঞ্চলিক ভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদ হয়েছে তামিলে, অনুবাদ করেছেন কবি কম্বণ। কম্বণের অনুবাদে অনুপ্রাণিত হয়েই বোধকরি তুলসীদাস, কৃত্তিবাস ও মাধব কন্দলি হিন্দী, বাংলা ও অসমীয়াতে রামায়ণের অনুবাদ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্বভারতের ভাষাগুলির বিশেষ করে বাংলা ও অসমীয়া ভাষার জন্মকাহিনীটি বলে নেওয়া দরকার। মধ্যযুগের প্রথম দিকে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতকে মাগধী প্রাকৃত আর্যভাষা বিহার থেকে আস্তে আস্তে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উপনীত হয়েছে। বলা বাহুল্য স্থানীয় প্রভাবে সে ভাষা রূপ পালটেছে—সৃষ্ট হয়েছে অপভ্রংশ এবং তা থেকে একে একে ভোজপুরী, মৈথিলী, উড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া ভাষা। এদের মধ্যে আজও তাই প্রচুর মিল রয়েছে। আর সে মিল সবচেয়ে বেশি অসমীয়া এবং বাংলা ভাষার ভেতরে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ও অসমীয়া ভাষাকে বলেছেন—যমজ বোন। আর তাই জোড়হাটের অসমীয়া পাঠিকা কলকাতার বাঙালী লেখককে আসামে আসার আমন্ত্রণ জানায়।

এবারে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা বলে নিই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা বাংলা সাহিত্যের সম্রাট বলে থাকি। তিনি বাংলা উপন্যাসের জনক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে।

তেমনি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যধারার তিন ভগীরথ হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) এবং চন্দ্রকুমার

আগরওয়ালা (১৮৬৭-১৯৩৮) বাংলা সহ সমস্ত প্রতিবেশী সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন।

একথা শুধু অসমীয়া এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। মীরাবাঈ তুলসীদাস কিংবা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কথা না হয় বাদই দিলাম। সুব্রহ্মণ্যম ভারতী, ভাল্লাথোর, প্রেমচন্দ, কিষাণচন্দর, সুমিত্রানন্দন পন্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি অনেকের নামই উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে। এঁরা কেউই আঞ্চলিকতার গণ্ডীতে আটকে থাকেন নি, সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছেন।

ভাষার বিভিন্নতা যেমন জাতীয় সংহতির অন্তরায় নয়, তেমনি প্রতিবেশী সাহিত্য উন্নত হলে নিজের সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়। অপরের ধর্মস্থানকে কলুষিত করলেই যেমন নিজের ধর্ম বড় হয় না, তেমনি অপরের ভাষাকে আঘাত করলেই নিজের ভাষার উন্নতি আসে না। তাছাড়া এক সাহিত্যের উন্নতি কখনই অপর সাহিত্যের অবনতির কারণ হতে পারে না।

ইংরেজ দু-শ' বছর ধরে আমাদের দেশকে শোষণ করেছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রাম করেছি। কিন্তু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সমস্ত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধন করেছে। ইংরেজীর মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছি, তেমনি ইংরেজীর সাহায্যেই আমরা বিশ্ববিজ্ঞান ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আজ ইংরেজ নেই কিন্তু ইংরেজী রয়ে গিয়েছে। এবং থেকে যাবে, আর তা রাখাই উচিত হবে। না রাখলে ইংরেজীর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমরা পেছিয়ে পড়ব।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ দুঃখের কথা কিন্তু তার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন। আর এই দ্বিতীয় বিভাগটি আমরা নিজেরাই করেছি। একদেশে যদি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ বাস করতে

পারেন, তাহলে এক প্রদেশে কেন পারবেন না? আর এমন প্রদেশ বা রাজ্য কি গঠন করা সম্ভব, যেখানে কেবল এক ভাষাভাষী মানুষই বাস করবেন? তাহলে কেন অযথা আমরা ভাষার নামে দেশ বিভাগ করে দেশকে দুর্বল করে দিয়েছি?

পরিতাপের বিষয় যে কিছু কিছু স্বার্থপর লোকের প্ররোচনায় আমরা এখনও মাঝে মাঝে এই সহজ সত্যকে বিস্মৃত হচ্ছি। নইলে যে দক্ষিণ ভারতের শঙ্করাচার্য উত্তর ভারতের সংস্কৃতকে তাঁর ধর্মপ্রচারের মাধ্যম করেছিলেন, সেই দক্ষিণভারতের মানুষ আজ উত্তরভারতের হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করছেন। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে তামিল তেলেগু কিংবা ইং-রেজীকে বর্জন করতে হবে। আবার হিন্দী রাষ্ট্রভাষা বলেই ইংরেজীকে হটাতে হবে কিংবা ভারতরাষ্ট্রে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোর কোনো অধিকার থাকবে না, একথাও অর্থহীন। আমরা জানি সোবিয়েত য়ুনি-য়নে সরকার স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষার সংখ্যা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু সেদেশে রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক জীবনে ভাষা কোনো সম-স্যাই নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবতার বাণী প্রচার করেছিলেন আর তাঁরই দেশের মানুষ হয়ে আমরা অন্তত ভারত-মানবতার কথা বলতে পারব না? আজ তাই মহাভারতের প্রাগজ্যোতিষে আয়োজিত এই মহতীসভায় দাঁড়িয়ে আসুন আমরা সবাই একযোগে ঘোষণা করি—সাহিত্যের আঙিনায় ভাষাগত প্রাচীর কোনো বাধাই নয়, স্মরণ করি মহাকবির সেই অমৃতময় বাণী—

> 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন'
> —শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
> পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
> দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না, ফিরে—
> এই ভারতের মহা মানবের সাগরতীরে॥'

৫

লক্ষ্মী য়ুনিয়ন বেঙ্গলী ক্লাবের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সকাল ঠিক আটটার সময় শ্রদ্ধেয়া শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী ইন্দিরা মিরি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভ-সূচনা করেছেন। পতাকা উত্তো-লনের পরেই শুরু হয়েছে সমবেত কণ্ঠের উদ্বোধনী সঙ্গীত—

'সবারে করি আহ্বান—
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ॥
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবজীবনদান ॥

ভারী ভালো লাগছে। যেমন গান, তেমনি পরিবেশ। উজ্জ্বল বাসন্তী সকাল, মৃদু-মন্দ মলয় বইছে। উন্মুক্ত অঙ্গনে পতাকাদণ্ডের একপাশে আমরা—অতিথি ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা, আরেক পাশে প্রতিনিধি, সদস্য ও গায়িকারা। গায়িকারা সবাই কিশোরী। তাদের পরণে লাল জামা ও লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। কোনো বাজনা নেই। ওরা উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে—

'আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান ॥
সবারে করি আহ্বান—'

উদ্বোধনী সঙ্গীত শেষ হবার পরে সবার সঙ্গে সভাগৃহে এলাম। নানা রঙের পোস্টার, ফেস্টুন আর ফুলের মালায় সুসজ্জিত সভাগৃহ। মফঃস্বল শহরের বিচারে বেঙ্গলী ক্লাবের এই প্রেক্ষাগৃহটি কোনোমতেই ছোট নয়। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে গেল। অনেকেই

বসার জায়গা পেলেন না। তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। না, কেউ মুখভার করেন নি। আশ্চর্য সাহিত্য প্রীতি এই মফঃস্বলের মানুষগুলোর।

সমবেত সঙ্গীত ও মঙ্গলাচরণের পরে আমাদের বরণ করা হল সভা-মঞ্চে। প্রবল হর্ষরোলের মাঝে আমরা আসন গ্রহণ করলাম। শুরু হল সম্মেলন।

অসম সাহিত্য সভার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্মা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন—

আসামের অতি আপন জাতীয় উৎসব রঙালী বিহুর সময়ে জোড়হাটে এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে আপনারা বড়ই ভালো কাজ করেছেন। সাহিত্যই পরকে আপন করে। সে বাইরের আবরণ ভেদ করে অন্তরকে স্পর্শ করে। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি ও ঔপন্যাসিকের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্য আজ অনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় যে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সৃষ্ট হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তারও আভাষ দিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভারতের সর্বজনীন আত্মা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, উচ্চ সাহিত্য যে ভাষাতেই রচিত হোক, তাকে ভূগোল বা ইতিহাস বেঁধে রাখতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। এবং এই সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করবে বলেই আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস।

ভালোই বললেন ভদ্রলোক, মানুষটিকেও ভালো লাগে আমার। ভারী ভদ্র এবং বিনয়ী, ছোট-খাটো সাধারণ চেহারার এই মানুষটির অসা-ধারণ শিক্ষানুরাগ, সাহিত্য প্রীতি ও কর্মক্ষমতার কথা আমি আগেই শুনেছি। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা থেকে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেন এবং ঐ বছরই কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে জোড়হাটে আপার-আসামের প্রথম কলেজ (জগন্নাথ বরুয়া কলেজ) স্থাপন করলেন। তিনি পনেরো বছর ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

তারপরে নওগাঁতে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে অধ্যক্ষ রূপে যোগদান করেন। তিনি আসাম অধ্যাপক সমিতির সভাপতি।

স্কুল জীবন থেকেই শ্রীশর্মা সাহিত্যচর্চা করে এসেছেন। তাঁর কবিতা বহু বছর ধরেই আসামের স্কুল-কলেজে পড়ানো হচ্ছে। অসমীয়া সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি এখন একান্তভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এ বছর অসম সাহিত্য সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এখন অসমীয়া কাব্যের ওপরে ইংরেজীর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর বক্তৃতার পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরাধানাথ বরঠাকুর তাঁর মুদ্রিত ভাষণ পাঠ শুরু করছেন। তিনি পড়ছেন—

'সাহিত্যের স্বরূপ আর তাৎপর্য নিয়ে বহুমত থাকলেও একথা সকলেই স্বীকার করেন যে সাহিত্য আবহমান কাল থেকে সমস্ত মানুষকে একই প্রাঙ্গণে সমবেত হবার আহ্বান জানিয়ে এসেছে।···

'সাহিত্যিকরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেন নি, এর মূলে রয়েছে জনসাধারণের ঐকান্তিক এবং অনলস প্রচেষ্টা। সাহিত্যানুরাগই আমাদের এই সম্মেলনের আয়োজন করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা সাহিত্যপাঠক, সাহিতস্রষ্টা নই। তথাপি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে একমাত্র সাহিত্যই আমাদের গ্লানিমুক্ত করে মনুষ্যত্বের মুক্ত অঙ্গনে নিয়ে যেতে পারে।···

'সাহিত্য স্থান, দেশ, কাল ও পাত্রের অনেক ওপরে কারণ এর আবেদন চিরন্তন। আর তাই চিরকাল সাহিত্য সকল মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এসেছে এবং এখানেই সাহিত্যের সার্থকতা।···

জোড়হাটের এই সাহিত্য সম্মেলনের একটা বিশেষ তাৎপর্য এই যে এ বছর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী। শরৎসাহিত্যের আবেদন সারা ভারতে পবিব্যাপ্ত। ভাষা এবং ধর্মের ওপরে থেকে শরৎ-সাহিত্য সারা ভারতের মানুষকে উদ্বেলিত করে আসছে।··

'জোড়হাট অসম সাহিত্য সভার মূল-কেন্দ্র এবং সামগ্রিক ভাবে আসামের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম স্নায়ুকেন্দ্র। এখানে অসম সাহিত্যের একটি ধারা বিশেষ ভাবে পুষ্ট হয়ে আসাম তথা সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য চিন্তাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। সাহিত্যরথী লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়া এই জেলারই অবদান।···

'জোড়হাটে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমি বিশেষ ভাবে গৌরব অনুভব করছি। আমি একান্তভাবে আশা করি যে এই সম্মেলনে আসাম ও বাংলার সাহিত্যিকগণ পরস্পরকে পরস্পরের পরিপূরক হতে সাহায্য করবেন এবং যথার্থ কৃষ্টিমূলক সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করবেন।···

সুনীলবাবু, সমরেন্দ্রবাবু এবং আমাকেও সামান্য কিছু বক্তব্য রাখতে হল। দক্ষিণাদা ও রতনবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে, আগামীকাল বিকেলে জেলা গ্রন্থাগার ভবনের প্রকাশ্য অধিবেশনে আমি লিখিত ভাষণটি পাঠ করব।

আমাদের পরে উঠে দাঁড়ালেন আসামের গৃহ এবং সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহিতেশ্বর শইকীয়া। তিনি সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থ 'অভিজ্ঞান'-য়ের শুভ-উন্মোচন করে বললেন—

অন্তরের ভাব বোঝাবার জন্য ভাষা কোনো প্রাচীর হতে পারে না। আসাম ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ থাকবেনই। আন্তরিকতার সঙ্গে এখানে এককে অপরের কথা বুঝতে হবে। আমাদের ভেতরে যেমন অরাজকতা সৃষ্টি করবার জন্য বিভিন্ন শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তেমনি যথেষ্ট আন্তরিকতাও আছে। এই সম্মেলনের ভেতর দিয়ে এখানে যে প্রেমের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পরিবেশ সর্বত্র গড়ে তুলতে হবে এবং তাকে লালন-পালন করতে হবে। তবেই আমরা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠন করতে সক্ষম হব।

এই পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রধান দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘুদের মনকে তাঁদের বুঝতে হবে।···মনের মিল থাকলে সংখ্যালঘুরা

সর্বদা সহযোগিতা করবেন। যেমন করেছেন লামডিং-য়ে।
আপনারা জানেন, লামডিং-য়ের শতকরা ৯৯ জনই বাঙালী। কিন্তু সেখানে একটি চমৎকার অসমীয়া নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠেছে। আর সেই মঞ্চটির শতকরা ৯৯ভাগ ব্যয়ভার বহন করেছেন বাঙালীরা। জাতীয় সংহতির এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? স্বভাবতই খবরটি পেয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।
সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন দক্ষিণাদা। তাঁর অনেক দায়িত্ব। আমরা আসামে এসেছি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে। এসেছি প্রেম ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে, বাংলা ও আসামের মিলনের কথা বলতে। দক্ষিণাদা শুধু আমাদের নায়ক নন, তিনি আসামবাসী বাঙালীদেরও নেতা।
চমৎকার ভাবে দায়িত্ব পালন করলেন দক্ষিণাদা। বললেন—
শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসাম এবং বাংলা যুগে যুগে একই সঙ্গে পথ চলেছে। চিরকাল আমাদের একই সঙ্গে চলতে হবে। কখনও যদি কোনো বিভেদকামী শক্তি আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের বীজ বুনতে সক্রিয় হয়, তখন সাহিত্য এগিয়ে আসবে। কারণ সাহিত্য সর্বদা মিলন এবং সংহতির বাণী বহন করে। 'আমি আটায়ে ভারতীয়' এই চিন্তায় বিভোর হয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে হবে।
সাহিত্যে সংকীর্ণতার স্থান নেই। কালের স্রোতে রাজনীতির আদর্শ বদলে যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের বাণী বদলায় না। সে বাণী সত্য প্রেম ও পবিত্রতার বাণী, প্রেম প্রীতি ও মিলনের বাণী।
আরও অনেক কথা বললেন দক্ষিণাদা। খুবই ভালো বক্তৃতা দিলেন তিনি। অবশেষে তিনি এই সম্মেলন ও জোড়হাট সম্পর্কে বললেন—
এখানে আসার পর থেকে জোড়হাটের আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে অসমীয়া ভাই-বোনদের কাছ থেকে আমি যে আন্তরিক স্নেহ এবং শ্রদ্ধা পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া এ সম্মেলন কিছুতেই সফল হতে পারত না। সুতরাং সবাইকে আমি আমার অন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

হোটেলে ফিরে এসেই দুঃসংবাদটা পেলাম। রতনবাবু জানালেন, "আমরা খুবই দুঃখিত, এবারে আপনাদের কাজিরাঙা দেখা হল না।"

"কেন বলুন তো?" সুনীলবাবুর সঙ্গে সমস্বরে প্রশ্ন করি।

রতনবাবু উত্তর দেন, "হাতি পাওয়া গেল না।"

"তাতে কি? গাড়ি করে ঘুরব।"

একটু হেসে রতনবাবু বলেন, "কাজিরাঙা হাজারীবাগ ন্যাশনাল ফরেস্ট-য়ের মতো নয়। এখানে বনের ভেতরে গাড়ি চলাচলের পথ নেই। আর যাদের জন্য যাওয়া, সেই গণ্ডাররা বড় একটা বাস রাস্তার ধারে আসে না। হেঁটে ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু আমরা···চাই না যে আপনারা সেভাবে কাজিরাঙা দেখেন।"

সুতরাং আমাদের কাজিরাঙা দর্শন করার সৌভাগ্য হল না।" সহাস্যে বলি।

"ক'টা হাতি আছে?" সমরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করেন।

রতনবাবু জানান, "এগারোটা—সবগুলোই বন-বিভাগের শিক্ষিত হাতি। প্রত্যেকটিতে তিনজন করে পর্যটক বসতে পারেন।"

"তার মানে দৈনিক তেত্রিশজন যাত্রী বনভ্রমণ করতে পারেন?"

"না, ছেষট্টি জন। দুবার করে হাতি বনে যায়—সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা আর বিকেল আড়াইটে থেকে সাড়ে পাঁচটা। মাইল দশেক পথ ঘুরে তারা ফিরে আসে।"

"তা সত্ত্বেও আমরা হাতি পেলাম না। এত লোক ওখানে গণ্ডার দেখতে যান?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ।" রতনবাবু উত্তর দেন, "উনিশ এবং বিশ তারিখে একটা হাতিও খালি নেই। কারণ কি জানেন?"

"কি?"

"আমেরিকানরা বলেন—'You cannot miss it.' কথাটা মিথ্যে নয়। অন্য সমস্ত অভয়ারণ্যে আপনি সারাদিন সারারাত ঘুরেও কোনো বন্যপ্রাণীর সাক্ষাৎ না পেতে পারেন, কিন্তু হাতির পিঠে চড়ে কাজি-

রাঙায় গেলে আপনি গণ্ডার দেখতে পাবেনই। তবে অন্যান্য প্রাণী, বিশেষ করে বাঘ না-ও দেখতে পারেন। আমি দু-বার হাতির পিঠে চড়ে ভেতরে গিয়েছি। একবারও বাঘ দেখতে পাই নি। তবে দ্বিতীয়-বারে বাঘের গন্ধ পেয়েছিলাম।

"যাক্‌গে যেকথা বলছিলাম, গণ্ডার দেখা যায় বলেই এখানে ট্যুরিস্টদের এত ভিড়। আর অক্টোবর থেকে এই এপ্রিল মাস পর্যন্তই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময়। তাই অনেক আগে 'বুক্' করে না রাখলে এসময় হাতির পিঠে জায়গা পাওয়া যায় না।"

"আচ্ছা, হাতির পিঠে চড়ার জন্য জনপ্রতি কত করে দিতে হয় বন-বিভাগকে ?"

"এগারো টাকা। তবে ক্যামেরা থাকলে, প্রতি 'স্টিল' ক্যামেরার জন্য পাঁচটাকা ও 'মুভি' ক্যামেরার জন্য পঁচিশ টাকা করে অতিরিক্ত দিতে হয়।"

"যারা গাড়ি করে যেতে পারেন না, তাঁরা কিভাবে যান ?"

"বাসে করে। কাজিরাঙা জোড়হাট থেকে ৫৫ মাইল আর গৌহাটি থেকে প্রায় ১৩০ মাইল।"

"ট্যুরিস্টরা কোথায় থাকেন ?"

"ট্যুরিস্ট বিভাগের দুটি 'ট্যুরিস্ট লজ্' ও একটি 'ফরেস্ট লজ্' আছে কাজিরাঙায়। ট্যুরিস্ট লজ্ দুটি রয়েছে শিবসাগর জেলার কোহারাতে, আর ফরেস্ট লজটি নওগাঁ জেলার বাগুরিতে। বাগুরিতে পর্যটকদের রান্না করে খেতে হয়। কোহারাতে ক্যান্টিন আছে। সেখানে খাবার কিনতে পাওয়া যায়। কোহারাতে দুটি লজের দু-রকম ঘর ভাড়া। সাহেবী কায়দার বাংলোটিতে প্রতি 'স্যুইট'-য়ের দৈনিক ভাড়া চল্লিশ টাকা, আর দিশীটিতে বিশ টাকা।"

"কাজিরাঙা কি শিবসাগর ও নওগাঁ দু-জেলা জুড়েই ?"

"হ্যাঁ। কাজিরাঙা অভয়ারণ্যের অর্ধেক এই শিবসাগর জেলায়, বাকি অর্ধেক নওগাঁ জেলায়। ব্রহ্মপুত্র এবং ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝ-

খানে আগে প্রায় ২০০ বর্গমাইল জুড়ে ছিল এই বনাঞ্চল। কিন্তু তার মধ্যে ২০/২৫ বর্গমাইল জায়গা ব্রহ্মপুত্র গ্রাস করে নিয়েছে। এখন কাজিরাঙার আয়তন দাঁড়িয়েছে ১৭৫ থেকে ১৮০ বর্গমাইল। ওখানে প্রায় ৮০০ এক-শিংওয়ালা বড় গণ্ডার আছে। ইংরেজীতে যাদের বলে 'Single horned Rhinos. It is the biggest single horned Rhino sanctuary on earth.

"এক-শিংওয়ালা বড় গণ্ডার আসামের অন্যান্য বনাঞ্চলেও কিছু আছে। আছে উত্তরবঙ্গ এবং নেপালে। অনেকে বলেন ছোট আকারের এক-শিং ও দু-শিংয়ের কিছু গণ্ডারও রয়েছে আসামের পূর্বাঞ্চলে। তারা দেখতে কাজিরাঙার গণ্ডারদের মতো নয়, একটু আলাদা ধরনের।

"গণ্ডার ছাড়া কাজিরাঙায় রয়েছে বিভিন্ন জাতের বারো-চোদ্দ শ' হরিণ, অসংখ্য বুনো শুয়োর আর বুনো মোষ, কিছু বুনো হাতি আর ন'দশটি বাঘ। সারা বনাঞ্চল স্যাঁতস্যাঁতে, জলাভূমিতে বোঝাই। বেশ কয়েকটি ছোট নদী তার বুক চিরে বয়ে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। আগেই বলেছি কাজিরাঙার সারা উত্তরদিক জুড়ে ব্রহ্মপুত্র। বন্যায় সে প্রায় প্রতি বর্ষায় প্লাবিত হয়।"

সুনীলবাবু ও সমরেন্দ্রবাবু নিজেদের ঘরে চলে যান।

রতনবাবু দক্ষিণাদাকে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। বিকেল তিনটায় সাহিত্য-বাসর শুরু হবে। তার আগে ওঁদের স্নান খাওয়া শেষ করে ফিরে আসতে হবে।

নিখিলবাবু ও পল্টনশুধু রইল আমার ঘরে। ওঁদের কোনো তাড়া নেই। নিখিলবাবু এই হোটেলেই উঠেছেন আর পল্টনদের বাড়ি 'ক্যালী বিল্ডিংস' আমার হোটেল থেকে মাত্র মিনিট দুয়েকের হাঁটাপথ।

কথায় কথায় পল্টন বলে, "আপনাদের যখন কাজিরাঙায় যাওয়া হচ্ছে না, তখন পরশুদিন শিবসাগর দেখে আসুন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর, ভালো লাগবে আপনাদের।"

"কতক্ষণ লাগবে যাতায়াতে?" জিজ্ঞেস করি।

পল্টন উত্তর দেয়, "মাত্র তো ৩৫ মাইল।"

"বাস যায়?"

"হ্যাঁ। এক্সপ্রেস ও সুপার ত্ব-রকম বাসই নিয়মিত যাতায়াত করে, ভাড়া ৩'৭০ পয়সা থেকে ৫'৫০ পয়সা। কিন্তু আপনি এসব জেনে কি করবেন। আপনি কি ভেবেছেন আমরা আপনাদের বাসে চড়িয়ে শিব-সাগর দেখতে পাঠাবো?"

পল্টনের সঙ্গে নিখিলবাবুও হেসে ফেলেন। হাসি থামলে পল্টন বলে, "আপনারা যাবেন কিনা তাই বলুন, কিভাবে যাবেন, সে ভাবনা আমাদের।"

"সুযোগ পেলে যাবো বৈকি।"

"বেশ, তাহলে আপনি পরশুদিন সকালে শিবসাগর যাচ্ছেন।"

"আমার একটা প্রস্তাব আছে।" পল্টন থামতেই নিখিলবাবু বলেন।

"কি প্রস্তাব?" জিজ্ঞেস করি।

নিখিলবাবু বলেন, "আপনারা তো এখান থেকে গৌহাটি যাবেন?"

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিই।

"তাহলে এক কাজ করুন—শিবসাগর থেকে আবার এখানে ফিরে না এসে, চলুন ওখান থেকে ডিব্রুগড় চলে যাওয়া যাক্। ডিব্রুগড় থেকেই গৌহাটির প্লেন ধরবেন। শিবসাগর থেকে ডিব্রুগড় মাত্র ৫০ মাইল। সকালে এখান থেকে রওনা হলে আপনারা শিবসাগর দেখে বেলা ছুটোর মধ্যে ডিব্রুগড় পৌঁছে যাবেন।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। নিখিলবাবু ডিব্রুগড়ে থাকেন, তাই তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু আমার কাছে ডিব্রুগড় অন্য কারণে দর্শনীয়। আমার বাবা কিছুকাল ডিব্রুগড়ে ছিলেন। ছোটবেলায় তাঁর কাছেই আমি প্রথম ডিব্রুগড়ের নাম শুনেছি। পরলোকগত পিতৃদেবের কর্মভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা সন্তানের সহজাত।

কিন্তু বাদ সাধে পল্টন। সে বলে "শিবসাগর থেকে এখানে ফিরে না এলে আপনাদের পরশুদিন যাওয়া হবে না।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "কেন?"

"জোড়হাটের মানুষ আপনাদের ভালোবেসে ফেলেছেন। তাঁরা অন্তত একটি দিনের জন্য আপনাদের সভার বাইরে কাছে পেতে চান। কাল রাত পর্যন্ত তো আপনারা সভাতেই থাকবেন। কাজেই পরশু সকালে আপনাদের জোড়হাট ছাড়া চলবে না। ডিব্রুগড় যেতে হলে, পরশুর পরদিন অর্থাৎ বিশ তারিখ সকালে শিবসাগর যেতে হবে।"

সহাস্যে বলি, "রতনবাবু বলেছেন, পল্টন আপনাদের ফেরার টিকেট কেটে দেবে। সুতরাং আপত্তি করে কোনো লাভ হবে কি?"

নিখিলবাবু ও পল্টন বিদায় নেবার পর স্নান করেখেয়ে নিলাম। তিনটেয় সাহিত্য-বাসর। হাতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় আছে। একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক্। কাল অনেক রাতে শুয়েছি।

তাই বলে ঘুমিয়ে পড়ি না। ঘুম নেই আমার চোখের পাতায়। জোড়হাটে এসেও কাজিরাঙা যেতে পারলাম না, অথচ অনেকে কাজিরাঙা যাবার জন্যই জোড়হাটে আসেন। এখানকার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার সেখানে হাতি, গাইড এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন।

আরও দুর্ভাগ্যের কথা এই ম্যাড্রাস হোটেলের নিচের তলাতেই ফরেস্ট অফিসারের দপ্তর। সেই অফিসের সামনে গণ্ডারের খানদুয়েক বড় ছবি টাঙানো আছে। আছে বড়বড় করে লেখা কাজিরাঙায় যাবার আমন্ত্রণ। প্রতিবার যাওয়া-আসার পথে আমি সেই গণ্ডারের ছবি দেখছি, বনবিভাগের আমন্ত্রণলিপি পড়ছি। অথচ আমার যাওয়া হল না কাজিরাঙা। বেশ বুঝতে পারছি, কাজিরাঙা দেখার জন্যই আমাকে আবার জোড়হাটে আসতে হবে।

শুয়ে শুয়ে তাই কাজিরাঙার কথাই ভাবতে থাকি, আমার সহকর্মী রঞ্জেশ—চেতলার রঞ্জেশ মুখোপাধ্যায়, মাত্র মাস দুয়েক আগে কাজিরাঙা ঘুরে গিয়েছে। তারা পায়ে হেঁটে বনে ঘুরেছে, গণ্ডার দেখেছে। রঞ্জেশের সেই গণ্ডার দর্শনের কাহিনী আজও স্পষ্টমনে আছে আমার। রঞ্জেশ বলেছে—

জোড়হাট থেকে কাজিরাঙার পাহাড়ী পথ যেমন চড়াই-উৎরাই, তেমনি আঁকাবাঁকা। গাড়ির জানলার পাশে বসে আমি প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি ঘুরতে ঘুরতে কখনও ওপরে উঠছিল, কখনও নিচে নামছিল। নিচের দিকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট 'ঝুপড়ি' আর ওপরের দিকে পাহাড়ের গায়ে অজস্র ঝরণা।

জানা-অজানা ছোট-বড় পাখির দল আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। পথের পাশে গাছের সারি আর নানা রঙের বনফুলের মেলা।

"সন্ধ্যার আগে আমরা কোহারা পৌঁছলাম। দিশী বাংলোতে একটা 'কটেজ' পেলাম। বেশ বড় একখানি 'হল'ঘর ও রান্নাঘর নিয়ে কটেজ। আমরা সংখ্যায় চল্লিশজন। কিন্তু হলঘরটিতে সবার শোবার জায়গা হ'ল। ঘরটির সামনে ও পেছনে রোয়াক। পেছনের রোয়াকে রান্নার ব্যবস্থা করতে হল, কারণ রান্নাঘরটি খোলা গেল না।

"এখানে সবই কাঠ অথবা বাঁশ এবং টিনের বাড়ি। দেখতে ভারী সুন্দর। য়ুরোপিয়ান স্টাইলের ট্যুরিস্ট বাংলোটি দেখা যাচ্ছিল আমাদের কটেজ থেকে। ওখানে বিজলীবাতি আছে। সে কটেজগুলো একটু উঁচুতে টিলার ওপরে, এখান থেকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। আমরা ওখানে জায়গা পাই নি। অনেক আগের থেকে চিঠি না লিখলে জায়গা পাওয়া যায় না ওখানে।

"পরদিন। শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠতে হল। ভোর ঠিক পাঁচটায় দল বেঁধে কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আধঘণ্টা হেঁটে বনের দ্বারদেশে পৌঁছলাম। সবাইকে ১·৪০ পয়সা করে দর্শনী দিতে হল।

"বনে প্রবেশ করেই প্রথম দেখতে পেলাম দেড়তলার সমান উঁচু একটি কাঠের 'টাওয়ার।' সেটির ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বনভূমি নজরে এলো, কিন্তু গণ্ডার চোখে পড়ল না।

"টাওয়ার থেকে নেমে আসার পরে গাইড বললেন—কেউ আমার অবাধ্য হবেন না। যা বলব, দয়া করে শুনবেন। আর বনের ভেতরে কেউ কথা বলবেন না। মনে রাখবেন, সামান্য অসাবধানতায় মহাবিপদ

ঘটে যেতে পারে।

"সরু পায়ে-চলা পথ দিয়ে আমরা গাইডের পেছনে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। পথের দু-ধারে বড়-বড় ঘাস। এত বড় এবং ঘন যে তার ভেতরে যে-কোনো জন্তু অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। দূরে ছোট-বড় জলাশয় আর ঝোপঝাড়। বড় গাছও দেখতে পাচ্ছি কোথাও কোথাও। আবার সবুজ ঘাসে ছাওয়া ফাঁকা মাঠও চোখে পড়ছে। চারিদিক দেখতে দেখতে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি।

কিছুদূর এসে একপাল হরিণের দেখা পেলাম। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। আমাদের দেখতে পেয়েই তারা চোখের পলকে কোথাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি। ওখানে ঘাসগুলোর এ অবস্থা কেন? মনে হচ্ছে কেউ বা কারা ঘাসগুলো দলে-পিষে রেখে গিয়েছে। গাইড জানালেন—কিছুক্ষণ আগেই এখানে গণ্ডারে গণ্ডারে লড়াই হয়ে গেছে।

"আহা! এমন দৃশ্যটি দেখা হল না! দুঃখিত অন্তরে এগিয়ে চলি।

"—ঐ যে গণ্ডার! জনৈক সহযাত্রীর চিৎকারে আমার চমক ভাঙে। তাকিয়ে দেখি খানিকটা দূরে সত্যই একটি গণ্ডার। সে এদিকেই আসছে। মুহূর্তে পা-দুখানি যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল। নিজের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছি। একটা অনাস্বাদিত ভয় আর অবর্ণনীয় আনন্দে আমি বিহ্বল হয়েছি। আমার চোখের পলক পড়ছে না।

"গাইডের কথায় সম্বিত ফিরে এলো। গাইড বললেন—কেউ কোনো শব্দ করবেন না। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলুন। শব্দ পেলেই গণ্ডারটা ঘাসের আড়ালে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

"তবু ভালো, গাইড বললেন না—আক্রমণ করবে। সেক্ষেত্রে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। আমরা অস্ত্রহীন।

"গাইড আগেই তাঁর অবাধ্য হতে বারণ করেছেন, সুতরাং ফলাফল চিন্তা না করে আমরা শব্দহীন পদক্ষেপে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চলি।

"জলাশয়ের তীর থেকে গণ্ডারটা এদিকেই আসছে। সে আপন মনে পথ চলেছে। তাড়াতাড়ি তার কাছে পৌঁছবার জন্য গাইড আড়াআড়ি ভাবে পথ চলেছেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি। "একটা ছোট কাঠের সাঁকোর কাছে এলাম। গণ্ডারটা এখন আমাদের থেকে বড়জোর হাত তিরিশেক দূরে রয়েছে। সে এখনও আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা যে সোজা সামনে ছাড়া আর কোনোদিকে নজর দেয় না।

"সে আপন মনে পথ চলেছে। তবে এইমাত্র সে তার গতির দিক পরিবর্তন করল। হয়তো এদিকে মানুষ আসে বলেই আর আমাদের দিকে না এগিয়ে ডানদিকে চলে যাচ্ছে।

"এবারে সে ক্রমেই দূরে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বের করি। গণ্ডারটি নিজের খেয়ালে পথ চলেছে। আমরা তার ছবি নিই। সে লম্বায় ছ-সাত ফুট এবং উঁচুতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট হবে বলে মনে হচ্ছে। কাজিরাঙার গণ্ডার শুনেছি ছ'ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় আর ওদের শিং পনেরো যোল ইঞ্চি লম্বা। তবে চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা শিংওয়ালা গণ্ডারও দেখা গেছে এখানে।

"বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমরা প্রাণ ভরে তাকে দেখলাম। আমার নয়ন ও মন সার্থক হল। ভয়ঙ্কর গণ্ডারের এমন অপরূপ রূপ আমি আর কখনও দেখি নি। জীবনে আরেকবার সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই অমর উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করলাম—'বন্যরা বনে সুন্দর···।'

"গণ্ডারটি চলে যাবার পরে আমরা আবার পথ চলা শুরু করলাম। গাইড বললেন—আপনারা ভাগ্যবান, পায়ে হেঁটে এত কাছের থেকে গণ্ডার বড় একটা দেখা যায় না।

"কিছুক্ষণ হেঁটে একটা জলাশয়ের কাছে এলাম। কয়েকটা জলহস্তী দেখছি জলে গা ডুবিয়ে রয়েছে। বিস্মিত হলাম! কাজিরাঙায় বুনোহাতি আছে কিন্তু জলহস্তী আছে বলে শুনি নি তো!

"হেসে গাইড বলেন—জলহস্তী নয়, ওরাও গণ্ডার।"

"না, আমরা সত্যই ভাগ্যবান।

"বেশ কিছুক্ষণ ধরে গণ্ডারদের জলক্রীড়া দেখে আমরা আবার এগিয়ে চলি। কিন্তু খুব বেশিদূর এগোতে পারি না। সহসা পায়ে-চলা পথটি শেষ হয়ে গেল। আর সেখানেই একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, যার অনু-বাদ করলে দাঁড়ায়—সাবধান। সামনে বিপদ।

"গাইড বললেন—এখান থেকেই ঘনবন শুরু হয়েছে। পায়ে হেঁটে ওদিকে যাওয়া নিষেধ।

"অতএব থামতে হয়। শেষ হল আমাদের কাজিরাঙা দর্শন। আমরা সভ্য পৃথিবীর সভ্য মানুষ। তাই বন থেকে ফিরে চলি লোকালয়ে। ঘড়িতে এখন ন'টা বেজে কয়েক মিনিট। তার মানে আমরা বনের ভেতরে সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো পদচারণা করেছি। ফিরে যেতে অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে বলে মনে হচ্ছে না।"

৬

বিকেল তিনেটয় সাহিত্য-বাসর শুরু হল। কালই ঠিক হয়েছিল, আজ-কের আলোচনার বিষয়বস্তু শরৎচন্দ্র। প্রথমেই 'অভিজ্ঞান' থেকে ডাঃ বরুণদেব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী সুনন্দা দাশ-য়ের লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করলেন।

প্রবন্ধের নাম 'শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তার দুই-একটি দিক'। প্রবন্ধটি ভালো লাগে আমার। সুনন্দা লিখেছে, 'আজকের সাহিত্যবিচারে সাধারণ পাঠকের অভিযোগ, সাহিত্য আজ বে-আব্রু, শ্লীলতাবর্জিত। সাহিত্য-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-পারম্পর্যে নীতিবোধ নিয়ে তর্কের চিরন্তন অস্তিত্ব। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকরা নীতিশাস্ত্রকে "পোয়ে-টিক্‌স"-য়ের অন্তর্ভূত করতে চান নি—"এথিক্‌স"-য়ের অন্তর্ভূত বলে মনে করেছেন। তবে অশ্লীলতা যে কাব্যদেহের দোষ, একথা বেশিরভাগ কাব্যমীমাংসকই স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য আবার গ্রীক দার্শনিক প্লেটো থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী সাহিত্যেও পিউরিটান রুচি-বাগীশরা কাব্যের নৈতিক বিশুদ্ধি-রক্ষায় তৎপর হয়েছিলেন।···

"মানুষের মধ্যে এই যে দুটো ভাগ, একটা দৈহিক এবং অপরটি মান-সিক, একটি পাশব অন্যটি আধ্যাত্মিক, এর কোন্ মহলটি সাহিত্যে স্থান পাবে, এই হচ্ছে প্রশ্ন।" এর কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই শরৎচন্দ্র মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতকে সমর্থন করেছেন এবং সাহিত্য-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে নিযুক্ত দুঃশাসনীয় লেখকদের সচেতন করতে চেয়ে বলেছেন,—"গাছের শিকড় গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হউক, তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্যও যায়, প্রাণও শুকায়।···"

'সাহিত্য-বিচারে শরৎচন্দ্রের মৌলিক চিন্তাধারা এখনও অভয়মন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে এবং এখনকার শুচিবায়ুগ্রস্ত "গেল-গেল" বা "ছি-ছি" ভাবটাকেও খণ্ডিত করতে পারবে বলে মনে হয়। তাঁর মতে, "আবর্জনাই হ'ল সকল সাহিত্যের বনিয়াদ, তাহারাই সাহিত্যের

'তবে তিনি একথাও বলেছেন, "নোঙরামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয়, একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না।"...

নিজের লেখা পঠিত হবার পরে সুনন্দা অভিজ্ঞান থেকে আরেকটি প্রবন্ধ পাঠ করল। প্রবন্ধটির নাম 'মানব-দরদী শরৎচন্দ্র', লিখেছেন গৌহাটির ডঃ গৌরী কর। গৌরীদেবী এখানে আসতে পারেন নি।

গৌরীদেবী তাঁর প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রকে ভারতীয় গণসাহিত্যে সর্বজন গণপতি বা সিদ্ধিদাতা গণেশ বলে প্রণাম জানিয়েছেন। লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্রকে আমি গণ-সাহিত্যের সর্বজনীন গণপতি বলেছি এই জন্যে যে, শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম তার সৃষ্টির প্রাঙ্গণে গণ-দেবতার প্রতিষ্ঠা করলেন।... আধুনিক বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা শরৎচন্দ্রকেই গণসাহিত্যের প্রথম দিশারী বলে অভিনন্দিত করি।...'

'তিনি যুগসচেতন ঔপন্যাসিক ছিলেন বলেই তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে যুগবাণী বিধৃত হয়েছে; তা হচ্ছে নব মানবিকতার বাণী; মানবিকতাবাদ।'...

'মানুষের কল্যাণ ও শুভানুধ্যানেই এই সাহিত্য একটি সার্বিক প্রেম-চেতনায় জাগৃতি লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা ও প্রেমচেতনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানবিক ধর্মই তাঁর সহজ আত্মপ্রত্যয়; আবার এটাই তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য।...

'ভোগ ও ত্যাগের এমন পাশাপাশি চিত্র তৎকালীন কেন, আজ পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের আর কোনো সাহিত্যিকের সৃষ্টির মধ্যে এমন অপরূপ

মাধুর্যের চারুতা নিয়ে দেখা দেয় নি। গণ-সাহিত্যের গগনাঙ্গনে মানবিকতার এই দিগন্ত-নির্দেশের জন্যেই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আধুনিক সাহিত্যের দিশারী বলে অভিনন্দিত করি।...'

পঠিত হবার পরে প্রবন্ধ দুটি নিয়ে সামান্য কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। আলোচনায় অংশ নিলেন ডঃ ইন্দিরা মিরি, দক্ষিণাদা, সুনীলবাবু ও সমরেন্দ্রবাবু। আমাকেও বলতে হল দুয়েকটি কথা।

এটি শরৎ জন্মশতবার্ষিকী বলে আজকের এই সাহিত্য-বাসরটি শরৎ-সাহিত্য আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। আলোচনার পরে স্থির হল আগামীকাল প্রভাতী অধিবেশনের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রসাহিত্য ও কবি-সম্মেলন।

এখনও আমাদের হাতে-কিছু সময় রয়েছে। তাই স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাকতি অভিজ্ঞানে প্রকাশিত তাঁর অসমীয়া প্রবন্ধটি পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্র দর্শনর চমু পরিচয়।' চমু শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত। অসমীয়া ভাষায় চ-য়ের উচ্চারণ 'স'। আর ওঁরা 'স'-কে বলেন 'হ।' ওঁরা 'র' লেখেন এইভাবে 'ৰ' আর 'ব' এইভাবে 'ৰ।' অথবা 'ব'।

ডঃ কাকতি পড়ে চলেছেন—

'জীৱনৰ অভিজ্ঞতাক (অভিজ্ঞতাকে) সামগ্রিকভাবে ধৰি তাৰে সুখদুখ, শুভাশুভ, আদর্শ আৰু (আর) সংঘাতৰ মাজত (মাঝে) যি (যে) গূঢ়ার্থ নিহিত থাকে তাক (তাকে) যি জনে সম্যকৰূপে ৰসোত্তীর্ণ কৰি ব্যক্ত কৰিব (করতে) পাৰিছে, তেওঁহে (তিনিই) প্রকৃত কবি।...

'বেদ আৰু উপনিষদৰ দেশ এই ভারতবর্ষ। ইয়াৰ (ইহার) আকাশ আৰু বতাহত (বাতাসে) প্রাচীন সত্যদর্শী ঋষি সকলৰ বাণী যুগ-যুগান্তর ধৰি প্রতিধ্বনিত হৈ আছে (হয়ে এসেছে)।...কবিৰ জীৱনদর্শন উপনিষদৰ সংজ্ঞাৰ ওপৰত (ওপরে) প্রতিষ্ঠিত আৰু তাৰ দ্বাৰা পৰিপুষ্ট।...

'ৰবীন্দ্রনাথে বিশ্বাস কৰে (করতেন) ক্ষুদ্রকে লৈয়েই (নিয়েই) বৃহৎ

সীমাক (সীমা কে) লৈয়েই অসীম, প্রেমক লৈয়ে মুক্তি। প্রেমৰ আলোৱে (আলো) সীমা আৰু সীমিতৰ (সীমিতের) মাজত দুর্লঙ্ঘ প্রাচীৰ ভেদ কৰি মিলনৰ অর্থ মুকলি (মুক্ত) কৰি দিয়ে (দেয়)। প্রকৃতিৰ সৌন্দর্য মনৰ (মনের) প্রেম নহয় (নয়), ইয়াত (এখানে) অসীম অনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই নিয়মৰ (নিয়মের) মায়া দোলেৰে (মায়াডোরে) নিজকে প্রকাশ কৰিছে। ধরাবন্ধা (বাধাধরা) নীতিৰ অনুশাসনত (অনুশাসনে) আমি (আমরা) অসীমৰ ৰেখা নাপালেও (না পেলেও) মানুহৰ (মানুষের) প্রেম-প্রীতির মাধ্যমেৰে আমাৰ (আমাদের) হৃদয়ে ক্ষুদ্রৰ মাজতে ভূমাৰ স্পর্শ অনুভব কৰিবলৈ (করতে) সমর্থ হয়।...'

শ্রীকাকতির প্রবন্ধপাঠ শেষ হবার আগেই সময় ফুরিয়ে গেল। ঠিক হল বাকি অংশটুকু আগামীকালের সাহিত্য আসরে পঠিত হবে।

সভা শেষ হতেই অধ্যাপক কাকতি এসে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক খুবই বিনয়ী। কথায় কথায় বলে ফেললেন, "আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ পাঠক।"

আমি বলি, "অসমীয়া না জানা সত্ত্বেও প্রবন্ধটি থেকে আপনার পাণ্ডিত্য অনুধাবন করতে পেরেছি।"

বিচিত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হতে ঘন্টাখানেক বাকি আছে। এই অবসরে একবার হোটেল থেকে ঘুরে এলে হোত। হাত-মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে যেমন তাজা হওয়া যেত, তেমনি জহর-কোটটাও গায়ে চড়িয়ে নেওয়া যেত। বৈশাখ মাস হলেও আপার-আসাম, কাল সন্ধ্যার পরে দেখেছি বেশ একটু শীত শীত করে।

কিন্তু পথে নেমেই ঘেরাও হয়ে গেলাম। প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরল। ওদের নানা প্রশ্ন আমার কাছে। প্রশ্ন শুনে অবাক হই। আমার মতো একজন অখ্যাত লেখকের বই এরা এত মনোযোগ দিয়ে পড়েছে! সানন্দে ওদের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিই।

ওরা আমাকে এগিয়ে দেয় হোটেলের দরজা পর্যন্ত। হাতজোড় করে বিদায় নিই, বলি, "একটু বাদেই বেঙ্গলী ক্লাবে আসছি। আবার দেখা

হবে।"

দু-তলার বারান্দায় এসে দেখি সুনীলবাবু এবং সমরেন্দ্রবাবুও ফিরে এসেছেন আর ইতিমধ্যে তাঁদের ঘরে ভিড় লেগে গিয়েছে। অর্থাৎ অটোগ্রাফ শিকারীরা চড়াও হয়েছে তাঁদের ওপরে। ওঁরা অবশ্য মোটেই বিব্রত নন। কারণ ওঁরা দুজনেই কবি। অটোগ্রাফ দেওয়া ওঁদের কাছে ছেলেখেলা। দক্ষিণাদারও তাই। তিনিও কবি। ছেলে-মেয়েদের নাম জিজ্ঞেস করে মুহূর্তে কবিতা লিখে দিচ্ছেন।

বিপদ হয়েছে আমার। আমি নিতান্তই অ-কবি। মহাকবি ও বিদ্রোহী কবির যে সামান্য কয়েকটি কবিতা জানি, তা-ও যথাসময় মনে পড়তে চায় না। যা মনে পড়ে, তা দিয়ে অটোগ্রাফ হাণ্টারদের এই বন্যা রোধ করা সম্ভব নয়।

তাহলেও কাঁচের জানলা দিয়ে তারা দেখতে পায় আমাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় আমার ঘরে। সকলেরই এক দাবী—শুধু সই করবেন না, কিছু লিখে দিন।

অতএব লিখতে হয়। গদ্য-পদ্য, ইংরেজী-বাংলা যা মনে আসে, তা-ই লিখে দিই ওদের খাতায়।

অবশেষে একসময় ছুটি পাই ওদের কাছ থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে আবার ফিরে আসি বেঙ্গলী ক্লাবে।

কিন্তু একি কাণ্ড! এযে দেখছি লোকে-লোকারণ্য। প্রেক্ষাগৃহের দু-পাশের পথে যেন মেলা বসেছে। শতশত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সবারই অনুরোধ—হয় টিকেট দিন, না হয় ভেতরে ঢুকতে দিন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিরুপায়। কর্মকর্তারা পর্যন্ত ভেতরে ঢোকেন নি। ভলান্টিয়াররা অধিকাংশই বাইরে। তারা সবিনয়ে জনতাকে বলছে—বাইরে লাউড-স্পীকার লাগানো হয়েছে। সবাই গান শুনতে পাবেন।

এ অবস্থায় দরজার কাছে যাওয়া উচিত হবে কি? ভেতরে নিশ্চয়ই জায়গা নেই। তার চেয়ে বরং হোটেলেই ফিরে যাওয়া যাক্। কিন্তু কি সাধ্য পালিয়ে যাই! কোথা থেকে কয়েকটি ভলান্টিয়ার ছুটে এসে

আমার পথরোধ করে দাঁড়ায়। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাচ্ছেন?"
"হোটেলে।"
"কেন ভেতরে যাবেন না?"
জবাব দিতে দেরি হয়। কোনোমতে বলি, "না, মানে আমার একটু দেরি হয়ে গেল তো, ভেতরে বোধহয় জায়গা নেই।"
ছেলেরা মৃদু হাসে। একজন বলে, "ভেতরে যত ভিড়ই হয়ে থাক্, আপনার জায়গা রয়েছে। চলুন, আপনাকে বসিয়ে দিচ্ছি।"
প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে না। নীরবে গেটের কাছে আসি। জনৈক ভলান্টিয়ার সাংকেতিক শব্দ করায় ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। ওরা আমাকে ভেতরের ভলান্টিয়ারদের হাতে সমর্পণ করে। তারা ভিড় ঠেলে আমাকে নিয়ে আসে সামনে। একজন ভদ্রলোক নিজের চেয়ারখানি ছেড়ে দেন আমাকে। আপত্তি করা বৃথা। সুতরাং আমি বসে পড়ি তাঁর চেয়ারে। ভদ্রলোক গিয়ে ভলান্টিয়ারদের পাশে দাঁড়ান। একটু বাদেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।
স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের গান-বাজনার পরে একটি মেয়ে বিহু নাচ শুরু করে। গতকাল প্রগতিদের বাড়ি যাবার পথে যে নাচ দেখেছি, তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। সেকালের যাত্রার সঙ্গে একালের যাত্রার যেমন পার্থক্য, অনেকটা তা-ই। মানে গাঁয়ের জমিদারবাড়ির যাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্র সদনের যাত্রার যে পার্থক্য।
মেয়েটি সবে কৈশোর পেরিয়েছে। ভারী সুন্দর সেজেছে সে। মাথায় খোঁপা, তাতে ফুলের মালা। চোখে কাজল, কপালে টিপ। ঠোঁটে লাল, গালে গোলাপী প্রলেপ। গলায় কানে ও হাতে পুঁথি কিংবা পাথরের ঝক্ঝকে অলঙ্কার। পায়ে ঘুঙুর। মেয়েটির পরনে মুগার মেখেলা, গায়ে হাতের কাজকরা লাল জামা। সৌন্দর্য এবং সারল্যের জন্য অসমীয়া মেয়েদের পোশাক ভারত-বিখ্যাত। গান্ধীজী বলেছেন, তিনি মালাবার ছাড়া কোথাও অসমীয়া মেয়েদের মতো এমন সরল ও সুন্দর নারী আর

দেখেন নি।

মেয়েটি নাচছে। মঞ্চের পেছন থেকে ভেসে আসছে গান। সেই সঙ্গে বাঁশি ও ঢোলের শব্দ।

'বিহুৰে বিৰিনা পাত সমনীয়া
বিহুৰে বিৰিনা পাত।
বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনাবি
বিহু গলে বিনাবি কাক॥'

"মানে বুঝতে পারছেন?"

তাকিয়ে দেখি, আমার পাশে বড়-সুনন্দা। বসার সময় কিংবা এতক্ষণ খেয়াল করি নি। ভালোই হয়েছে, ওর কাছ থেকে গানের মানেটা জেনে নেওয়া যাবে।

মানে না বুঝতে পারলেও এই গান কিন্তু আমার অপরিচিত মনে হচ্ছে না। ভাষায় সামান্য অমিল থাকলেও সুরে অমিল নেই। বাংলা লোক-গীতির সুরের সঙ্গে অসমীয়া লোকগীতির সুর সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। ভাষা মুখের, সুর অন্তরের। মনের দিক থেকে বাঙালীর সঙ্গে অসমীয়ার নেই কোনো অমিল।

নাচ-গান চলেছে। আমি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছি। মাঝে মাঝে শিঙা উঠছে বেজে। শিঙা থামতেই আবার গান—

'প্রথমে ঈশ্বরে পীৰিতি স্রজিলে
তার পিছত স্রজিলে জীৱ।
সেইজন ঈশ্বরে পীৰিতি কৰিলে
আমিনো নকৰিম কিয়॥'

সুনন্দা মানে বলে দেয়—প্রথম ঈশ্বর প্রেম সৃষ্টি করেছেন, তারপরে সৃষ্টি করেছেন জীব। সেই ঈশ্বর যখন প্রেম করেন, তখন আমরাই বা কেন করব না।

প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে বিহু নাচ-গান শেষ হল। বড় ভালো লাগল। ভাগ্যিস ভলান্টিয়াররা আমাকে হোটেলে ফিরে যেতে দেয় নি। অসমীয়া

সংস্কৃতির এই নিজস্ব নাচ-গান না শুনতে পেলে বড়ই দুঃখের হত। তখন ভেতরে আসতে দ্বিধা করলেও এখন ভলান্টিয়ারদের মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। বলতে গেলে ওরা একরকম জোর করেই আমাকে ভেতরে পাঠিয়েছে। অথচ নিজেরা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখন বৃষ্টিতে ভিজছে। কিছুক্ষণ আগে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। তবু ওরা ভেতরে আসে নি। কোথায় আসবে? ভেতরে জায়গা নেই। ওদের সেবা ও কর্তব্যবোধ সত্যই অতুলনীয়।

বিহু নাচের পরে একটি অসমীয়া একাঙ্ক নাটক অভিনীত হল। বুঝতে অসুবিধে হয় না কারণ সুনন্দা পাশে রয়েছে। ভালোই লাগে।

ডিব্রুগড় বেতারকেন্দ্রের শিল্পী শ্রীমতীডলি ঘোষ মঞ্চে এলো এবারে। মেয়েটির যেমন মিঠে গলা, তেমনি তাল ও লয়ের জ্ঞান। তার গান ভালো লাগল সবার।

ডলির পরে মঞ্চে এলেন ঘোষবাবু—আমাদের সুনীল ঘোষ। তিনখানি গান গাইলেন তিনি। তাঁর গানও ভালো লাগে সকলের। বিশেষ করে —'মন যে বলে চিনি চিনি···' এবং 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ···' গান দু'খানি বড়ই ভালো লাগল আমার।

তাঁর গান শুনে সত্যই বিস্মিত হচ্ছি। ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার হয়েও তিনি যে নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা করে যাচ্ছেন, তার প্রমাণ পাচ্ছি প্রতিটি গানে।

গতকাল প্রগতিদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে তিনি নিজের কিছু কথা বলেছিলেন। গান শুনতে শুনতে সেই সব কথাই মনে পড়ছে আমার। সুনীল ঘোষ বলেছেন—"নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ পাওয়া দুর্লভ ঘটনা, বলতে চাওয়া দুঃসাহসিক। তাছাড়া পঞ্চান্ন বছরের জাবর-কাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। তাহলেও চেষ্টা করছি।

"১৯৩৮ সাল, সবে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি। অনুষ্ঠানে ডাক পড়ত হাস্যকৌতুক পরিবেশন করবার জন্য। তৎকালীন জনপ্রিয় হাস্যকৌতুক আলেখ্য লেখক অধ্যাপক ননী দাশগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায়

এইচ. এম. ভি.-তে প্রথম রেকর্ড করালাম। তারপরেই কয়েকখানি গানের রেকর্ড করার সুযোগ এলো। বড় বড় গানের প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে গান গাইবার ছাড়পত্র পেলাম।.

"পণ্ডিত গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্তী ও ভূপেন ঘোষের কাছে ঠুংরি ও কীর্তন শিখলাম। পরিচিত হলাম সেকালের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, সুবল দাশগুপ্ত, অনিল বাগচী প্রভৃতির সঙ্গে। ১৯৪০ সালে দুখানি নজরুলগীতি রেকর্ড করালাম। তারপরে কিছু ভজন, গীত, ভাটিয়ালী ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড হল। পঙ্কজ মল্লিক আমাকে 'মাই সিস্টার' ছবির গান গাওয়ালেন। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ইত্যাদি কয়েকটি ছবিতে গান গাইবার সুযোগ পেলাম। জ্ঞান ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির পরিচালনায় আমি ছবিতে গান গেয়েছি।

"আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে কাজী নজরুল ও আমার দিদি ইলা ঘোষের (মিত্র) সঙ্গে সেই বিখ্যাত 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে···' গানটি রেকর্ড করেছি। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা কোম্পানী সেই রেকর্ডের নতুন প্রিণ্ট-য়ে গান-খানিকে শুধু নজরুলের গান বলে প্রচার করছেন। কাজী সুস্থ থাকলে কখনই এ অপপ্রচার বরদাস্ত করতেন না। আমার মতো তাঁর নির্মল হৃদয়ের অকুণ্ঠ স্নেহ-ভালোবাসায় ও সুর-বাণীতে অবগাহন করার সৌভাগ্য যাঁদের জীবনে ঘটেছে, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন।"*

ঘোষবাবুর গান শেষ হবার পরেই ঘোষক ঘোষণা করলেন—এবারে মঞ্চে আসছেন, সবার প্রিয় বাউল সম্রাট শ্রীপূর্ণ দাস।

ব্যাস, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সুনন্দা বলে, "লোকগীতির প্রতি আসামের মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। আসামের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনে লোকগীতির

আজও অসাধারণ প্রভাব। ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে আসামে রচিত হয়েছে একাধিক লোকগীতি। আপনি নিশ্চয়ই বরফুকণ এবং মণিরাম দেওয়ানের গান দু-টির কথা শুনেছেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

সুনন্দা বলে চলে, "প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালিনী আসামের সমাজ-জীবন কৃষি-কেন্দ্রিক ও গ্রাম-ভিত্তিক। তাই আসামে লোকগীতির এত প্রভাব। লোকগীতি আসামের সমাজ-জীবনকে প্রতিনিয়ত গীতিময় করে রাখে।" একবার থামে সুনন্দা! তারপরে আবার বলতে থাকে, "শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী তাঁর সম্পাদিত 'বার মাহর তের গীত' গ্রন্থের 'আগকথায়' বলেছেন—সরলতা ও অকৃত্রিমতা যদি কাব্যের ধর্ম হয়, তাহলে অসমীয়া লোকগীতি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা। কারণ শিশুর কান্না থামানো থেকে শুরু করে, খেলাধূলা, তাঁত-বোনা, শিকার করা, ধান-বোনা, নৌকো চালানো ও প্রেম-নিবেদন পর্যন্ত সহজ জীবনের সমস্ত দৃশ্য রয়েছে অসমীয়া লোকগীতিতে। প্রকৃতির অনুরাগে রঞ্জিত এইসব গান যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি অনাবিল আনন্দের উৎস।..."

থামতে হয় সুনন্দাকে। পূর্ণবাবু সদলবলে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহ একটু শান্ত হবার পরে সুনন্দা বলে, "ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তো বটেই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকগীতিতে পর্যন্ত রয়েছে এক বিস্ময়কর ঐক্য। তাই নির্মলেন্দু চৌধুরী য়ুরোপ থেকে শ্রেষ্ঠ লোক গায়কের সম্মান নিয়ে আসেন, আর পূর্ণবাবু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, য়ুরোপ এবং আমেরিকায় এমন জনপ্রিয় হতে পেরেছেন।

না, পূর্ণ দাস নয়, প্রথমে গান ধরলেন তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী মঞ্জু দাস। ওঁরা আমার প্রতিবেশী এবং সুপরিচিত। 'কেঁদুলীর মেলা' বইতে আমি লিখেছি ওঁদের কথা। পূর্ণবাবুর গান আমি অনেক শুনেছি কিন্তু সামনে বসে মঞ্জুদেবীর গান কখনও শুনি নি। তিনি যে এত ভালো গান, জানা ছিল না আমার। শ্রীমতী দাস নিজের সুরে একটি প্রাচীন

গান গাইছেন—

'হরি, তোমায় ডাকবার আমার সময় হ'ল কই!
আমি যাতে তাতে ভুলে রই॥
মনে করি ভোরের বেলায় করবো তোমার স্তব,
ক্ষুধার জ্বালায় খোকা উঠে লাগায় কলরব;
আবার সেই অবসরে গিন্নী এসে (হরি হে আমার)
চাঁদ বদনে ফোটান খই॥
সকাল বেলায় জপের মালা যে-ই নিয়ে বসি;
বলে চাল বাড়ন্ত, লক্ষ্মীকান্ত,
অম্‌নি মালা ঝুলায় সই॥...'

মঞ্জুদেবার পরে গান শুরু করলেন পূর্ণ দাস। প্রথম দুটি গান তিনি বসে বসে গাইলেন। তারপরে ঘুঙুর পায়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাউলরা শুধু গায়ক নন, তাঁরা বাদক এবং নর্তকও বটে। সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা সাধক, তাঁদের গানের খাতা খুলে গান গাইতে হয় না।

অবশেষে শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মাঝে পূর্ণবাবু তাঁর সেই জনপ্রিয় গানটি ধরলেন—

'গোলেমালে গোলে মালে
পিরীত ক'র না।
পিরীতি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না॥...
এক পিরীতে শিব শ্মশানবাসী
আর এক পিরীতে গোরা হ'লো
নদের নিমাই সন্ন্যাসী॥
গীত গোবিন্দ পদ্মাবতী এরাই কেবল কয়জনা॥...
একজন ব্রাহ্মণের ছেলে,
সেত এমনি বিটকেলে,
পিরীত করে ধোপার মেয়ের
পা ধুয়ে খেলে।

পিরীতি জাতের বিচার করতে গেলে,
মিলবে না চাঁদের কণা ॥...'

রাত এগারোটার একটু পরে শেষ হল বিচিত্রানুষ্ঠান। বাইরে বেরিয়ে দেখি এখনও বৃষ্টি পড়ছে। আর সেই বর্ষণকে উপেক্ষা করে যাঁরা এতক্ষণ গান শুনেছেন, তাঁরা এখনও বাড়ি ফেরার নামটি করছেন না। আমাদের দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন পথের দুধারে। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি এঁদের প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলাম।
সমবেত জনতাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করে আমি ও ঘোষবাবু নিখিলবাবুর গাড়িতে উঠলাম। ফিরে এলাম হোটেলে। ওঁরা নিজেদের ঘরে চলে গেলেন। জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসি। হোটেলের লোক খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে।
কিন্তু খাওয়া শুরু করতে পারি না। প্রমথ ঘরে ঢোকে। তার সঙ্গে তিনটি সুবেশা তরুণী। মনে মনে বিরক্ত হলেও হাসিমুখে বসতে বলতে হয় ওদের। ওরা বসে।
প্রমথ শুরু করে, "দাদা, জানি আপনি খুবই টায়ার্ড, তাহলেও এদের নিয়ে আসতে হল।" একটু থেমে সে আবার বলে, "এরা জোড়হাটের মেয়ে, কলেজে পড়ে। এরা নাকি সারাদিন চেষ্টা করেও আপনার কাছে আসবার সুযোগ পায় নি, অথচ এদের আজই আপনার অটোগ্রাফ দরকার।"
"কেন, আগামীকাল কি আমার অটোগ্রাফ বাসি হয়ে যাবে ?"
"আজ্ঞে না।" একটি মেয়ে সবিনয়ে উত্তর দেয়, "আমাদের অন্যান্য বন্ধুদের যে আপনি আজকের তারিখে অটোগ্রাফ দিয়েছেন !"
হাসি পায় আমার। সংসারে কত রকমের প্রতিযোগিতা আছে ! আর তার জন্য আমার মতো মূল্যহীন মানুষের স্বাক্ষরও এমন মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।

হাত মুছে টেবিলের ওপর থেকে কলমটা নিই। একটি মেয়ে তার সুদৃশ্য অটোগ্রাফ খাতাখানি আমাকে দেয়। খুলে দেখি দক্ষিণাদা, সুনীলবাবু, সমরেন্দ্রবাবু ও ডাঃ বাগচীর অটোগ্রাফ রয়েছে, কেবল আমারটা নেই। অতএব কলম খুলতে হয়।

মেয়েটি মনে করিয়ে দেয়, "কিছু লিখে দেবেন কিন্তু।"

"এই বৃষ্টিঝরা মধ্যরাতে অটোগ্রাফের জন্য এতদূরে ছুটে এসেছো, আর আমি শুধু সই দিয়ে বিদায় করে দেব ? না, আমি নগণ্য হলেও নির্দয় নই।"

একটি মেয়ে প্রতিবাদ করে, "আপনি মোটেই নগণ্য নন।"

"তোমাদের এই-সব কাণ্ডকারখানা দেখে, মাঝে মাঝে আমারও তা-ই মনে হচ্ছে বটে।"

ওরা হেসে ফেলে। আমি সহাস্যে লিখে চলি।

অটোগ্রাফের পাট চুকলে প্রমথ বলে, "আমরা তাহলে আসি দাদা! আমাকে আবার ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কাছেই বাড়ি, তাহলেও রাত বারোটা বাজে।"

ওরা চলে যায়। দোর বন্ধ করে দিয়ে খেতে বসি। বেশ শীত পড়েছে। খাবারগুলো সবই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তাহলেও পেটের তাগিদে গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে।

খাবার পরে বিছানা ঠিক করে নিতে হয়। এবারে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়া যাক্। কিন্তু আমি যে লেখক, সাহিত্য-সম্মেলনে এসেছি। আমার কি সাধ্যি যে এখুনি বিছানায় গা এলিয়ে দেব ?

আলো নেবাতে গিয়ে দরজায় করাঘাত শুনতে পেলাম। তারপরেই কেউ জিজ্ঞেস করেন—শুয়ে পড়লেন নাকি ?

রাত সাড়ে বারোটা। এখন আবার কে এলো ? এদের না হয় চোখে ঘুম নেই কিন্তু আমি যে আর পেরে উঠছি না। সেই সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেছি। প্রায় বিশ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। তার অন্তত অর্ধেকটা সময় ক্রমাগত কথা বলতে হয়েছে। এবারে শরীর বিদ্রোহ

ঘোষণা করছে।

তাহলেও দরজা খুলতে হয়। দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে। একজনের বয়স পাঁচের ঘরে আরেকজনের চারের কোঠায়। দুজনেরই মুখ চেনা, বোধহয় সভায় দেখেছি।

বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক বলেন, "নমস্কার। আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম। কিন্তু সারাদিন এত ব্যস্ত ছিলাম, যে কিছুতেই আপনার সঙ্গে আলাপ করে উঠতে পারিনি। এইমাত্র ডেলিগেটদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। ভাবলাম আপনি অতিথি, অন্তত পরিচয়টা হয়ে থাকা দরকার।"

বটেই তো, দিনে যখন সময় পান নি তখন এই শেষরাতই অতিথির সঙ্গে পরিচয়ের প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু যতই বিরক্ত হই না কেন, আমি আজ জোড়হাটের জনপ্রিয় অতিথি। সুতরাং আমাকে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করতে হলেও সদাহাস্যময় হয়ে থাকতে হবে। সহাস্যে বলি, "না, না, 'ডিস্টার্বড' হবো কেন? ভেতরে আসুন। বসুন।"

তাঁরা আসন গ্রহণ করার পরে, আমিও খাটের ওপর উঠে বসি। বয়োকনিষ্ঠ ভদ্রলোক মুখ খোলেন এবারে। বলেন, "আমার নাম রবীন্দ্র ভৌমিক, পেশা দোকানদারী, নেশা বই পড়া। নিবাস এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে।"

"দেড় মাইল! এত রাতে যাবেন কেমন করে?" আমি বিস্মিত।

"সাইকেল আছে। আর আপনি তো রোজ আসবেন না, নাহয় একদিন একটু কষ্টই করলাম।"

রবীনবাবু থামতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন, "আমার নাম ডাঃ সলিলকুমার মুখোপাধ্যায়, আমি লক্ষ্মী ইউনিয়ন বেঙ্গলী ক্লাবের সভাপতি।"

"তার মানে আপনি আমার 'হোস্ট্'?"

"তা বলতে পারেন।"

"অথচ আপনার সঙ্গেই আলাপ হয় নি।"

"তাইতো এলাম এতরাতে।"

নিজের ফাঁদেই নিজে পড়ে যাই। চুপ করে থাকি।

ডাঃ মুখার্জি আবার বলেন, "জোড়হাট ছোট জায়গা, আমাদের সাধ্য সামান্য, আমরা আপনাদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হয়তো···"

"এবারে প্রতিবাদ না করে পারছি না।" ডাক্তারবাবুকে শেষ করতে দিই না।"

"প্রতিবাদ···মানে···" ভদ্রলোক রীতিমতো অপ্রস্তুত।

"হ্যাঁ, প্রতিবাদ মানে 'প্রোটেস্ট' করছি। আমি মোটেই বিশিষ্ট ব্যক্তি নই আর একথাটা আমি বিমানবন্দরেই সুবোধবাবুকে বলে দিয়েছি।"

ওরা খুশি হন। রবীনবাবু বলেন, "সুবোধদা কথাটা বলেছেন আর তাই তো এত রাতেও আপনাকে জ্বালাতন করার সাহস পেলাম।"

খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু আমার যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তাই অন্যভাবে আমাকে কথাটা পাড়তে হয়। বলি, "রাত অনেক হল, আপনাদের আবার বাড়ি ফিরতে হবে।"

"আমার বাড়ি খুবই কাছে।" ডাক্তারবাবু বলেন, "তাছাড়া আমি মফঃস্বলের ডাক্তার আর রবীনবাবু দোকানদার—Night is still young to us."

"তাহলেও সারাদিন পরিশ্রম করেছেন, আপনারা 'টায়ার্ড'। সকাল হতেই তো আবার হাঙ্গামা শুরু হবে। আর রাত করা উচিত হবে না আপনাদের। কাল তো দেখা হবেই।" আমি ওঁদের বিদায় করতে চাই।

ওঁরা বোধহয় বুঝতে পারেন আমার বক্তব্য। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান। ডাক্তারবাবু বলেন, "হ্যাঁ, কাল দেখা নিশ্চয়ই হবে, তবে তখন কথা বলার সুযোগ পাবো কিনা জানি না। কিন্তু এখন আপনাকে আর বিরক্ত করব না। শুধু জোড়হাটবাসীদের তরফ থেকে আপনার কাছে একটি আবেদন রেখে যাবো।"

"বলুন, কি আদেশ ?"

"আপনাকে পরশু অর্থাৎ সম্মেলনের পরের দিনটি জোড়হাটে থাকতে হবে। সেদিন সভার হাঙ্গামা থাকবে না, আমরা আপনাকে একটু একান্তে পাবো।"

"প্রস্তাবটা পল্টনও আজ দুপুরে করেছে। আমি তখুনি রাজি হয়েছি। তবে বিশ তারিখে সকালে কিন্তু আমাকে ছুটি দিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই। উনিশ তারিখের পরে আর আটকে রাখব না। আপনি শুধু একটি দিন আমাদের দিন।"

সহাস্যে সম্মতি জানাই। ওঁরা খুশি মনে বিদায় নিলেন।

দোর বন্ধ করে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিই। রাত একটা বাজে। তাহলেও বলা যায় না, হয়তো আবার কেউ এসে হাজির হবে।

খাটে এসে শুয়ে পড়ি। সত্যই শ্রান্ত। সারাদিন বড়ই ধকল গিয়েছে। তাহলেও কেন যেন ঘুম নেমে আসছে না আমার চোখে। মনে পড়ছে এঁদেরই কথা—আমার সেই অদেখা পাঠিকা প্রগতি থেকে সদ্য পরিচিত রবীনবাবু ও ডাঃ মুখার্জির কথা। এঁদের বয়স, বিদ্যা, বৃত্তি, পরিবেশ সবই পৃথক কিন্তু আমার কাছে সবার একই পরিচয়—এঁরা সবাই পাঠক-পাঠিকা এবং প্রত্যেকে ভালোবাসেন আমাকে।

শুধু আমাকে নয়, এঁরা ভালোবাসেন আমাদের—লেখক-লেখিকাদের। কিন্তু আমরা কি কখনও হিসেব করে দেখেছি, এই অসামান্য প্রীতির প্রতিদানে আমরা এঁদের কি পরিবেশন করে চলেছি?' নিজেদের স্বার্থে আমরা আজ সাহিত্যকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছি। ভুলে গিয়েছি —আমরা সমাজের শিক্ষক। জানি না, কবে আমাদের আত্মসমীক্ষার সময় হবে?

৭

কাল রাতে যত দেরিতেই ঘুমিয়ে থাকি, আজও যথারীতি ভোর পাঁচ-টায় ঘুম ভেঙে গেল। কালও এসময় হোটেল আজকের মতোই নিদ্রামগ্ন ছিল। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একা-একা আকাশের রং বদলের পালা দেখেছিলাম আর শুনেছিলাম জানা-অজানা পাখিদের কলকাকলি।

কিন্তু আজ আমার মাঝের সেই ভবঘুরে মানুষটা কেন যেন হঠাৎ জেগে উঠল। বাথরুম সেরে জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে এলাম পথে। প্রায় জনহীন পথ। হবেই তো। জোড়হাট কলকাতা নয় যে অহোরাত্র জেগে থাকবে। জোড়হাটের জীবনে বিশ্রামের একটা স্থান আছে, সে এখন ঘুমোচ্ছে। সকাল ছটার আগে ঘুম ভাঙে না তার।

হোটেলের সামনে এ রাস্তাটার নাম ন-আলি। অসমীয়াতে 'ন' শব্দের অর্থ নতুন আর 'আলি' শব্দের অর্থ সরণি।

ম্যাড্রাস হোটেল ন-আলির প্রায় পূর্ব প্রান্তে। হোটেল ছাড়িয়ে কয়েক পা পুবে এগোলেই ন-আলি এবং থানা রোডের সংযোগ স্থল। তার পরেই বেঙ্গলী ক্লাব। কিন্তু ওদিকে আমি বহুবার গিয়েছি। আজ তাই উল্টো-দিকে এগিয়ে চলি।

একটু এগিয়েই চৌরাস্তার মোড়। আর সেখানেই 'দশ' কোম্পানীর সুবিরাট বাড়ি 'ক্যালী বিল্ডিংস'। ভয়ে ভয়ে পথ চলি পল্টন কিংবা ডুন্টুবাবু দেখে ফেললে, ঠিক ভেতরে ধরে নিয়ে যাবেন।

না, ভাগ্য ভালো বলতে হবে। তেমন কিছু ঘটল না। আমি নির্বিঘ্নে দশ কোম্পানী ছাড়িয়ে পশ্চিমে এগিয়ে এসেছি। মনে মনে কিন্তু দশ কোম্পা-নীর কথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি।

ডুষ্টুবাবু অর্থাৎ কোম্পানীর বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীসুশীলকুমার দশের ঠাকুরদাদা ক্যালীকুমার (সম্ভবতঃ ৺কালীকুমার দাশ) সেনা-বাহিনীতে কাজ করতেন। চাকরি শেষে অবসর নিয়ে তিনি লাহোর থেকে সোজা ইম্ফলে চলে এলেন। সে প্রায় একশ' বছর আগের কথা। তিনি সেখানে সেনাবাহিনীতে মালপত্র সরবরাহের ব্যবসা শুরু কর-লেন। কয়েক বছরের মধ্যেই 'দশ এ্যাণ্ড্ কোম্পানী' (Dos & Co.) নাম দিয়ে ডিমাপুরে স্থায়ী দোকান করলেন। তারপরে গোলাঘাটে 'ক্যালীকুমার দশ এ্যাণ্ড কোম্পানী' (Cally Coomar) নামে আরে-কটি দোকান খুললেন। অবশেষে আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে প্রতিষ্ঠা করলেন জোড়হাটের এই দশ এ্যাণ্ড্ কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড্।

ক্যালী বিল্ডিংস-কে বাঁদিকে রেখে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। এখানে ডানদিক থেকে আরেকটা রাস্তা থেকে এসে বড় রাস্তায় মিশেছে। রাস্তার মোড়ে দোকান-পাট। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সবার হাতে এক-একটি বোতল। ওরা দুধের গাড়ির প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাহলে জোড়হাটের জনজীবনের সঙ্গে কলকাতার কিছু কিছু মিলও রয়েছে!

রাস্তার মোড়ে একখানি সাইনবোর্ড—'Jorhat Blind School'.

জোড়হাটকে আসামের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হয়। এখানে পঁচিশটা স্কুল, আটটি কলেজ ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। রয়েছে 'সায়েন্স', 'ইঞ্জিনীয়ারিং', 'কমারস্', 'বি টি.' ও 'ল' কলেজ। কিন্তু এখানে কোনো 'ব্লাইণ্ড স্কুল' আছে বলে জানতাম না তো! একবার দেখে আসি স্কুলটিকে। ডানদিকের পথে এগিয়ে চলি।

বেশিদূর এগোতে হয় না। দু-তিন মিনিট হাঁটার পরেই রাস্তার পাশে চন্দ্রকমল বেজবরুয়া বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়। প্রগতির বাবা এই কলেজের অধ্যক্ষ। বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের সামনে ও জোড়হাট 'ল' কলেজের পেছনে প্রায় পনেরো বিঘা জমি জুড়ে অন্ধ বিদ্যালয়।

গেটের সামনে এসে দাঁড়াই। বুক সমান উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মাঝারী আকারের কয়েকটি বাড়ি নিয়ে বিদ্যালয়। গেট পেরিয়ে অফিসে আসি। একজন ভদ্রমহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হাতজোড় করে নমস্কার করেন। পাশের টুলখানিতে বসতে বলেন। বাংলাতেই কথা বলছেন তিনি। কিন্তু উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারছি তিনি অসমীয়া। যেভাবেই হোক্ ভদ্রমহিলা বুঝতে পেরেছেন, আমি বাঙালী এবং অসমীয়া জানি না।

কয়েকটি অন্ধ ছেলে-মেয়ে আসা-যাওয়া করছে। হাত দু-খানি সামনে বাড়িয়ে দিব্যি চলা-ফেরা করছে। বোঝা যাচ্ছে না যে ওরা দেখতে পায় না। আমার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রমহিলা জানালেন, "ওরা ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে কিচেনে খেতে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা, কবে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?" জিজ্ঞেস করি।

ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, "এখানে স্কুল আরম্ভ হয়েছে মাত্র আড়াই মাস আগে।"

"তার আগে?"

তিনি বলতে শুরু করেন, "১৯৭৩ সালের ৯ই জানুয়ারী জোড়হাটে All Assam Blind Convention অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকেই স্থানীয় কয়েকজন সমাজসেবকের মনে এখানে একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করার ইচ্ছা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আসামের প্রাক্তন অর্থ-মন্ত্রী ও পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীদেবেশ্বর শর্মা। তাঁরা ১৯৭৩ সালে পাঁচটি অন্ধ ছাত্র নিয়ে প্রথম স্কুল আরম্ভ করেন। তাঁদেরই অনুরোধে আসাম সরকার এই ১৫ বিঘা জমি দান করেছেন। এ জায়গাটার নাম আটিলার্গাও। ১৯৭৩ সালের ২৫শে অক্টোবর মুখ্য মন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ এই বাড়ির আধারশিলা স্থাপন করেন। ১৯৭৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দিন আলী আহমেদ এই বিদ্যালয় উদ্বোধন করেছেন। আসামের প্রখ্যাত অন্ধ পণ্ডিত শ্রীপ্রসন্ন প্রিন্সা এখানকার অধ্যক্ষ। তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে খুশি হতেন, কিন্তু তিনি এখন স্কুলে নেই।"

"আচ্ছা, এখানে কজন শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে?" ভদ্রমহিলা থামতেই প্রশ্ন করি।

তিনি উত্তর দেন, "বর্তমানে এই স্কুলে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী, তাদের মধ্যে ১৭ জন ছাত্রী। পাঁচজন শিক্ষক ও একজন স্থায়ী শিক্ষিকা আছেন। এ-ছাড়া গান, হাতের কাজ ও সেলাই শেখাবার জন্য তিনজন পার্ট-টাইম টিচার রয়েছেন। এখন ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত আছে। আস্তে আস্তে আমরা ক্লাশ টেন পর্যন্ত খুলব। এখানে ব্রেইল মেথড্-য়ে (Braille) শিক্ষাদান করা হয়। পড়াশুনার সঙ্গে কাঠ ও বাঁশের কাজ, সেলাই, টাইপ-রাইটিং ও টেলি-গ্রাফী···"

"অর্থাৎ শিক্ষা শেষ করে তারা যাতে সহজেই কাজ পেতে পারে?" আমি বলি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ভদ্রমহিলা বলেন, "মুশকিল কি জানেন, আমরা ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছি না।"

"সেকি!" সবিস্ময়ে বলি, "যে দেশে সত্তর লক্ষ অন্ধ, সেদেশে ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছেন না।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।"

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি পথে। ফিরে চলি বড় রাস্তার দিকে আর ভাবি···। হ্যাঁ, দৃষ্টিহীনদের কথাই ভাবতে থাকি —অন্ধত্ব ভারতের একটি প্রধান জাতীয় সমস্যা। মিশর ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে ভারতের মতো এত বেশি দৃষ্টিহীন নেই। বিশ্বের দৃষ্টিহীনদের এক-চতুর্থাংশ ভারতীয়।

আমাদের দেশে যেখানে প্রতিবছর শতকরা দৃষ্টিহীনদের হার বাড়ছে, সেখানে উন্নত দেশগুলিতে কমছে। কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁরা এই সমস্যার মোকাবিলা করছেন।

সাধারণত দু-রকমের দৃষ্টিহীন আছেন। একদল আশৈশব অন্ধ, আরেক দল কোনো কঠিন রোগের কবলে পড়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। চিকিৎসা বিভ্রাটই দ্বিতীয় দলের দৃষ্টিহীনতার কারণ। সুতরাং চিকিৎসা ব্যবস্থার

উন্নতির দ্বারা এই জাতীয় দৃষ্টিহীনদের সংখ্যা কমানো সম্ভব।
যাঁরা আশৈশব অন্ধ, তাঁদের অধিকাংশ কিন্তু জন্মান্ধ নন। তাঁরাও জন্ম-লাভের পরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। সুতরাং জন্মের অব্যবহিত পরে যদি প্রত্যেক শিশুর চক্ষু পরীক্ষা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে বহু শিশুর চোখদুটি রক্ষা করা সম্ভব। এই ব্যবস্থার সাহায্যেই য়ুরোপ ও আমেরিকায় অন্ধত্বের হার কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
ক্রমবর্ধমান অন্ধরা ভারতের জাতীয় জীবনে অভিশাপ কারণ আমরা তাঁদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে লেঃ কর্নেল স্যার আয়ান ফ্রেজার বলেছিলেন—
'In England blindness is no longer treated as a calamity against which little can be done ; it is acknowledged as a disadvantage, but one that can be greatly diminished by up to date methcds of training and education.'
দুর্ভাগ্যের কথা বত্রিশ বছর পরেও আমরা আজ একথা বলতে পারছি না। অথচ আমাদের সামনে মহাকবি হোমার, বিল্বমঙ্গল, মিল্টন ও সুরদাসের উদাহরণ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের অমর সৃষ্টির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে দৃষ্টিহীনতা অভিশাপ নয় : আমাদের মধ্যেও আমরা এমন কয়েকজন দৃষ্টিহীনকে দেখছি যাঁরা এই প্রমাণকে জোরদার করছেন। এঁদের প্রসঙ্গে প্রথম মনে পড়ছে প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীসাধন গুপ্ত এবং বিখ্যাত গায়ক শ্রীস্বপন গুপ্তের কথা।
কয়েকদিন আগে কাগজে দেখেছি, ভাষাতত্ত্বে বিশিষ্ট গবেষণার জন্য ফরিদ সঈদ আবদুল সালাম নামে কেরালার জনৈক দৃষ্টিহীন গবেষককে পুণা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট দিয়েছেন। শ্রীসালামের বয়স এখন ৩৬ বছর। ১২ বছর বয়সে তাঁর চোখদুটি নষ্ট হয়ে যায়! তিনি ব্রেল পদ্ধতিতে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের কেন্দ্রীয় ইনস্টি-

টিউটে প্রজেক্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে সালাম এখন মহারাষ্ট্রের পার্বত্য এলাকায় কর্মরত রয়েছেন।*

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং চারটি অন্তরেন্দ্রিয়—মানুষের মোট এই চোদ্দটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। কারও যদি এর মধ্যে কোনো ইন্দ্রিয় না থাকে, তাহলে প্রকৃতিগত কারণেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি অন্য তেরোটি ইন্দ্রিয়ে সঞ্চারিত হয়। ফলে তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলি একজন সাধারণ মানুষের ঐসব ইন্দ্রিয় থেকে সূক্ষ্মতর এবং অধিক স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। সুতরাং অন্ধত্ব অভিশাপ নয়।

আমাদের ধারণা বেত ও বাঁশের কাজ, তাঁত ও কাঠের কাজ কিংবা সেলাই ও বই বাঁধাইয়ের কাজ এবং গান-বাজনা ছাড়া আর কোনো কাজ দৃষ্টিহীনরা করতে পারেন না। কিন্তু অন্ধদের জাতীয় সমিতি কিছু-দিন আগে এক সমীক্ষার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে দেশের বড় বড় কলকারখানাতে এমন অনেক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকের কাজ আছে, যা অন্ধরা খুবই ভালোভাবে করতে পারেন। জাতীয় সমিতি ইতি-মধ্যেই বম্বেতে একটি শিক্ষা প্রকল্প শুরু করেছেন। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ৬০০ দৃষ্টিহীন বিভিন্ন কারখানা ও অফিসে যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন। ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুরেও এমনি ক্ষুদ্র প্রকল্প চালু হয়েছে।

সত্তর লক্ষ মানুষ জাতির জীবনে সামান্য সম্পদ নয়। সুতরাং সারা দেশে অন্ধ বিদ্যালয় এবং কর্মশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষা শেষে তাঁরা যাতে কাজ পান, তার ব্যবস্থাও করা দরকার। তারপরে দেখতে হবে তাঁরা পরিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় সংসার জীবন যাপন করতে পারছেন। দৃষ্টিহীনদের জীবনকে আলোময় না করে তুলতে

পারলে এদেশের আঁধার ঘুচবে না।

একটা লেবেল ক্রসিং। আমার ভাবনা থেমে যায়। দু-দিকে তাকাই। বাঁদিকে সামান্য দূরে স্টেশন দেখা যাচ্ছে।

জনৈক পথচারী জানালেন এই মিটারগেজ সিঙ্গল লাইনটি মরিয়ানীর সঙ্গে ফুরকাটিং জংশনকে যুক্ত করেছে। মরিয়ানী এখান থেকে মানে সামনের ঐ জোড়হাট স্টেশন থেকে মাত্র ১০ মাইল। মরিয়ানীতে কাটিহার ও তিনশুকিয়ার গাড়ি পাওয়া যায়।

একবার স্টেশনটি দেখে গেলে হত। রেলগাড়িই তো আমার ভ্রমণের প্রধান বাহন—জীবনের অবলম্বন। সম্মেলন কতৃপক্ষ বিমানপথে নিয়ে এসেছেন বলে রেলপথকে অবজ্ঞা করা নেহাৎ অকৃতজ্ঞতা হবে।

তাই রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলি। একটু এগিয়েই স্টেশন। একদিকে প্ল্যাটফর্ম, ছোট শেড্। স্টেশন মাস্টারের অফিস ও বুকিং কাউন্টার বন্ধ। সকাল সাড়ে নটার আগে আর গাড়ি নেই বলে মাস্টার মশাই এবং তাঁর সহকর্মীরা কোয়ার্টার্সে চলে গিয়েছেন।

রেলকর্মী কিংবা যাত্রী না থাকলেও চা-য়ের স্টলটি কিন্তু খোলা রয়েছে। পরশুদিন জোড়হাটে আসার পর থেকে আর চায়ের দোকানে বসবার সুযোগ পাই নি। হাঁটতে হাঁটতে সেখানেই আসি। তরুণ দোকানদারটি বাঙালী। সে আমাকে নমস্কার করে বসতে বলে। আমি বলি, "এক কাপ চা দিন।"

"বিস্কুট খাবেন না?" ছেলেটি প্রশ্ন করে।

"না।" উত্তর দিই। বলি, "চা-য়ে দুধ একটু কম দেবেন।"

সে নিঃশব্দে চা বানায়। একটু বাদে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, "স্যার খালি পেটে চা খাওয়া কিন্তু ঠিক নয়।"

বুঝতে পারছি ছেলেটি পাকা ব্যবসায়ী। কিন্তু কথাটা মিথ্যে বলে নি সে। খালি পেটে চা খাওয়া সত্যিই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বাধ্য হয়ে বলতে হয়, "দিন তাহলে একখানা।"

"ছোট বিস্কুট স্যার! দুখানাই নিন।" দোকানী একটা প্লেটে করে দুখানা

বিস্কুট এগিয়ে দেয় আমার দিকে।

আপত্তি করে লাভ নেই। পাকা ব্যবসায়ী আমার কাছে দুখানি বিস্কুট না বেচে ছাড়বে না। নিঃশব্দে বিস্কুটের প্লেটটা কাছে টেনে নিই। চা-য়ে চুমুক দিয়ে দোকানীকে জিজ্ঞেস করি, "আপনার দেশ কোথায় ?"

"আজ্ঞে, আমি এখানেই জন্মেছি। তবে বাবা বাস্তুহারা। তিনি বঙ্গ-বিভাগের পরে শ্রীহট্ট থেকে এখানে এসেছেন।"

"বাড়ি-ঘর কিছু করেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কাছেই—স্টেশনের পেছনে।"

"এ দোকান থেকে কি রকম আয় হয় ?"

"খুব একটা ভালো নয়। যাত্রী কম, পাড়ার লোকরাই আমার প্রধান খদ্দের। নিজের খরচটা চলে যায় আর কি।"

"নিজের খরচ বলতে..."

"আজ্ঞে আমার খাওয়া ও পড়ার খরচ।"

"আপনি কি পড়েন ?"

"ল। গত বছর বি. এ. পাশ করেছি।" একবার থামে সে। তারপরে সবিনয়ে বলে, "আপনি দয়া করে আমাকে আপনি ডাকবেন না।"

তার প্রস্তাব মেনে নিই। বলি, "তা এখানে খদ্দের কম কেন ?"

"ছোট স্টেশন। সারাদিনে দুখানি আপ ও দুখানি ডাউন গাড়ি। তার ওপর এখান থেকে মরিয়ানী, এই দশমাইল যেতে আসতে রেলে যেখানে দেড়ঘণ্টা সময় লাগে সেখানে ট্যাক্সী ও বাসে মাত্র আধঘণ্টা থেকে পৌনে একঘণ্টা লাগে। তাই অধিকাংশ যাত্রী বাসে কিংবা শেয়ার-য়ের ট্যাক্সীতে করে মরিয়ানী চলে যান।"

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ঘড়ি দেখি—সাতটা বেজে গিয়েছে। এবারে ফেরা দরকার। দাড়ি কেটে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে সভায় যেতে হবে। তাছাড়া হোটেলেও হয়তো লোকজন আসবে। উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি, "আমাকে কত দিতে হবে ভাই ?"

"কিছু নয় স্যার!"

"কেন ?" আমি বিস্মিত।

সে হাতজোড় করে করুণকণ্ঠে বলে ওঠে, "আমি কাল সম্মেলনে গিয়েছিলাম। আপনাকে চিনতে পেরেছি, আপনি আমাদের অতিথি। আপনার কাছ থেকে চায়ের দাম···" সে শেষ করে না, কেবল জিভে কামড় দেয়।

লজ্জা পেলাম। মহানগরীর মানুষ আমরা, কত ছোট আমাদের মন। আমি তাকে পাকা ব্যবসায়ী ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, লাভের জন্য সে আমাকে বিস্কুট খেতে বলছে। এখন বুঝতে পারছি ভালোবেসেই সে আমাকে খালি পেটে চা খেতে নিষেধ করেছে এবং এ-ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই !

জীবনে হয়তো আর কখনও আসা হবে না এই ছোট রেলস্টেশনটিতে, কোনোদিন হয়তো দেখা হবে না এই চায়ের দোকানদারের সঙ্গে কিন্তু তার এই অকুণ্ঠ ভালোবাসা আমার স্মৃতিতে বহুদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। খ্যাতি ও অখ্যাতি, লাভ ও লোকসানের সীমারেখার পরপারে তার এই আন্তরিক আতিথ্যের কথা আমি কোনোদিন বিস্মৃত হব না।

তাই বিনা প্রতিবাদে তার আতিথ্য মেনে নিয়ে বিদায় নিই দোকানীর কাছ থেকে। আমার সারা মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে।

৮

সকাল দশটায় সাহিত্য সভা শুরু হল। প্রথমেই অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র কাকতি তাঁর গতকালের অর্ধপঠিত প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। তারপরে বড়-সুনন্দা ডাঃ বরুণদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধটি পাঠ শুরু করে। রতনবাবু গতকাল ঠিকই বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক হয়েও ভদ্রলোক সত্যই সাহিত্য রসিক। তিনি লিখেছেন—'আধুনিকতার প্রশ্ন উঠলেই প্রাচীনত্বের কথা মনে পড়বেই, কেননা নবীন প্রাচীনেরই উত্তর-সাধক। সুতরাং প্রশ্ন হল—সাহিত্যে তথাকথিত আধুনিকতা—যার অর্থ যতই ব্যাপক হোক্ না কেন—তার বিকাশ কি ক্ষণস্থায়ী নয়?···সমকালীন প্রতিচ্ছবি মানবিক অর্থে আত্মজ না হতে পারলে সে-সাহিত্যকে ফটোগ্রাফী বলা যেতে পারে।···প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাকে আধুনিক ঢঙে পরিবেশন করলেই কি তা আধুনিকতার পর্যায়ে পড়ে? আমাদের মনে হয় উৎকর্ষতা, গভীর মননশীলতা ও পরিশুদ্ধ চিন্তার বিকাশই সাহিত্যে আধুনিকতার প্রকাশ। বিষয়বস্তু নয়, চিন্তার দৈন্য ও যুক্তির অভাবই সাহিত্যে আধুনিকতার পরিপন্থী।···শিল্পবিন্যাসে ও মানবতার অবদানে যে-সাহিত্য কালোত্তীর্ণ, সেই সাহিত্যই সর্বযুগে ও সর্বসময়ে আধুনিক।'

একই আসরে বসে দ্বিতীয়বার বিস্মিত হলাম, যখন ডঃ শ্রীমতী ইন্দিরা মিরি তাঁর বক্তব্য রাখলেন। কবি সম্মেলন বাকি রয়েছে, অথচ সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তাই শ্রীমতী মিরিকে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে শ্রীকাকতির প্রবন্ধের ওপরে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ওপরে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করলেন দক্ষিণাদা। প্রস্তাব শুনে আমার হাসি পেয়েছিল। যাঁর ওপরে পাঁচদিন অহোরাত্র বলে গেলেও বলা শেষ হবে না, সেই রবীন্দ্রনাথের ওপরে বলতে হবে পাঁচ মিনিটে!

কিন্তু শ্রীমতী মিরি বক্তব্য শেষ করার পরে বিস্মিত হলাম। তিনি ঠিক পাঁচ মিনিট সময় নিয়েছেন এবং তারই মধ্যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যের ওপরে এত সংক্ষিপ্ত অথচ এমন বিস্তৃত বক্তব্য আমি আর কখনও শুনি নি। শ্রীমতী মিরির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে।

তিনি সত্যই শ্রদ্ধেয়া। শ্রদ্ধেয়া তাঁর বিনম্র ও মধুর ব্যবহারের জন্য, শ্রদ্ধেয়া তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং শিক্ষাব্রতী জীবনের জন্য। সেই কথাই ভাবতে থাকি—১৯১০ সালে তিনি গৌহাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় সোনাধর দাস সেনাপতি। স্বামী স্বর্গীয় মহীচন্দ্র গিরি।

শ্রীমতী ইন্দিরা কলকাতা থেকে বি. এ. পাশ করেন ১৯৩২ সালে। কিছুদিন গৌহাটির পানবাজারে একটি মেয়েদের স্কুলে শিক্ষকতা করার পরে ১৯৪০ সালে তিনি শিলং-য়ে মেয়েদের উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি বি. টি. পাশ করেন। পরের বছর আমেদাবাদে মণ্টেসরী শিক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে যান। স্বয়ং ম্যাডাম মণ্টেসরীর কাছে প্রশিক্ষণ নেবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর।

১৯৪৫ সালে শ্রীমতী মিরি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান। ১৯৪৭ সালে এডিনবার্গ থেকে বি. এড্. ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। তারপরেই নেফায় (অরুণাচল) শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি সেখানকার অনুন্নত সমাজের মাঝে শিক্ষার বীজ বপন করতে সমর্থ হয়েছেন।

১৯৫৭ সালে তিনি নেফা থেকে জোড়হাটে চলে আসেন এবং এখানকার স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষার পদে বৃত হন। ১৯৬৪ সালে তিনি আসামের শিক্ষাসংস্থার অধ্যক্ষা মনোনীত হলেন। কিন্তু সকলের অনুরোধে তিনি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার পদ ত্যাগ করতে পারেন না।

তিন বছর সেই যুগ্ম দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৩ সালে তিনি শিক্ষা

বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো শিক্ষাব্রতী কি অবসর পেতে পারেন? তাঁকে এখনও গৌহাটির বাণীকান্ত কাকতি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। করুন। প্রার্থনা করি, তিনি যেন আরও বহুকাল শিক্ষার দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে পারেন। ভগবান তাঁর শতায়ু দান করুন।

শ্রীমতী মিরির ভাবনা থামাতে হল। শুরু হয়েছে কবি সম্মেলন। আগেই বলেছি আমি ছাড়া এঁদের অতিথিরা সকলেই কবি। তিনজন কলকাতা থেকে এসেছেন সুনীলবাবু, সমরেন্দ্রবাবু ও দক্ষিণাদা। আর একজন এসেছেন জলপাইগুড়ি থেকে ডাঃ সরোজিৎ বাগচী। তিনি প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও সুকবি। শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা এবং সৎ ও শিক্ষামূলক শিশুসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি জলপাইগুড়ি থেকে 'ডানপিটেদের আসর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। গতবছর তিনি আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন।

সুতরাং কবি সম্মেলন বেশ জমে উঠল। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রথমে সুনীলবাবু, তারপরে সমরেন্দ্রবাবু ও দক্ষিণাদা কবিতাপাঠ করে শোনালেন। পাঠ শুরু করার আগে সুনীলবাবু অবশ্য বলে নিলেন— আমি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সহজ কবিতা পাঠ করছি, তবু ভয় হচ্ছে সবকটি কবিতার সবটা হয়তো ঠিক বোঝা যাবে না।

সবাই কিন্তু কবিতাই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। কয়েকজন শ্রোতা আবার বিশেষ বিশেষ কবিতা পাঠ করার অনুরোধ জানালেন। মনে হল এ যেন আধুনিক কবিতা নয়, আধুনিক গানের আসর।

দক্ষিণাদা তাঁর সদ্য প্রকাশিত কবিতা সংকলন 'সাঁকো প্রায় পেরিয়ে' থেকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করলেন। তাঁর কবিতাও, বিশেষ করে 'বোসো, গাঁয়ের গল্প শুনি' কবিতাটি খুবই ভালো লাগল। শ্রোতারা শুনে খুশি হলেন যে দাক্ষিণাদা তাঁর বন্ধু প্রখ্যাত অসমীয়া কবি শ্রীনবকান্ত বরুয়াকে এই বইখানি উৎসর্গ করেছেন।

শ্রোতারা কিন্তু সবচেয়ে মজা পেলেন ডাক্তার সরোজিত বাগচীর ছড়া

শুনে। তাঁর ডানপিটেদের জন্য ছড়া খুবই ভালো লাগল আমাদের। হয়তো আমাদের প্রত্যেকের মাঝে আজও এক একটি ডানপিটে রয়েছে ঘুমিয়ে। ডাঃ বাগচীর কবিতা সেই সুপ্ত ডানপিটেকে জাগিয়ে তুলেছে।

দুঃখের কথা সময়াভাবে অসময়ে কবি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হল। স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের কবিতা শোনা হল না আমাদের। কর্তৃপক্ষ নিরুপায়। বেলা সোয়া বারোটা বাজে। বিকেল তিনটেয় জেলা গ্রন্থাগার ভবনে প্রকাশ্য অধিবেশন।

সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতেই ডাঃ মুখার্জি এসে একখানি হাত ধরলেন আমার। বললেন, "কাল রাতে খুব জ্বালাতন করেছি তো! পরে বোধহয় মনে মনে গালাগালি করেছেন।"

"ছিঃ ছিঃ, এসব কি বলছেন!" আমি প্রতিবাদ করি, গালাগালি করব কেন?"

উদাত্ত স্বরে ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, "করেন নি তো! আমি জানতাম করবেন না। আর তাই আজ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আমার স্ত্রীকে বড় গলায় বলে এসেছি—মিটিঙের পরে আমি ঠিক ওঁকে ধরে নিয়ে আসব।"

কি সর্বনাশ! এখন আবার আমাকে ডাক্তারবাবুর বাড়ি যেতে হবে নাকি? অথচ সোজাসুজি সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারি না। শুধু বলতে চাই, "কিন্তু..."

আমাকে শেষ করতে দেন না ডাক্তারবাবু। তিনি বলে ওঠেন, "জানি সাড়ে বারোটা বাজে। খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে তিনটের মধ্যে আপনাকে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে পৌঁছতে হবে। তাহলেও আমি আপনার পনেরো মিনিট সময় নেব, just fifteen minutes."

এর পরে আর আপত্তি করা যায় না। বলি, "বেশ, চলুন।"

"আরে মশাই আমি মানুষ চিনি বুঝলেন। তাই তো বাড়িতে বলে এলাম—তোমরা wait কর, আমি ওঁকে ধরে নিয়ে আসছি।"

আমি তাঁর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করি। শুনেছি কাছেই তাঁর বাড়ি। চলতে চলতে ডাক্তারবাবুকে বলি, "আমি আপনার আদেশ মেনে নিয়েছি, এবারে আপনাকে আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

"নিশ্চয়ই রাখব। বলুন কি করতে হবে?"

"আপনার সম্পর্কে সামান্য কিছু খবর দিন।"

"এই রে সেরেছেন! আপনাকে দেবার মতো নিজস্ব কোনো খবরই যে আমার নেই।"

"যা আছে তা-ই দিন। আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন!" আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই।

"আপনারা সাংবাদিকরা সাংঘাতিক মানুষ মশাই!"

"আমি সাংবাদিক নই, দক্ষিণাদা ও সুনীলবাবু সাংবাদিক।"

"আপনারা লেখকরা সবাই সাংবাদিক মশাই! যাক্ গে, যখন না শুনে ছাড়বেন না, তখন শুনুন।" ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, "আমার জন্ম ১৯২০ সালে এখানে। আমাদের আদিবাড়ি ফরিদপুর, মাতুলালয় ছিল ঢাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি ঢাকা থেকে ডাক্তারী পাশ করে Army Medical Service-এ যোগ দিই। সেই সময় সমস্ত South-East Asia দেখার সুযোগ হয়। জাপান surrender করার পরে দু-বছর জাপানে থেকে Occupation Army-তে কাজ করি। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে Emergency Commission থেকে release নিই। ১৯৪৮ সালে জোড়হাটে এসে Private Practice আরম্ভ করি। ৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত without break জোড়হাট মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার Elected হয়ে আছি। মাঝে ১৯৫৬-৬০ সালে পৌরসভার সহ-সভাপতি ছিলাম। বর্তমানে I am the seniormost member of the Municipal Board. কয়েক বছর ধরে Jorhat District Branch of Indian Red Cross Society-র Secretary হিসেবে কাজ করছি। যুক্ত রয়েছি হরিজন উন্নয়ন সেবক সংঘ, লক্ষ্মী যুনিয়ন বেঙ্গলী ক্লাব ও স্কুলের সঙ্গে..." শেষ করেন

না ডাক্তারবাবু। হঠাৎ বলে ওঠেন, "এই যে আমার বাড়ি।"
পথের পাশেই বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে ছোট একফালি বাগান। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে আসি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ও মেয়ে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। সহাস্যে স্বাগত জানান। আমরা ভেতরে ঢুকি।
বসবার ঘরে এসে দেখি উমা এবং আরেকটি মেয়ে বসে রয়েছে। ওরা উঠে দাঁড়ায়। উমা মানে শ্রীমতী উমা ভৌমিক। সাহিত্যপ্রিয় এই তরুণ অধ্যাপিকার সঙ্গে গতকালই দেখা হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গী মেয়েটি আমার অপরিচিতা। উমাই পরিচয় দেয়। বলে, "আমার বান্ধবী, লামডিং থেকে এসেছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায় বলে নিয়ে এসেছি এখানে।"
ডাক্তারবাবু আমাকে দেখিয়ে স্ত্রীকে বলেন, "ওঁকে কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।"
"বেশিক্ষণ আটকে রাখব না ঠিকই কিন্তু দশ মিনিটে ছেড়ে দিতে পারব না বাপু!" মিসেস মুখার্জি আমার দিকে তাকান।
আমি চুপ করে থাকি। ডাক্তারবাবু আমার পক্ষে ওকালতী করেন, "না না, তিনটের মধ্যে আবার ওঁকে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে পেঁ ছতে হবে। খাওয়া সেরে নিতে হবে। আমি ওঁকে কথা দিয়েছি পনেরো মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেব।"
স্ত্রী কিন্তু স্বামীর আবেদনে সাড়া দেন না। তিনি বলেন. "আনার দায়িত্ব ছিল তোমার, এখন ছেড়ে দেওয়া আমার হাতে। তাছাড়া", তিনি আমার দিকে তাকান, "আপনি এখানেই স্নান-খাওয়া করে নিন না।"
বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমাকে, "তার দরকার নেই বৌদি! অন্তত আধঘণ্টা আমি বসতে পারব এখানে।"
আমার কথায় খুশি হলেন মিসেস মুখার্জি। বললেন, "আমি জানতাম আপনার তেমন তাড়া নেই, আপনি বেশ কিছুক্ষণ বসতে পারবেন এখানে।"

"না না, ওঁকে যে তিনটের মধ্যে···"

"তুমি চুপ কর তো।" ডাক্তারবাবু শেষ করতে পারেন না।

উমা, তার বান্ধবী ও ডাক্তারবাবুর মেয়ে হেসে ওঠে। অসহায় ডাক্তার-বাবু নীরব। আমার অবস্থা অনেকটা রাজা ত্রিশঙ্কুর মতো। সুতরাং চুপ করে থাকি।

মিসেস মুখার্জি আবার শুরু করেন, "নিজে সারাদিন বনের মোষ তাড়িয়ে দু-দণ্ড কোথাও বসতে পার না। কাউকে কোথাও বসতে দেখ-লেই তুমি অস্থির হয়ে ওঠো।"

ডাক্তারবাবু কোনো কথা না বললেও মেয়ে বাপের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি তাহলে ওনাদের চা নিয়ে আসি মা?"

মা আপত্তি করেন না। মেয়ে ভেতরে চলে যায়। মেয়েটি সুশ্রী ও বেশ স্মার্ট। কলেজে পড়ছে।

সুযোগ পেয়ে উমা কথা বলে এবারে। সে আমাকে বলে, "দাদা, আপ-নার ভ্রমণকাহিনী পড়ে ভারতের দূর-দূরান্তের দুর্গম স্থানগুলো হয়ে পড়ে কতকালের চেনা ও পরিচিত। আপনার লেখা পড়তে পড়তে মানস-নয়নভরে অবলোকন করি সেই দুর্গম ও দুস্তরের অপরূপ শোভা। মনে জাগে এক দুর্বার তৃষ্ণা—কবে, কি করে পান করব ভারতের আনাচে কানাচে ছড়ানো সেই সৌন্দর্য রসসুধা।" একবার থামে সে। আমি তার দিকে তাকাই। শুধু আমি নই, সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে!

উমা বুঝতে পারে আমাদের মনোভাব। হয়তো বা একটু লজ্জা পায়। তাই সলজ্জ, স্বরে বলে "একটু যদি Emotional হয়ে থাকি, ক্ষমা কর-বেন। কিন্তু আপনি যে এত কাছের মানুষ, এত আপনজন, তা আপ-নাকে এবারে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। সেই ভরসাতেই আপ-নার আসামবাসী ভাই-বোনদের তরফ থেকে আপনার কাছে আমি একটা দাবী করব।"

"বেশ করো। সাধ্যাতীত না হলে নিশ্চয়ই তোমাদের দাবী মেনে

নেবো।" আমি বলি।
উমা কি যেন একটু ভাবে, তার বান্ধবী ও ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর দিকে একবার তাকায়। তারপরে বলে, "আমাদের দাবী, আপনি আসামের ওপরে একখানি বই লিখুন। আমাদের আজন্মের পরিচিত আসামকে, আমাদের প্রতিদিনে দেখা আসামকে, আমরা আবার নতুন করে দেখব আপনার লেখার ভেতর দিয়ে।"

হোটেলের গেট পেরিয়ে ভেতরে আসতেই ভদ্রলোক হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। প্রতিনমস্কার করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাই। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক অসমীয়া এবং তাঁকে আমি এর আগে দেখি নি কখনও।
বাংলাতেই কথা বললেন তিনি। বললেন, "আমি এখানকার একজন অফিসার। আপনার বই পড়েছি। পাঠক হিসেবে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।"
সহাস্যে বলি, "অনুরোধ নয়, বলুন দাবী।"
"তাহলে ভেতরে চলুন। একবার আপনাকে আমার অফিসে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।"
তাঁর অফিসে মানে জোড়হাটের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসে অর্থাৎ আমাদের হোটেলের নিচের তলায়।
ভেতরে এসে বুঝতে পারি চা খাওয়াবার জন্যই অফিসার ও তাঁর সহকর্মীরা ধরে এনেছেন এবং অসময় হলেও চা খেতেই হবে আমাকে। সুতরাং অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। বলি, "হাতি পেলাম না বলে তো এবারে আমার যাওয়া হল না কাজিরাঙা।
ভদ্রলোক আবার হাতজোড় করেন। সবিনয়ে বলেন, "ওকথা বলে আর লজ্জা দেবেন না আমাকে। আগামীকাল ও পরশুর জন্য সবকটি হাতি আগেই ভাড়া হয়ে গিয়েছে।"

"না না, লজ্জা পাবার কি আছে। তাছাড়া হয়তো ভালোই হল। গণ্ডার দেখার জন্য আমাকে আবার আসতে হবে জোড়হাটে।"

"খুব খুশি হব। তবে আসার অন্তত মাসখানেক আগে দয়া করে আমাকে একটু জানাবেন।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু ডেকে যখন এনেছেন, কাজিরাঙার গণ্ডারদের সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"আমার বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার সময় হবে কি?"

ঘড়ির দিকে তাকাই। সময় সত্যই কম। তাহলেও বলি, "সংক্ষেপে বলুন না।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, "আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার ই. পি. জী-র (Gee) 'ওয়াইল্ড লাইফ অব্ ইণ্ডিয়া' বইখানি পড়েছেন?"

"পড়েছি বলা চলে না, দেখেছি। তবে বাংলা অনুবাদখানিতে চোখ বুলিয়েছি একবার।"

"বইটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। করেছেন শ্রীঅমলেন্দু সেন।"

"তাহলে তো আপনি বন্যপ্রাণীদের পরম হিতৈষী মিঃ জী-র কথা শুনেছেন। চা-বাগানের চাকরি করতে তিনি আসামে এসেছিলেন। কিন্তু সময় পেলেই বনে বনে ঘুরে বন্যপ্রাণীদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতেন। তাঁদের সংরক্ষণের জন্য সারাজীবন ধরে তিনি চেষ্টা করেছেন। আর সর্বোপরি ঐ অমূল্য গ্রন্থখানি আমাদের উপহার দিয়েছেন। যাক্ গে, এবারে গণ্ডারের কথা বলা যাক্।"

"হ্যাঁ। বলুন।" আমি ঠিক হয়ে বসি।"

অফিসার শুরু করেন, "গণ্ডাররা প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী। প্রায় ছ'কোটি বছর আগেও তাদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে বাস করত। শিবালিক পর্বতমালায় গণ্ডারের যে জীবাশ্ম বা Fossil পাওয়া গিয়েছে, পণ্ডিতরা অনুমান করেন তার বয়স ছ'কোটি বছর।

"সভ্যতার আদিযুগেই মানুষ গণ্ডারের সংস্পর্শে এসেছে। প্রায় পাঁচ

হাজার বছরের পুরনো সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন কয়েকটি সীল-মোহরে গণ্ডারের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তার মানে সেকালে সিন্ধু উপত্যকায় নিশ্চয়ই গণ্ডার ছিল।

"প্রাচীনকালে ভারতীয় রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষিত গণ্ডার ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ গণ্ডার 'ট্যাঙ্ক'-য়ের কাজ করত। তখন সারা ভারতেই গণ্ডার পাওয়া যেত। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাইমুর কাশ্মীরে গণ্ডার মেরেছিলেন। ১৫১৯ সালে মোগল সম্রাট বাবর সিন্ধু উপত্যকায় গণ্ডার শিকার করেছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাম্বের রাজা গোয়া থেকে জাহাজে করে পর্তুগালের রাজাকে একটি গণ্ডার উপহার পাঠিয়েছিলেন।"

থামতে হয় অফিসারকে। বেয়ারা চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছে। আমার সামনে চায়ের কাপটি এগিয়ে দিয়ে অফিসার আবার বলতে থাকেন, "আজকাল উত্তরবাংলা এবং আসাম ছাড়া ভারতে আর কোথাও গণ্ডার নেই।"

"কেন এরকম হল?" প্রশ্ন করি।

তিনি উত্তর দেন, "মনুষ্য বসতির বিস্তার এবং শিকারীদের উৎপাত। এই শিবসাগর জেলার কথাই ধরুন, ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার' থেকে জানা যায় এই জেলায় তখন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আয়তন ছিল ৮৭৬ বর্গমাইল। এখন সেই আয়তন এক তৃতীয়াংশেরও কম তাছাড়া মনুষ্য বসতির প্রয়োজনে বন্যপ্রাণীদের হত্যা করার জন্য সরকার সেকালে খুবই উৎসাহ দিতেন। যেমন ধরুন তখন 'খেদা' (Khedda) বলে একটা সরকারী দপ্তর পর্যন্ত ছিল। সেই দপ্তর নীলাম করে বনাঞ্চল শিকারীদের হাতে সমর্পণ করত। হাতির জন্য শিকারীদের মাত্র একশ' টাকা শুল্ক দিতে হত। কেবল গারো পাহাড়েই বছরে চারশ' হাতি ধরা কিংবা মারা হত।

"যাক্‌গে, গণ্ডারের কথায় ফিরে আসি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের গণ্ডার আগেই সাবাড় হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৮ সালে দেখা গেল কাজি-

রাঙায় মাত্র গোটা-বারো গণ্ডার অবশিষ্ট রয়েছে। সরকার তখন কাজি-রাঙাকে শিকারের প্রাণীদের সংরক্ষিত বাসভূমি (Game Sanctuary) বলে ঘোষণা করে সেখানে শিকার নিষিদ্ধ করে দিলেন। গত ৬৮ বছরে সেই ১২টা গণ্ডার থেকে প্রায় ৮০০ গণ্ডার হয়েছে। বলা বাহুল্য সরকারী নিষেধ সত্ত্বেও চোরা শিকারীরা বহু গণ্ডার মেরে ফেলছে।

"পৃথিবীতে এখন পাঁচ জাতির গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়। দু' জাতি আফ্রিকায়, তিন জাতি এশিয়ায়। দু-শিংওয়ালা আফ্রিকার সাদা গণ্ডার বিশ্বের বৃহত্তম। এরা প্রায় ১৬ ফুট লম্বা ও ৬২/৩ফুট উঁচু হয়। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বইতে মিঃ জী বলেছেন আফ্রিকায় প্রায় ১৩ হাজার এই জাতের গণ্ডার রয়েছে।

"এদের দেহের ওজন ৪ টন পর্যন্ত হয়। ৬২ ইঞ্চি লম্বা শিং দেখা গেছে আফ্রিকার সাদা গণ্ডারের। এরা দৈনিক প্রায় ১০০ কেজি করে গাছ-পাতা খায়।

"এশিয়ার তিন জাতির গণ্ডার হল দু'-শিংওয়ালা সুমাত্রার গণ্ডার, এক শিং-য়ের জাভা এবং ভারতীয় গণ্ডার। এদের মধ্যে ভারতীয় কালো গণ্ডারই বড়। কাজিরাঙায় এই গণ্ডার রয়েছে। ওদের ইংরেজী নাম —Rhinoceros Unicornis. কাজিরাঙায় ১৪ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উঁচু গণ্ডার আছে। এদের শিং ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা এবং ওজন ২ টনের মতো হয়।

"এই শতকের চতুর্থ দশকের প্রথম দিকেও কাজিরাঙা ছিল নিতান্তই অপরিচিত। খুব কম পর্যটকই যেতেন সেখানে। ফলে গণ্ডারবা মানুষ দেখতে অভ্যস্ত ছিল না। তারা হাতির পিঠে মানুষ দেখলেও তেড়ে আসত। শিক্ষিত না হবার জন্য হাতিরাও তেড়ে আসা গণ্ডার দেখলে ভয় পেয়ে পালাতো।

"১৯৫০ সালে কাজিরাঙা বনাঞ্চলের নাম রাখা হয় বন্যপ্রাণী নিবাস 'Wild Life Sanctuary.' এখন সেখানকার হাতিদের শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। তাদের শেখানো হয়েছে, কিভাবে তেড়ে আসা গণ্ডারের

সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ? তাছাড়া গণ্ডাররাও বুঝতে পেরেছে, মানুষ তাদের মারতে আসে না, দেখতে আসে। ছোট বাচ্চা-সহ মেয়ে গণ্ডার-রাই কেবল কখনও কখনও তেড়ে আসে।"

"ছোট বাচ্চা সঙ্গে থাকলে মা বোধহয় সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তেড়ে আসে ?" আমি প্রশ্ন করি।

অফিসার বলেন, "হ্যাঁ। ওরা সব সময় বাচ্চাকে সামনে নিয়ে পথ চলে।"

"আচ্ছা হাতি কি গণ্ডারকে ভয় পায় ?"

"শিক্ষিত হাতি না হলে পায় বৈকি ! শুধু হাতি কেন বাঘ পর্যন্ত গণ্ডার-কে ভয় করে। তাই মিঃ জী গণ্ডারকেই পশুরাজ বলেছেন। তবে তেড়ে আসা গণ্ডার খুব কম ক্ষেত্রেই হাতিকে আক্রমণ করে। কাছে এসে তারা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, তারপরে ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে ফিরে চলে যায়। সত্যি সত্যি আক্রমণ করলে কিন্তু হাতি গণ্ডারের সঙ্গে পেরে ওঠে না। কারণ গণ্ডার হাতির চেয়ে ক্ষিপ্র এবং সাহসী। গায়ের চামড়া শক্ত হওয়ায় তার সহ্যশক্তিও অনেক বেশি। অল্প চেষ্টাতেই সে হাতির শুঁড় ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। তবে মিঃ জী বলেছেন, গণ্ডার গোঁয়ার হলেও বুদ্ধিতে বড়ই খাটো।"

"গণ্ডাররা কি শিং দিয়ে আক্রমণ চালায় ?"

"না। ভারতীয় গণ্ডাররা সাধারণত শিং-য়ের ব্যবহার করে না, ওরা দাঁত দিয়ে কামড়ায়। আফ্রিকার গণ্ডাররা বোধহয় শিং-য়ের ব্যবহার করে। কারণ দেখা যায় তারা ঘষে ঘষে শিং-য়ে শান দিচ্ছে।..."

"এই যে আপনি এখানে রয়েছেন দেখছি !" নিখিলবাবু ঘরে ঢোকেন। অফিসার তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "নমস্কার। আসুন মিঃ নন্দী, বসুন।" নিখিলবাবু একখানি চেয়ারে বসেন। আমি জিজ্ঞেস করি, "কোনো দর-কার আছে নাকি ?"

"দরকার আমার নয় অটোগ্রাফ হান্টারদের। তারা ওপর থেকে আপ-নাকে হোটেলে ঢুকতে দেখেছে, অথচ আপনি ওপরে ওঠেন নি। স্বভা-

বতই ওদের তাগিদে আমাকে নিচে নেমে আসতে হল।" একটু থেমে নিখিলবাবু আবার বলেন, "তাছাড়া অসম সাহিত্য সভা থেকে এই চিঠিটা দিয়ে গিয়েছেন। ওঁরা আজ বিকেলে আপনাদের সংবর্ধনা জানাবেন।"

খামখানি খুলি। একখানি টাইপ করা অসমীয়া চিঠি—নিমন্ত্রণপত্র। লেখা রয়েছে—

মান্যবৰেষু,

আহোমৰ (আহোমদের) শেষ ৰাজধানী, অসমৰ (আসামের) শিক্ষা-সংস্কৃতিৰ কেন্দ্রস্থল যোৰহাটলৈ (জোড়হাটে) আপোনাৰ দৰে (মতো) এগৰাকী (একজন) প্রথিতযশা সাহিত্যিকৰ শুভাগমনত (শুভাগমনে) আমি (আমরা) অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ (হয়েছি)। আপুনি আমাৰ স্বাগত সম্ভাষণ গ্রহণ কৰক (করুন)। আপোনাৰ আৰু (আর) পশ্চিম-বঙ্গৰ আন (অন্য) কেইগৰাকীমান (কয়েকজন) সাহিত্যিকৰ এই নগৰত (নগরে) উপস্থিতিৰ সুযোগ লৈ (নিয়ে) যোৰহাট সাহিত্য সভার সভ্য সকলে আপোনাসকলৰ সম্মানার্থে অহা (আগামী) ১৮ এপ্রিল দেওবাৰে (রবিবারে) আবেলি (বিকেল) ৫-৩০ মিনিটত অসম সাহিত সভার যাই (প্রধান) কার্যালয় চন্দ্রকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত এখন (এক) ৰাজহুৱা সভাৰ (জনসভার) আয়োজন কৰিছে। সেই সভাত উপস্থিত থাকি (থেকে) আমাক (আমাদের) কৃতার্থ কৰিব বুলি (বলে) আশা কৰিলোঁ।

চিঠি পড়া শেষ হতেই নিখিলবাবু যোগ করেন, "জেলা গ্রন্থাগার ভবনের উল্টোদিকেই অসম সাহিত্য সভার কার্যালয়। কাজেই আপনাদের

ছুটোছুটি করতে হবে না।"

হেসে বলি, "করতে হলেও আপত্তি ছিল না, এখানে আসার পর থেকে একদম ছুটোছুটি করার সুযোগ পাচ্ছি না।"

হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হয় নিখিলবাবুর। তিনি অফিসারকে বলেন, "আপনাকে 'ডিস্টার্ব' করলাম, আমি দুঃখিত। যাক্ গে, এবারে বলুন কি বলছিলেন।"

একটু ভেবে নিয়ে অফিসার শুরু করেন, "আগেই বলেছি প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী হলেও গণ্ডারের বেশ বংশ বিস্তার হয়।"

"হ্যাঁ, বারোটা গণ্ডার থেকে আটষট্টি বছরে আটশ' গণ্ডার হয়েছে।" আমি বলি।

অফিসার মাথা নেড়ে বলতে থাকেন, "পুরুষ-সংসর্গ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে গণ্ডারদের ৪৬ থেকে ৪৮ দিন বাদে বাদে 'ডাক-আসে।' ছেলে গণ্ডারদেরও কামোত্তেজনার একই রকম সময় নির্দিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষের 'কাল' এক না হলে গণ্ডারদের সঙ্গম সম্পূর্ণ হয় না। মেয়ে গণ্ডারদের গর্ভধারণের সময় সাড়ে ষোল মাসের মতো। ওদের একটি করে বাচ্চা হয় আর আয়ু হাতির সমান, গড়ে প্রায় সত্তর বছর।

"জন্মলাভের পরে গণ্ডারশাবকের ওজন হয় ৬৫ কেজি। জন্মের পর থেকেই দৈনিক ২/৩ কেজি করে ওজন বাড়তে থাকে। মেয়েরা তিন বছরেই যৌবন প্রাপ্ত হয় আর ছেলেদের সাত থেকে ন'বছর সময় লাগে। ফলে কাজিরাঙায় প্রায়ই দেখা যায় একটা 'ডাক-আসা' মেয়ে-গণ্ডার একটা অনিচ্ছুক ছেলে-গণ্ডারের পেছনে ধাওয়া করেছে।"

বিষয়বস্তু ও বলার ধরন শুনে আমরা হেসে ফেলি। একটু থেমে অফিসার আবার বলতে থাকেন, "ভারতে স্ত্রী ও পুরুষ-গণ্ডারদের শিং সমান লম্বা।"

"গণ্ডারের শিং খুব মূল্যবান, তাই না?"

"হ্যাঁ। এখন এক পাউণ্ড শিং-য়ের দাম অন্তত তিন/চার হাজার টাকা।" একবার থামেন অফিসার। তারপরে বলেন, "আর এই শিং-য়ের জন্যই

চোরা শিকারীদের গণ্ডারের ওপরে এত লোভ।"

"কিন্তু গণ্ডারের শিং-য়ের এত দাম কেন?"

"প্রাচীনকাল থেকেই একটা ধারণা আছে গণ্ডারের শিং-য়ে নানা ধরনের আশ্চর্য দ্রব্যগুণ রয়েছে।"

"যেমন?"

"সবচেয়ে বড় গুণ হল নষ্ট পুরুষত্ব উদ্ধার। আবার অনেকের ধারণা গণ্ডারের খড়্গা থেকে তৈরি পানপাত্রে বিষ খেলেও মানুষ মরে না, কারণ পাত্রটি বিষের দোষ নষ্ট করে দেয়। এমন বিশ্বাস আজও আছে যে প্রসবের সময় প্রসূতির বিছানার নিচে গণ্ডারের শিং রেখে দিলে নির্বিঘ্নে প্রসব হয়। এজন্য গণ্ডারের শিং ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া বেশ বেশি। একবারের জন্য অন্তত শ'ছয়েক টাকা।" একটু থেমে অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, "কিন্তু মজা কি জানেন?"

"কি?"

"মজা হল, গণ্ডারের শিং, গরু বা মোষের শিং-য়ের মতো কোনো শিংই নয়।"

"তাহলে?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন নিখিলবাবু।

"ওটা হল চাপ-বাঁধা, আঠা দিয়ে জোড়া লোমের একটা গোছা। জোড়ে ঘা মারলে খসে যায়, রক্ত পড়ে। কিছুদিন বাদে আবার গজাতে আরম্ভ করে। আরেকটা কথা হল…"

আবার থামেন অফিসার। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "সুইজারল্যাণ্ডে রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, গণ্ডারের শিং-য়ে প্রাণরসায়ন কিংবা হর্মোন-ঘটিত কোনো গুণই নেই।"

"আচ্ছা, গণ্ডারের চামড়া কি সত্যিই বর্মের মতো শক্ত?"

"হ্যাঁ।" অফিসার উত্তর দেন। বলেন, "এ সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলি, "বলে ফেলুন গল্পটা। শুনে ওপরে চলে যাই।"

অফিসার বলেন, "গণ্ডার কেমন করে তার এই বর্মের মতো শক্ত চামড়াটি পেল তার একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। শ্রীকৃষ্ণ নাকি একবার ঠিক করলেন, হাতির বদলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গণ্ডার ব্যবহার করবেন। কারণ শত্রুপক্ষের ধনুকধারীরা খুব সহজেই মাহুতকে মেরে ফেলে আর মাহুত মারা গেলেই হাতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।

"কৃষ্ণের নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা বন থেকে একটা গণ্ডার ধরে নিয়ে এলেন। তাঁরা তাকে বর্ম পরিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

"কিছুদিন বাদে একদিন কৃষ্ণ তাঁর সৈন্যদের বললেন—গণ্ডারটাকে নিয়ে এসো, দেখি সে কেমন যুদ্ধ শিখল ?

"বর্মপরা গণ্ডারটাকে নিয়ে আসা হল কৃষ্ণের সামনে। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পরেই কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, গণ্ডার বড়ই বোকা। তার কিছুই মনে থাকে না। ফলে সে একেবারেই যুদ্ধ শিখতে পারে নি।

"ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ তখন সেই বর্মপরা গণ্ডারটাকেই বনে তাড়িয়ে দিতে বললেন। আর তাই আজও গণ্ডাররা কৃষ্ণের বর্ম পরে রয়েছে।"



সুনীলবাবু ও সমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যখন জেলা গ্রন্থাগার ভবনের সামনে এসে পৌঁছলাম, তখন তিনটে বাজতে মিনিট তিনেক বাকি।

গ্রন্থাগার ভবনটি ভারী সুন্দর। ঝক্‌ঝকে পথের পাশে গাছে ছাওয়া অনেকখানি এলাকা নিয়ে ভবন। গেট দিয়ে ঢুকেই প্রশস্ত বাঁধানো চত্বর। তারপরে প্রেক্ষাগৃহ। সামনে খোলা বারান্দা।

গাড়ি থেকে নামতেই স্বেচ্ছাসেবিকারা ছাতা নিয়ে ছুটে এলো। একটু আগেই বৃষ্টি নেমেছে। আসামে বৃষ্টি নামার যেন কোনো নিয়ম-কানুন নেই।

অভ্যাগতদের অভিনন্দনের মাঝে আমরা ভেতরে এলাম। দক্ষিণাদা আগেই এসে গেছেন। এসেছেন অসম সাহিত্য সভার সভাপতি শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্মা ও প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীনগেন শইকীয়া, জোড়হাট সাহিত্য সভার সভাপতি শ্রীযতীন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং স্থানীয় এম. এল. এ. শ্রীবিজয় সন্দিকৈ। এসেছেন শ্রীবরঠাকুর, শ্রীমতী মিরি এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রেক্ষাগৃহটি সুন্দর এবং বেশ বড়। তিনদিকে ব্যালকনী, স্থায়ী মঞ্চ। আসনগুলি আরামদায়ক। ইতিমধ্যেই প্রায় সব আসন ভরে গিয়েছে। বাদলা দিনের সাহিত্য সভায় এমন জনসমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না।

দুটি ফ্রক পরা মেয়ে এসে প্রণাম করে আমাকে। মুখ তুলতেই একজনকে চিনতে পারি—প্রগতির ছোট বোন পাপড়ি, ডাকনাম লিবি। বয়স বছর চোদ্দ।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। আজকের ভাষণে আমি প্রগতির কথা বলব

কারণ সে আমাকে প্রথম আসামে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি তার জোড়হাটে এসেছি, কিন্তু আজ সে নেই এখানে।

লিবি এবং তার বান্ধবীর হাতে অটোগ্রাফের খাতা। খাতা দু-খানি সুনীলবাবু ও সমরেন্দ্রবাবুকে দিয়ে বলি, "ভালো করে দুটি অটোগ্রাফ দিন।"

খাতা আমার হাতে ফিরে আসবার আগেই মঞ্চে উপস্থিত হবার ডাক পড়ে। লিবিকে বলি, "আগামীকাল আমি এখানেই থাকছি, বিকেলের দিকে তোমরা হোটেলে চলে এসো।"

বুঝতে পারলেও ঠিকমতো বাংলা বলতে পারে না লিবি। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়াতে প্রস্তাব করে—তারপরে তাহলে আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবো।

"সে তখন দেখা যাবে।" আর তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলি। আমার সন্তানসমা কিশোরী বোনদুটি তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর সঙ্গে গতকালই আলাপ হয়েছিল। স্বল্পবাক, বিনয়ী ও বিদ্বান। আজ আলাপ হল বিজয়বাবু ও নগেনবাবুর সঙ্গে।

বিজয়বাবুর পিতা শ্রীকৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আসামের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার এবং অসম সাহিত্য সভার সভাপতি ছিলেন। বিজয়বাবুও দেখলাম বেশ লেখাপড়া করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়। কথায় কথায় তিনি বললেন, "স্বাধীনোত্তর আসামের ইতিহাসে ভাষার দাঙ্গা সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থপর লোকের প্ররোচনাতেই সে দাঙ্গা হয়েছে। আমরা তাদের চিনে নিয়েছি, সর্বদা তাদের উপরে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। আসামের একজন কংগ্রেসসেবী হিসেবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি দাদা, তেমন ঘটনা আমরা আর আসামের মাটিতে ঘটতে দেব না।"

একবার থেমে বিজয়বাবু আবার বলেন, "সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই

সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। কারণ সাহিত্যই সংহতির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। আমার স্থির বিশ্বাস এই সম্মেলন আসামে সংহতির পথকে প্রশস্ততর করবে এবং এর ফলে আমরা সবাই উপকৃত হব। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা মূল্যবান সময় নষ্ট করে এখানে এসে এই মিলনোৎসবকে সার্থক করে তুললেন।"

বিজয়বাবু বয়সে তরুণ। শুধু তিনি নন, এই সম্মেলনে এসে যে দু-জন মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল, আসামের গৃহ ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী এবং ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী, তাঁরাও দেখলাম বয়সে নবীন। আমার স্থির বিশ্বাস এই তরুণ নেতৃত্ব আসামের মাটি থেকে চিরকালের মতো প্রাদেশিকতাকে দূর করে দেবে।

নগেনবাবু সাহিত্য সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি কেবল একজন সুসাহিত্যিক নন, সুবক্তাও বটে। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বললেন—উনবিংশ শতকে আসামের সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসেছে, তার সূত্রপাত বাংলায়। কলকাতায় পাঠরত আসামের ছাত্ররাই অসমীয়া সাহিত্যে সেই নবজাগরণ এনেছিলেন। তাঁদের সাহিত্য-চেতনায় শুধু অসমীয়া সাহিত্যে নতুন-প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বাংলা সাহিত্যও সেই নতুন ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছিল।

শ্রীশইকীয়া বললেন—আমরা অসমীয়া সাহিত্যিক ও পাঠকবর্গ নিয়মিত বাংলা বই পড়ি। বাংলার সাহিত্যিক এবং পাঠক-পাঠিকাদেরও অসমীয়া বই পড়া প্রয়োজন।

—বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও ধর্মের মানুষ একসঙ্গে আসামে বাস করছেন। তাঁদের সবারই আসামের আত্মার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে একাত্মবোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে। অনৈক্যের অসুন্দর চিন্তাকে দূর করে সকলকে একসঙ্গে আসাম-মায়ের বিকাশে অবদান যোগাতে হবে।

—এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হবে সাহিত্য। কারণ সাহিত্যের বাণী সম্প্রীতির বাণী। সাহিত্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখায়,

শ্রদ্ধা করতে শেখায়। সেই ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আমাদের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করে দেবে। আমি আশা করব আসামে অনুষ্ঠিত এই বাংলা সাহিত্য সম্মেলন বাংলার সঙ্গে আসামের আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আমার ভাষণ পাঠের পরে সুনীলবাবু ও সমরেন্দ্রবাবু তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। সুনীলবাবু আমার বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। সমরেন্দ্রবাবু উপস্থিত দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—সাহিত্য সভায় এত মানুষের সমাবেশ কলকাতায়ও খুব কম দেখা যায়।

ডাঃ বাগচী তাঁর ভাষণের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে উত্তরবঙ্গের বাংলার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার মিল নিয়ে আলোচনা করলেন।

শ্রীমতী মিরি বললেন—এই অনুষ্ঠান প্রেম আর মিলনের উৎসব। এ মিলন চিরস্থায়ী হোক্।

বিজয়বাবু বললেন—শুধু রাজনৈতিক সংহতি নয়, সেই সঙ্গে সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠার পথকেও প্রশস্ত করুন।

সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন দক্ষিণাদা। তিনি বললেন—সাহিত্যের বাণী সংহতি আর প্রেমের বাণী। যে ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি হোক্ না কেন, ভালোবাসা আর মানবতার বাণী ছাড়া কোনো সাহিত্যই কালজয়ী হতে পারে না।

সভা শেষে বাইরে বেরিয়ে দেখি এখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। যজ্ঞেশ্বরবাবু গাড়ি আনাবার প্রস্তাব করলেন। আমরা রাজি হলাম না। বৃষ্টি মাথায় করেই নেমে এলাম পথে।

রাস্তা পেরিয়ে 'চন্দ্রকান্ত সন্দিকৈ ভবনে' এলাম। বাংলো টাইপের একতলা বাড়ি। সামনে বাঁশের বেড়া দেওয়া সুন্দর বাগান। ছোট হলেও বাড়িটি ভারী সুন্দর। মন্দিরের পবিত্রতা তার সারা অঙ্গে।

এটি অসম সাহিত্য সভার কেন্দ্রীয় কার্যালয়। গৌহাটিতে এঁদের একটি শাখা আছে, সে বাড়িটির নাম 'ভগবতী প্রসাদ বরুয়া ভবন'।

নগেনবাবুর অনুরোধে সাহিত্য সভার অন্যতম কর্ণধার শ্রীমাধবচন্দ্র ভূঁইঞা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখান। কথায় কথায় তিনি আমাকে অসম সাহিত্য সভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বললেন—

অসম সাহিত্য সভা ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য সংস্থা সমূহের অন্যতম। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর শিবসাগরে এই সভার জন্ম হয়। বছরটি বিশ্বের ইতিহাসে গৌরবময়। কারণ ঐ বছরে অক্টোবর বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। জানি না সেই সুমহান বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই উদ্যোক্তারা এই সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা? তবে শিবসাগরকে সাহিত্য সভার জন্মস্থান নির্বাচিত করে তাঁরা যোগ্য কাজই করেছিলেন। কারণ শিবসাগর শুধু আহোম সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী নয়, শিবসাগর বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্যের দু-জন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার মাতৃভূমি। তাঁরা হলেন শ্রীহেমচন্দ্র বরুয়া ও শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। শিবসাগর থেকেই ১৮৪৬ সালের, জানুয়ারী মাসে অসমীয়া ভাষার প্রথম সাহিত্যপত্র 'অরুণোদয়' প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৭ সালে শিবসাগরে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই প্রতিষ্ঠার প্রথম বীজ বপিত হয়েছিল কলকাতায় তিরিশ বছর আগে—১৮৮৮ সালের ২৫শে অগাস্ট তারিখে। সেদিন কয়েকজন অসমীয়া ছাত্র ৬৭ নম্বর মীর্জাপুর স্ট্রীটে 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সন্ধানী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ও শ্রীচন্দ্রকুমার আগরওয়ালা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসেই তাঁরা যুগান্তকারী অসমীয়া মাসিকপত্র 'জোনাকি' প্রকাশ করলেন। সেই একই আদর্শকে পাথেয় করে ১৯১৭ সালে এই সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া সভার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তারপর থেকে আসামের বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এই সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদের অনেকেরই ছবি টাঙানো

রয়েছে এখানে। সশ্রদ্ধ অন্তরে আমি তাঁদের দর্শন করি। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৯২০), কনকলাল বরুয়া (১৯২৪), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৯২৪), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৯), কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ (১৯৩৭), নালমণি ফুকণ (১৯৪৪, ৪৭), বেণুধর শর্মা (১৯৫৬), ডিম্বেশ্বর নিওগ (১৯৪৮), হেম বরুয়া (১৯৪৪) ও মহেশ্বর নিওগ (১৯৪৮) প্রভৃতির নাম আমার সুপরিচিত।

১৯২৩ সালে জোড়হাটে সভার পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেটি সভার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধিবেশন। কারণ সেই সম্মেলনেই সভার উদ্দেশ্য লিখিতভাবে স্থির হয়।

জোড়হাট শুধু আহোম রাজত্বের শেষ রাজধানী নয়, নবীন আসামের প্রথম সাংস্কৃতিক রাজধানীও বটে। তাই বোধকরি অসম সাহিত্য সভা এখানেই তাঁদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করেছেন। ১৯২৩ সালের পরেও আরো দু-বার এখানে সাহিত্য সভার অধিবেশন বসেছে—১৯৪০ ও ১৯৫৪ সালে।

সব দেখে মাধববাবুর সঙ্গে ফিরে আসি সভাকক্ষে। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিতরা আসন গ্রহণ করেছেন। সভাকক্ষটি ছোট হলেও ভারী সুন্দর। তার ওপরে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে। সভাপতিদের ফটোর মাঝে-মাঝে টাঙানো রয়েছে ভারতবিখ্যাত মনীষীদের ছবি—বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও নেতাজী প্রভৃতির ছবি।

শুরু হল সভা—অসম সাহিত্য সভার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। উদ্বোধন সঙ্গীতের পরে প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক এবং পার্লামেন্টের সদস্য সৈয়দ আবদুল মালিক আমাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন—সাহিত্যের ভাষা হৃদয়ের ভাষা। সাহিত্যিকের হাতে যে হাতিয়ার রয়েছে, তা দিয়ে যেমন প্রাচীর তৈরি করা যায়, তেমনি গড়া যায় সেতু। আপনারা বাংলার সাহিত্যিকরা আসামে এসে সেই সেতু তৈরি করলেন। আপনারা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

—আমরা সবাই ভারতীয়। আজ সময় এসেছে ভারতবাসীর ভারত-

বাসীকে ভালোবাসার। সেই ভালোবাসা, সেই প্রেম ও প্রীতি ছাড়া সমন্বয় শক্তিশালী হবে না। আর সমন্বয় ছাড়া জাতীয় ঐক্য শক্তিশালী হতে পারে না। সাহিত্যই সেই ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।···

তারপরে যতীনবাবু অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন—

'জয়ে জয়ে আপনি আমাৰ (আমাদের) নতুন বছৰ আৰু (আর) বহাগ বিহুৰ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰক। আপুনি বাংলা ভাষাৰ এজন (একজন) প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক। আপোনাৰ দৰে (মতো) এগৰাকী (একজন) বৰেণ্য শব্দশিল্পীক (শব্দশিল্পীকে) আমাৰ মাজত (মাঝে) পাই (পেয়ে) আমি, যোৰহাট সভাৰ সদস্যসকল তথা সমূহ যোৰহটীয়া ৰাইজ (জোড়হাটবাসীগণ) কৃতাৰ্থ হৈছোঁ (হয়েছি)। হাজাৰ বছৰীয়া (বছরের) সাহিত্য-ঐশ্বৰ্যেৰে ঐশ্বৰ্য-শালী অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যই অসমৰ মাজে দিয়েই (মধ্য দিয়ে) যুগে যুগে ভাৰতাত্মাৰ তথা বিশ্বাত্মাৰ সন্ধান কৰি আহিছে (এসেছে)। আপুনিও আমাৰ নিকটতম ভগ্নীভাষা বাংলাৰ মাজেদি (মধ্য দিয়ে) একে (একই) সন্ধানত (সন্ধানে) আত্ম-নিয়োগ কৰিছে (করেছেন)। সেয়ে (তাই) আপোনালোক (আপনারা) শিল্পী-সাহিত্যিক সকল দেশ আৰু কালৰ (কালের) হৈয়ো (হয়েও) দেশাতীত, কালাতীত। অসম সাহিত্য সভা অসমৰ শিল্পী-সাহিত্যিক সকলৰ (সকলের) অনুষ্ঠান (সংগঠন)। অস-মীয়া ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্দ্ধনৰ (সংবর্দ্ধনের) বাবে (জন্য) ১৯১৭ চনৰেপৰা (সন থেকে) এই অনুষ্ঠানে যথা-সাধ্য কৰি আহিছে (আসছে)। সেয়েহে (সেইজন্য) প্ৰায় ৫০০ শাখাৰে (শাখায়) গঠিত অসম সাহিত্য সভা অসমবাসীৰ বাবে মৰমৰ (স্নেহের) পৱিত্ৰ অনুষ্ঠান। আজি এই পৱিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত (কার্যালয়ে) আপোনাসকলক (আপনাদের সকলকে) আমাৰ বিহুববীয়া (বিহুর) শ্ৰদ্ধা-সম্ভাষণ জনাবলৈ (জানাতে) পাই (পেয়ে) যোৰহাট সাহিত্য সভাৰ সদস্যবৃন্দই

যোৰহটীয়া ৰাইজে পৰম আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সাহিত্যকৃতি মানৱতাৰ অক্ষয় বাণীমূৰ্তি হওক। এই বাণীমূৰ্তিয়ে বাংলাৰ নহয় (নয়), অসমেৰো ; অসমৰে (আসামেরও) নহয় ভাৰতৰো (ভারতেরও) মৰ্মবাণী প্ৰকাশ কৰক (করুক)। অসমীয়া পঢ়ুৱৈ (পাঠক) সমাজত আপোনাসকলৰ লেখাৰ যথেষ্ট সমাদৰ। অসমীয়া ভাষাত (ভাষায়) ৰচিত সাহিত্যৰাজিও বাংলাভাষী-সকলৰ মাজত সমাদৃত হওক আৰু এই পাৰস্পৰিক আদান-প্ৰদানে হৃদয়ৰ সংযোগ-সেতু স্থাপন কৰক—ইয়াকে (এই) কামনা কৰিলোঁ (করি)।
আপুনি এটি (একটি) সুস্থ কৰ্মময় সুদীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰি দেশ-মাতৃকাৰ মুখ যেন উজ্জ্বল কৰে। আমাৰ সশ্ৰদ্ধ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰক।'

প্রত্যেকটি অভিনন্দনপত্র সুদৃশ্য কাঠের ফ্রেমে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওপরে নাম লেখা। অভিনন্দন পত্রের সঙ্গে ওঁরা আমাদের বিহুর ফুলাম গামোছা উপহার দিলেন।
অভিনন্দনের উত্তরে বললাম—আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যাটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। আমি আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিলাম। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।
সুনীলবাবু, সমরেন্দ্রবাবু ও ডাঃ বাগচীর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরে দক্ষিণাদা উঠে দাঁড়ালেন। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ নিয়ে সর্বশেষে তিনি প্রস্তাব রাখলেন—আপনাদের এই সুমহান সংস্থা অসম সাহিত্য সভার প্রথম বীজ বপিত হয়েছিল কলকাতায়। সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত। তাই আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা কলকাতায় এই সাহিত্য সভার একটি শাখা স্থাপন করুন, আমরা যেমন গৌহাটিতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শাখা স্থাপন করেছি।

এই দুটি শাখা অদূর ভবিষ্যতে আসাম ও বাংলার মিলনতীর্থে পরিণত হবে। বক্তৃতার পরে এলো চা, সেই সঙ্গে বিহুর পিঠে। ওঁদের ভাষায় 'তিল পিঠা, 'ঘিলা পিঠা ও 'ফেণী পিঠা' প্রভৃতি। ওঁরা সবাই চা খেলেন কাপে আর আমাদের পাঁচজনকে দিলেন অসমীয়া কাঁসার পাত্রে, নাম বাণবাটি। চা পানের পরে সমবেত কণ্ঠে আসামের প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা ও গীতিকার শ্রীমিত্রদেব মহন্ত রচিত ভাষাজননীর বন্দনাগীতি শুরু হল—

'চিৰ চেনেহী[১] মোৰ ভাষা-জননী,
আই ধন্যে-পুণ্যে হৃৎ-পাৱনা।
প্রকৃতি পৰশে-ৰসে অমল কমল
চঞ্চল হৃদি-জলে ঢালে পৰিমল
কোমল চঁপাৰ কলি
ঢৌৱে[২] ঢৌৱে ঢৌৱে বুলি[৩]
ৰিণিকি ৰিণিকি কোনে[৪] তোলে ৰাগিণী।
সংসাৰ গুৰু ভাৰে অৱশ পৰাণ,
বীণাত বিলীন হয় বীণী ভৰা তান ;
কাৰ নিচুকণি[৫] সনা[৬]
শুনি বাণী বেথা[৭] পমা[৮]
চকুতে[৯] চকুৰ নীৰে লয় জিৰনি[১০] ?
জীৱনে-মৰণে-ৰণে লহৰী-সুধাৰ
ৰসনা শিতানে[১১] বহি সিঁচা[১২] শত ধাৰ[১৩],
হে মোৰ মধুৰাননা,[১৪]
মাগিছোঁ মাধুৰী-কণা,
দিয়াঁ,[১৫] দিয়াঁ আই[১৬] মধুভাষিণী।
চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা-জননী॥

১ স্নেহের, ২ ঢেউয়ে, ৩ হাঁটা, ৪ কে, ৫ ঘুমপাড়ানী, ৬ মাখা, ৭ ব্যথা, ৮ বিগলিত, হওয়া, ৯ চোখে, ১০ বিশ্রাম, ১১ শিওরে, ১২ সিঞ্চন করা, ১৩ ধারা, ১৪ মধুমুখ, ১৫ দেওয়া, ১৬ মা।

বিচিত্রানুষ্ঠান শেষ হল রাত সাড়ে এগারোটায়। সুবোধবাবু বিকেলেই বলেছিলেন ডেলিগেট ও স্থানীয় সদস্যদের ইচ্ছে আজ আপনাদের সঙ্গে বসে খান। কাজেই আমি ও বিজয়বাবু হল থেকে বেরিয়ে ডেলিগেট ক্যাম্পে এলাম।

যে কোনো সম্মেলনে শেষদিনের এই আহারপর্বটি বড়ই বেদনাদায়ক —বিদায় ব্যথায় ভারাক্রান্ত। আসামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন এখানে। তাঁরা কেউ কেরাণী, কেউ উকিল কিংবা ডাক্তার, কেউ শিক্ষক অথবা অধ্যাপক, কেউ বা ব্যবসায়ী। ভিন্ন তাঁদের বয়স কিন্তু অভিন্ন তাঁদের সাহিত্যপ্রীতি। আর তাই তাঁরা এসেছিলেন এখানে। দুটি দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে, কেউ টের পান নি। এইমাত্র খেতে বসে খেয়াল হয়েছে—এবারকার মতো এটি তাঁদের শেষ পঙ্‌ক্তি ভোজন। জনৈক প্রতিনিধি বলে উঠলেন—'**Last Suppper.**

না, ঠিক তা নয়। যীশু আর কোনোদিন তাঁর আপনজনের সঙ্গে আহার্য গ্রহন করেন নি। কিন্তু এই প্রতিনিধিরা আবার মিলিত হবেন আগামী সম্মেলনে। তবে তার এখনও অনেক দেরি। তাই আজকের এই বিচ্ছেদ সাময়িক হলেও কম বেদনাদায়ক নয়।

অন্যান্য জায়গায় সাধারণত এই বিদায়ের পালা শুরু হয় পরদিন সকালে। এখানে শুরু হল রাতের খাবার পরেই। কারণ রেলে যাতায়াত অসুবিধে বলে এখানে প্রতিনিধিরা অধিকাংশই এসেছেন নিজেদের ভাড়া করা বাসে। একে তো বাসভাড়ার একটা ব্যাপার আছে, তার ওপরে সম্মেলন শেষ। এখন সবারই তাড়াতাড়ি কাজে ফিরে যাবার তাড়া দেখা দিয়েছে। তাই ওঁরা সকালের আগেই যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে চান।

অতএব খাওয়ার পরেই বেঙ্গলী ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁদের বিদায় দিতে হল আমাকে। প্রথমেই লামডিং-য়ের বাস ছাড়ল। উমা সহ আরও অনেকে চলে গেল জোড়হাট ছেড়ে—আমাকে ছেড়ে।

তারপরে একে একে বিদায় দিলাম কাছাড়, নওগাঁ, ডিগবয়, ডিব্রুগড় ও গৌহাটির প্রতিনিধিদের। শেষের দু-দল অবশ্য আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে আমার। আমি পরশু ডিব্রুগড় ও তার পরদিন গৌহাটি যাচ্ছি।

একে একে ওদের বাস ছাড়ে, আমি হাত নেড়ে বিদায় জানাই। বাস পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়। আমার হাত থেমে যায়। তারপরেই খেয়াল হয় চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে। আমি চোখ মুছি।

কিন্তু কেন? কেন আমার কান্না পাচ্ছে?

ওঁরা তো আমার কেউ নন। দু-দিন আগেও যে চিনতাম না কাউকে। জীবনে হয়তো আর কোনোদিন দেখাও হবে না। তাহলে ওঁদের জন্য কেন আমার এই অশ্রুপাত?

ওঁরা যে আমার পাঠক-পাঠিকা। ওঁদের সঙ্গে আমার যোগ হৃদয়ের। দেখা না হলেও ওঁদের আমি কোনোদিন ভুলব না। ওঁরাও ভুলবেন না আমাকে। আমি তো ওঁদের মাঝেই থাকব বেঁচে। ওঁদের স্মৃতি আমার মনোবীণায় আনন্দ ও বেদনার মধুর সুর হয়ে চিরদিন ঝঙ্কৃত হবে।

১০

প্রতিনিধিদের বিদায় জানিয়ে কাল হোটেলে ফিরে আসতে রাত দেড়টা বেজে গিয়েছিল। কিন্তু আজও ঘুম ভাঙল সকাল পাঁচটায়।

হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি ঘোষবাবুও উঠে পড়েছেন। একই বিমানে কলকাতা থেকে এসেছি। তিনদিন পাশাপাশি ঘরে থেকেছি। একসঙ্গে খেয়েছি ও বেড়িয়েছি।

আজ তাঁকে বিদায় দিতে হবে আমার। শুধু ঘোষবাবু নন, সেই সঙ্গে সুনীলবাবু এবং সমরেন্দ্রবাবুও আজ ফিরে যাচ্ছেন কলকাতায়। আমি আর দক্ষিণাদা কেবল থেকে যাচ্ছি এখানে। দক্ষিণাদা রিটায়ার করে-ছেন, আর আমি ভবঘুরে। তাই বোধহয় জোড়হাটের মানুষ আমাদের আজ যেতে দিলেন না এখান থেকে।

একদিকে কিন্তু ভালোই হল। আজ একটু আড্ডা দেওয়া যাবে আর দেখা যাবে জোড়হাটকে। সভার হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে গত তিনদিন এর একটাও হয়ে ওঠে নি।

ঘোষবাবুর সঙ্গে চা খেয়ে নিলাম। তিনি নাকি গতরাতে একদম ঘুমোতে পারেন নি। পাশের ঘরের বোর্ডাররা ভোর সাড়ে চারটে পর্যন্ত গান গেয়েছেন। বিস্মিত হবার মতোই বটে। গানের জন্য গায়ক ঘুমোতে পারলেন না, অথচ আমার কোনো অসুবিধে হয় নি। সম্ভবত সেই গায়ক-দের সুরে অসুরের বিক্রম থাকার জন্যই সুরসাধক সুনীল ঘোষ দু-চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। যাক্ গে, আজ বাড়ি গিয়ে ঘুমো-বেন।

ঘোষবাবু গোছগাছ করতে ঘরে চলে গেলেন আর তারপরেই সোমেশ ও প্রমথ এসে হাজির হল। ওরা দুজনেই এ্যাডভোকেট তাই বোধহয়

এই হোটেলে একই কামরায় রয়েছে। সোমেশ গতকাল গৌহাটির ডেলিগেটদের সঙ্গে চলে যেতে পারে নি, কারণ সে সম্মেলনের রাজ্য কমিটির বিদায়ী সম্পাদক। তার কিছু সরকারী কাজকর্ম বাকি রয়েছে। এবারে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শান্তি আইন। তিনিও কাল রাতে গৌহাটি চলে গিয়েছেন।

সোমেশের না যাবার কারণ বুঝতে পারছি কিন্তু প্রমথ যায় নি কেন? তার যে কোর্ট কামাই হচ্ছে!

সেই কথাই জিজ্ঞেস করি প্রমথকে। সে উত্তর দেয়, "গত তিনদিন যে আপনার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারি নি।"

"আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে বলে কোর্ট কামাই করছ?"

"কোর্ট তো বারো মাসই আছে দাদা! আপনি তো আর চিরদিন থাকবেন না এখানে।"

কথাটা মিথ্যে নয় কিন্তু এমন সত্যের সম্মুখীন হবার সৌভাগ্য সচরাচর হয় না। তাই নীরবে তাকিয়ে থাকি প্রমথর দিকে।

ডাঃ মুখার্জি ও রবীনবাবু ঘরে আসেন।

সোমেশ ও প্রমথ উঠে দাঁড়ায়। বলে, "আমরা সুনীলদার ঘরে যাচ্ছি।"

ওরা চলে যায়। আমি কথায় কথায় রবীনবাবুকে বলি, "আমাকে একজন ভলান্টিয়ার দিতে পারেন?"

"কেন বলুন তো?" ওঁরা বিস্মিত।

"সে আমাকে একটু জোড়হাট দেখিয়ে দেবে।"

"তা, সেজন্য ভলান্টিয়ারের কি দরকার? চলুন না আমার সঙ্গে।" রবীনবাবু বলেন।

"আপনার দোকান···"

"দোকানে লোক আছে। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি ব্রেক-ফার্স্ট করে নিন।"

"তাই চলুন।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই ডাক্তারবাবু বলে ওঠেন, "আমরাই আপনাকে জোড়হাট দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু আপনাকে যে আবার ডাক্তারখানা খুলতে হবে!"
"ডাক্তারখানা খোলাই আছে। আমি আজও চেম্বারে বসছি না। রোগীদের কাছ থেকে চারদিনের ছুটি নিয়েছি যে।"
সহাস্যে বলি, "তাঁদের রোগও কি আপনার ছুটি মঞ্জুর করেছে।"
"সে রকম আর্জেন্ট হলে কম্পাউণ্ডার খবর দিচ্ছে, গিয়ে দেখে আসছি। আর তা নাহলে কম্পাউণ্ডার নিজেই ম্যানেজ করছে। রোগী তো বারোমাসই থাকবে ভাই! আপনি তো আর চিরদিন থাকবেন না জোড়হাটে।"
একটু আগে প্রমথ যে কথা বলেছে, ডাক্তারবাবুও সেকথাই বললেন। অথচ ছু-জনে আসামের ছুই প্রান্তের বাসিন্দা, বয়স এবং বৃত্তিও ভিন্ন। তবু তারা যেন একই মানসিকতার অংশীদার।
রবীনবাবু ও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে নেমে আসি নিচে। প্রমথ বারান্দা থেকে মনে করিয়ে দেয়, "দাদা, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, অনেকে দেখা করতে আসবে।"
কেউ না এলেও দশটার আগে ফিরে আসতে হবে। সুনীলবাবুরা দশটায় বিমানবন্দরে রওনা হবেন।
রবীনবাবুর সঙ্গে সাইকেল রয়েছে। তাই বোধহয় রাস্তায় নেমেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন, "একটা রিক্সা নিই?"
বলি, "বেড়াতে বেরিয়েছি। চলুন না হেঁটেই যাওয়া যাক্।"
রবীনবাবু একটা দোকানে সাইকেল রেখে দিলেন। রবীনবাবুর পুরো নাম রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক। বয়স পাঁচের কোঠায় পৌঁছয় নি। সাধারণ বাঙালীর চেহারা। তাঁর বাবা চা-বাগানের ডাক্তার ছিলেন। রবীনবাবুর ভাই নেই, তিন দিদি। সবাই সুখে সংসার করছেন।
ডিব্রুগড়ের এক ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর নাম পুতুল। তাঁদের ছুটি ছেলে-মেয়ে—রথীন্দ্র ও গায়ত্রী। রথীন এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে।
আমরা হাঁটতে হাঁটতে বেঙ্গলী ক্লাবের সামনে আসি। গত ছু-দিন এসময়

এখানে কত লোকের আনাগোনা ছিল। আর আজ—আজ প্রতিমাহীন পুণ্য মন্দির।

বেঙ্গলী ক্লাবকে ডানদিকে রেখে এগিয়ে চলি। হঠাৎ রবীনবাবু আমাকে বলেন, "আজ সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।"

"কেন বলুন তো?"

"আমার স্ত্রী আপনার একজন ভক্ত-পাঠিকা, তার অনুরোধ।"

আপত্তি করা সম্ভব নয় সুতরাং সম্মত হই। তারপরেই কথাটা মনে পড়ে আমার। ডাক্তারবাবুকে বলি, "বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগের সম্মেলন হল বলে আসামে আসতে পারলাম, কিন্তু কেউ আমাকে ক্লাবের কথা বললেন না।"

"তা বেশ তো, বলছি শুনুন" চলতে চলতে ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, "১৯১২ সালে এই ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। এটি বাঙালীদের ক্লাব হলেও যাঁর নামে এই ক্লাব তিনি কিন্তু অসমীয়া, স্বর্গীয় লক্ষ্মীকান্ত বরুয়া। তাঁরই দেওয়া জমিতে এই ক্লাব। যে ন'জন সভ্য এই ক্লাবের Founder member, তাঁরা কেউ আজ আর নেই আমাদের মাঝে। প্রথমে এখানে একটি ক্লাব ঘর ও ছোট একটা auditorium ছিল আর তার সংলগ্ন জমিতে ছিল মন্দির-হরিসভা এবং একটা Primary-cum-M. E. School. স্কুল বাড়িটি ছিল টিনের দোচালা। Bengal partition এর পরে এখানে বাঙালীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের ক্লাব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। But we have still restricted the membership to only 150."

"কারণ?" জিজ্ঞেস করি।

ডাক্তারবাবু উত্তর দেন, Membership বাড়ালে তাঁদের সেরকম amenitics দেবার সুযোগ নেই আমাদের। পাঠাগারে এখন পর্যন্ত আমরা মাত্র হাজার দেড়েক বই যোগাড় করতে পেরেছি। অবশ্য হরিসভা is Open to all.

"আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে আমি সভাপতি থাকাকালীন রতনবাবু-দের নিরলস প্রচেষ্টায় এতবড় একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। আপনাদের উপস্থিতি যে আমাদের কতখানি প্রেরণা যুগিয়েছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।" একবার থামলেন ডাক্তারবাবু। তারপরে আবার বলেন, "অবশ্য বেঙ্গলী ক্লাবের বর্তমান উন্নত অবস্থার জন্য প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে দশ পরিবার এবং তৎকালীন জোড়হাটের বাঙালী সমাজের কাছে।"

ডাক্তারবাবু থামতেই রবীনবাবু বলে ওঠেন, "আমরা এসে গিয়েছি। এই যে ডানদিকে মণিরাম দেওয়ানের ফাঁসির স্থান।"

তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাই। পথের পাশে একফালি মাঠ। তারই মাঝখানে খানিকটা বাঁধানো জায়গা। চারিদিকে একটু রেলিং পর্যন্ত নেই। আসামের প্রথম শহীদতীর্থের প্রতি এই অযত্ন পীড়াদায়ক। আমরা কি এই জায়গাটুকুকে ঘিরে তার চারিপাশে একটি ফুলের বাগান করে দিতে পারি না?

না। এই শহীদ তীর্থের প্রতি অয়ত্নের কারণ মণিরামের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়। খেয়ালের অভাবেই এমনটি হয়েছে। নইলে শহীদ বেদির সামনে সাইনবোর্ডে অসমীয়াতে মণিরামের জীবনী লেখা থাকবে কেন?

রবীনবাবু বাংলা করে পড়ে শোনান—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শহীদ মণিরাম দেওয়ান। তিনি বৃটিশের করদমিত্র রাজার মন্ত্রী ছিলেন। আহমদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে বৃটিশ শাসকদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। তাই ১৮৫৭ সালে যখন ভার-তের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব শুরু হল, তখন আসামেও সেই বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ল।

সেই বিপ্লবের প্রধান নায়ক ছিলেন মণিরাম দেওয়ান। ইংরেজ শাসকরা অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। ১৮৫৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী এখানে তাঁকে ফাঁসি দেয়।

শহীদতীর্থে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম রেখে এগিয়ে চলি জোড়হাটের প্রধান

রাজপথ গড় আলির দিকে। একটু বাদে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, মণি-রাম দেওয়ানের জীবনী নিয়ে আসামে একটি জনপ্রিয় লোকগীতি রয়েছে, তাই না ?"

"হ্যাঁ।" ডাক্তারবাবু উত্তর দেন।

রবীনবাবু জিজ্ঞেস করেন আমাকে, "আপনি সে গান শুনেছেন নাকি ?"

"গান শুনি নি তবে" উত্তর দিই, "শ্রীপ্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর 'Ballads & Tales Of Assam' বইতে সেই গানটির কথা পড়েছি।"

"কি লিখেছেন শ্রীগোস্বামী ?"

"লিখেছেন—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতের সিপাহীদের মতো ডিব্রু-গড়ের অসমীয়া বাহিনাতেও মানে ফার্স্ট আসাম লাইট ইন্‌ফ্যাণ্ট্রীতেও অসন্তোষ দেখা দিল। তাঁরা সারিং রাজার সঙ্গে যোগদান করলেন। এক প্রাচীন রাজপরিবারের বংশধর সারিং রাজা ব্রিটিশদের কবল থেকে আসামকে মুক্ত করবার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ ও বয়সে নবীন। কিন্তু তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন জোড়হাটের আসাম টি কোম্পানীর অভিজ্ঞ দেওয়ান মণিরাম। তাঁর সঙ্গে সিপাহীযুদ্ধের সেনাপতিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।

"যুদ্ধে জয়লাভ করে ব্রিটিশরা সারিং রাজার বাড়ি খানা-তল্লাশ করলেন। বহু মূল্যবান নথিপত্র পাওয়া গেল। তাঁরা মণিরামের হদিস পেলেন। তাঁকে কলকাতায় বন্দী করা হল।

"বৃটিশরা মণিরামকে জোড়হাটে নিয়ে এলেন। শুরু হল বিচারের প্রহসন। অবশেষে তৎকালীন শিবসাগর জেলার ডেপুটি কমিশনার সি. হলরয়েড মণিরামকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলেন।"

"তাহলে মণিরাম রাজার দেওয়ান নয়, আসাম টি কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন ?" আমি থামতেই রবীনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ। শ্রীগোস্বামী তাই লিখেছেন। তাছাড়া আরও দুটি গোলমাল রয়েছে।"

"কি ?" ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন।

"শ্রীগোস্বামী লিখেছেন—'executed on the bank of Tokolai near Jorhat.' কিন্তু জায়গাটা তো দেখলাম জনপদের মাঝে। তাহলে কি টোকোলাই নদী তখন ওখান দিয়ে বয়ে যেতো, এখন তার কোনো চিহ্নই নেই ?
"আর রতনবাবু আমাকে বলেছেন—মণিরাম ১৮০৬ সালে শিবসাগর জেলার সারিং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃটিশদের সেরেস্তদার এবং তহশীলদার ছিলেন।"
"স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর আসামের ইতিহাসে মণিরাম সম্পর্কে কি লিখেছেন ?" ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।
উত্তর দিই, "না, তিনি ফাঁসির স্থান সম্পর্কে কোনো হদিশ দেন নি। কারণ গেইট ইতিহাসকার হলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজ প্রতিনিধি—K. C. S. I, C. I. E এবং I. C. S. তিনি তাঁর 'A History of Assam' বইতে লিখেছেন—
There was a large number of Hiudustani Sepoys in the Ist Assam Light Infantry,···at Dibrugarh,···In September 1857 an uneasy feeling began to display itself among the men of Dibrugarh regiment, owing to letters recieved by some of the Hindustani Sepoys from Shahabad, where many of them had been recruited ; and some of them were found to have intered into a conspiracy with the Saring Raja, a scion of the Ahom royal family who residied at jorhat···The Saring Raja was a mere boy, and a complete tool in the hands of his Dewan, Maniram Dutt, who was at this time in Calcutta. The Raja was placed under arrest and on his house being searched, reasonable letters were discovered from Maniram. The latter

was arrested in Calcutta, and, after being detained there for some weeks he was sent up to Assam, where he was tried, convictd and executed. Four other ringleaders in the plot were placcd on their trial, of whom one was hanged and three were sentenced to long terms of transportation…'

আমার বলা শেষ হয়েছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু ও রবীনবাবু কথা বলছেন না, *তাঁরা নিঃশব্দে হেঁটে চলেছেন। হয়তো ঐতিহাসিকের পক্ষপাতিত্ব* দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যে বড়ই বিরল বিশ্বের ইতিহাসে।

আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবি। আমি ভাবি—মণিরামের ফাঁসির স্থান নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, ইতিহাসকার তাঁব প্রতি অবিচাব কবে থাকতে পারেন, কিন্তু মতানৈক্য নেই তাঁর অভূতপূর্ব দেশপ্রেম সম্পর্কে। তাঁব আত্মদান বৃথা হয় নি। পরবর্তীকালে আসামের আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে তিনি দেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তাই আসামের মানুষ তাঁকে ভুলে যান নি। অসমীয়া লোকগায়করা আজও মুক্তকণ্ঠে মণিরাম দেওয়ানের গীত গেয়ে চলেছেন। আর এ গীত কোনোদিন থামবে না। কারণ মণিবামের মৃত্যু নেই।

গড়-আলির ওপবেই ডাঃ মুখার্জির চেম্বার ও ডিস্‌পেন্‌সারী। ডাক্তারবাবু প্রথমে সেখানেই নিয়ে এলেন আমাকে। বললেন, "জোড়হাটে এসেছেন আর আমার চেম্বারটা দেখে যাবেন না! এক কাপ চা খান আর সেই ফাঁকে আপনার একখানি ছবি তুলে নিই।"

চা খেয়ে ও ছবি তুলে ডাক্তারবাবু ও রবীনবাবুর সঙ্গে নেমে আসি পথে। গড় আলি বেশ মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। গড় মানে কেল্লা। এটি জোড়হাটের প্রাচীনতম পথ।

গড় আলি দিয়ে আমরাএখন দেওয়াল রোডের দিকে চলেছি। দেওয়াল মানে মন্দির। আমরা যে মন্দির দর্শন করতে চলেছি—বুড়িগোহানীর মন্দির। অসমীয়ারা লেখেন—'বুঢ়ীগোসানী দেৱালয়।' আগেই বলেছি, ওঁরা 'স-' কে 'হ' উচ্চারণ করেন। আর আমাদের 'র' হচ্ছে ওঁদের 'ৱ'। বুড়িগোহানী মানে দেবী দুর্গা। শুনেছি ঐ মন্দিরের দেবী খুবই জাগ্রতা। দুর্গাপূজার সময় মহাসমারোহে পূজা হয় সেখানে।

দুর্গাপূজা আসামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। বাংলার মতো দুর্গা-পূজা আসামে এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত। আর বাংলার মতোই সেটি শারদীয়া অকালবোধন।

ঠিক কবে আসামে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে বাংলা থেকে এই পূজা আসামে এসেছে এবং বাঙালীদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই উৎসব বাংলার সঙ্গে আসামের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

এ যোগাযোগের প্রথম সূত্রপাত হয় আহোম রাজা রুদ্র সিংহের আমলে অর্থাৎ ১৬৯৬ থেকে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে। ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহারাজা রুদ্র সিংহ-কে 'পূর্ব-ভারতের শিবাজী' বলে অভিনন্দিত করেছেন।

রুদ্র সিংহ আসামের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিশেষ করে বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি কয়েকজন বাঙালী স্থপতিকে এনে আসামে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করান। তাঁদের মধ্যে ঘনশ্যামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘনশ্যাম জয়সাগরের তীরে যে শিবমন্দির তৈরি করেন, তা আজও আসামের একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির।

কৃষ্ণনারায়ণ ভট্টাচার্য নামে জনৈক শাক্ত শাস্ত্রজ্ঞকে রুদ্র সিংহ নদীয়ার শান্তিপুর থেকে রংপুরে (শিবসাগর) নিয়ে আসেন। তিনিই আসামে দুর্গাপূজার প্রকৃত প্রবর্তক।

প্রথমে অবশ্য রুদ্র সিংহ দুর্গাপূজা প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। কারণ

তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। তার মানে তখনও আহোম রাজবংশে এবং আসামের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে শ্রীশঙ্করদেবের (১৪৪৯-১৫৬৯ খ্রীঃ) প্রচুর প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

মতের মিল না হলেও রুদ্র সিংহ কিন্তু কৃষ্ণনারায়ণের প্রতি কোনো রকম অসম্মান প্রদর্শন করলেন না। বরং তিনি তাঁকে অনেক সোনা ও রূপা উপঢৌকন দিয়ে সসম্মানে শান্তিপুরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণনারায়ণ চলে যাবার কয়েকদিন পরেই সহসা সমগ্র আসাম এক প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। আহোম রাজ্যের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হল। শাক্ত ব্রাহ্মণগণ সদলবলে সাক্ষাৎ করলেন রুদ্র সিংহের সঙ্গে। তাঁরা মহারাজাকে বললেন—কৃষ্ণনারায়ণকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই দেবী দুর্গা ক্রুদ্ধা হয়েছেন। যদি রাজ্য রক্ষা করতে চান, অবিলম্বে ফিরিয়ে আনুন, সেই পুণ্যবাণ শাক্ত শাস্ত্রজ্ঞকে। তাঁকে এরাজ্যে দুর্গা-পূজা প্রবর্তনের অনুমতি দিন।

তা-ই করলেন মহারাজা রুদ্র সিংহ। কৃষ্ণনারায়ণ ফিরে এলেন আসামে। শুরু হল দুর্গাপূজা। তবে রুদ্র সিংহ নিজে শাক্তমত গ্রহণ করলেন না। করলেন তাঁর পুত্ররা—শিব সিংহ. প্রমথ সিংহ এবং রাজেন্দ্র সিংহ। রুদ্র সিংহ পরলোক গমনের পরে শিব সিংহ (১৭১৪-১৭৪৪ খ্রীঃ) আহোম রাজ্যের রাজা হন। তিনিই শিবসাগর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

আমি আগামীকাল সেই নগরী দর্শন করব।

মহারাজা শিব সিংহের রাজত্বকালেই দুর্গাপূজা আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসবে পর্যবসিত হয়। কারণ শিব সিংহের প্রিয়তমা মহিষী ফুলেশ্বরী দুর্গাভক্ত ছিলেন।

ফুলেশ্বরী ছিলেন ছোটঘরের মেয়ে কিন্তু অপরূপা সুন্দরী এবং অসাধারণ বুদ্ধিমতী। রংপুরের একটি মন্দিরে তিনি দেবদাসীর কাজ করতেন। একদিন শিব সিংহ এলেন সেই মন্দিরে। তিনি 'যৌবনমদে মত্তা' রূপবতী নর্তকীর নাচ দেখলেন, গান শুনলেন। রাজরক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রকাশ্য মন্দিরে রাজা দেবদাসীর পাণিপীড়ন করে প্রণয় নিবেদন কর-

লেন। ফুলেশ্বরী রাজাকে তাঁর কুটিরে নিয়ে গেলেন। দেবদাসীর সেই পর্ণকুটিরে মহারাজা মধুচন্দ্রিমা যাপন করলেন।

কোনোকালে কোনোদেশে কোনো রাজার পক্ষেই পরনারীর সঙ্গে রাত্রিবাস কোনো অপরাধের নয়। কারণ রাজারা সবাই বীর এবং বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা।

সুতরাং শিব সিংহের সঙ্গীরা এজন্য কিছুই মনে করেন নি। কিন্তু গোল-মাল বাধল পরদিন সকালে, রাজা যখন বলে বসলেন –আমি ফুলে-শ্বরীকে বিয়ে করব। তাঁকে রানীর মর্যাদায় রাজপ্রাসাদে নিয়ে চলো। দেবদাসীকে শয্যাসঙ্গিনী করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁকে রানীর মর্যাদা দেওয়া!

শিব সিংহ কিন্তু পাত্র-মিত্র সভাসদ ও পরিবার পরিজনের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ফুলেশ্বরীকে নিয়ে এলেন প্রাসাদে। রাজা তাঁকে রানীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আগেই বলেছি ফুলেশ্বরী শুধু সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। সুতরাং রূপসী নর্তকী কিছুদিনের মধ্যেই রূপমুগ্ধ রাজাকে বশীভূত করে ফেললেন। শিব সিংহ ফুলেশ্বরীর ক্রীড়নকে পরিণত হলেন। অবশেষে রাজা ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ফুলেশ্বরীর হাতেই রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দিলেন।

ক্ষমতা হাতে নিয়েই ফুলেশ্বরী মহাসমারোহে বৈষ্ণব রাজপ্রাসাদে দুর্গাপূজার আয়োজন করলেন। রাজ্যের সর্বত্র দুর্গোৎসব পালনের নির্দেশ দেওয়া হল। চারিদিকে ঢালাও নিমন্ত্রণ গেল। বৈষ্ণবদের বিশেষ করে পূজামণ্ডপে আসতে বলা হল। ভক্ত-বৈষ্ণবরা প্রথমে শক্তিপূজায় যোগ দিতে সম্মত হলেন না। রানীর পাইক ও বরকন্দাজের দল তাঁদের জোর করে ধরে নিয়ে এলেন। বলিদানের পরে তাঁদের গায়ে পাঁঠা এবং মোষের রক্ত মাখিয়ে দেওয়া হল।

এইভাবে দুর্গাপূজা আহোম রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আর তারই ফলে কিছুদিনের মধ্যে এই পূজা আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

তবে সে দুর্গাপূজার সঙ্গে বর্তমানের জনপ্রিয় রূপের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং সেকালে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে একটা হিংস্র ধর্মান্ধতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীহেম বরুয়া এ-সম্পর্কে লিখেছেন—

'The History of Durga Puja here is a history of blood and torture. It was nurtured into the present shape and order by the Bengalis who accompanied the British administrators to this country. The Britishers initiated Christmas in India to keep up their home traditions ;···Bengalis who came here did the Durga Puja likewise ;'

"আমরা এসে গিয়েছি, এই যে বাঁদিকে মন্দির-তোরণ।"

ডাক্তারবাবুর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। বাঁদিকে তাকাই। তোরণ বলতে যেমনটি বোঝায়, ঠিক তেমনটি নয়। বাড়ি-ঘরের মাঝে এক চিলতে ফাঁকা। তারপরেই খানিকটা খোলা জায়গা—মন্দির চত্বর। চত্বরের মাঝে একটি অশ্বত্থ গাছ। তারই তলায় মন্দির—ছোট মন্দির। একটি নয়, তিনটি।

রবীনবাবু বললেন, "মাঝখানে বুড়িগোহানী দেবালয়। ডানদিকে কালী ও জগদ্ধাত্রী মন্দির আর বাঁদিকে শিবমন্দির।"

আমরা দর্শন করি। তারপরে মূল-মন্দিরে আসি। প্রথমে ক্ষুদ্র নাট-মন্দির, তারপরে ক্ষুদ্রতর গর্ভ-মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে যাওয়া বেদির ওপরে সিংহাসন। ভেতরে সোনার প্রতিমা। আকারে ছোট হলেও ভারী সুন্দর মূর্তি। আমি প্রণাম করি।

মন্দিরের পেছনেই সেবাইতদের বাড়ি। ওঁরা সেই বাড়িতে নিয়ে এলেন আমাকে। পরিচয় করিয়ে দিলেন।

গৃহকর্তা বললেন "খুব খুশি হলাম। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।"

বিস্মিত হই। আমার কাছে তাঁর কি অনুরোধ থাকতে পারে? তাহলেও বলি, "বেশ, বলুন।"

"এসেছেন যখন, এক কাপ চা না খেয়ে যেতে পারবেন না। আপনার বেশি সময় নষ্ট করব না।"

সুতরাং সম্মত হই। মনে পড়ছে সেদিনের কথা। সেদিন প্রগতিদের বাড়িতে ঠিক এই একই আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি। অসমীয়াদের আতিথেয়তায় আমি অভিভূত।

ডাক্তারবাবু গৃহকর্তাকে বলেন, "চা বানাবার মধ্যে আপনি মহারাজকে একটু বুড়িগোহানীর ইতিহাসটুকু বলে দিন না।"

প্রৌঢ় সেবাইত সানন্দে শুরু করেন, "স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের রাজত্বকালে আহমদের সঙ্গে জয়ন্তীয়াদের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। পূর্ববর্তী চুক্তি অনু-যায়ী জয়ন্তীয়া রাজা স্বর্গদেবের অধীন ছিল। কিন্তু ১৭০৮ সালে জয়ন্তীয়া রাজা রাম সিংহ কাছাড়ের রাজা তাম্রধ্বজকে যুদ্ধে হারিয়ে নিজেকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করতে থাকেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। রুদ্র সিংহ তখন বরবরুয়া এবং বরফুকণকে দু দিক থেকে জয়ন্তীয়া রাজ্য আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা রাম সিংহকে বন্দী করে বিশ্বনাথে অর্থাৎ তেজপুরে নিয়ে এলেন। রাম সিং আহোমরাজার অধীনতা স্বীকার করলেন। রুদ্র সিংহ তাকে ক্ষমা করে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

"জয়ন্তীয়া বিদ্রোহ দমনের পরে আহোম সেনাপতিরা সেখান থেকে রাজার জন্য বহু উপঢৌকন সংগ্রহ করেন। তারই মধ্যে ছিল বুড়ি-গোহানীর যোনি এবং মূর্তি। জয়ন্তীয়ারা শাক্ত। তাঁদের ইষ্টদেবী গোহানী নাকি ছিলেন খুবই জাগ্রতা।

"ফেরার পথে সহসা আহোম সৈন্যদের মধ্যে আমাশয় ও অন্যান্য রোগ দেখা দিল। আর তারপরেই আহোম সেনাপতি স্বপ্ন দেখলেন জয়ন্তে-শ্বরী গোহানী তাঁকে বলছেন—আমি এদেশ ছেড়ে যাবো না। ইচ্ছে হলে তোমরা বুড়ি নদীর তীরে যে গোহানী মূর্তি ও যোনি আছে, তা

নিয়ে যেতে পারো।

"আহোম সেনাপতি জয়ন্তেশ্বরীকে স্বস্থানে রেখে বুড়িনদীর তীর থেকে গোহানী মূর্তি ও যোনি এনে রুদ্র সিংহকে উপহার দিলেন। আপনারা একটু আগে সেই মূর্তি দর্শন করেছেন। বুড়ি নদীর তীর থেকে আনা হয়েছে বলে দেবীর নাম বুড়িগোহানী। ইনি মহিষমর্দিনী দুর্গা। এখানে তাঁর দৈনিক পূজা হয়।" থামলেন সেবাইত।

তাঁর ছেলে ঘরে আসেন। বলেন, "চা হয়ে গেছে, ভেতরে চলুন।"

আমরা খাবার ঘরে এসে বসি। বাড়ির মেয়েরাই চা ও বিহুর পিঠে পরিবেশন করেন। সেবাইত তাঁদের সঙ্গেও আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। খুবই শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত পরিবার।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে আমি আবার গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, এখানে কি এই মন্দির তখুনি প্রতিষ্ঠিত হয়?"

"না। তখনও তো এখানে রাজধানী উঠে আসে নি। যতদূর জানা যায়, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বর্মী আক্রমণের জন্য আহোম রাজারা বুড়ি-গোহানীর স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করতে পারেন নি। বর্মী আক্রমণের সময় বুড়িগোহানীর সম্পত্তি ও সেবাইতদের তালিকার তাম্রফলকটি পর্যন্ত হারিয়ে যায়। ফলে বৃটিশরা এই মন্দিরকে কোনো সরকারী সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। রায়বাহাদুর রাধাকান্ত সন্দিকৈ সর-কারকে অনেক লেখালেখি করে এই জায়গাটুকু সংগ্রহ করেছেন। এর জন্য কোনো খাজনা দিতে হয় না। মহারাজ পুরন্দর সিংহ (১৮১৮-১৯ এবং ১৮৩২-৩৮ খ্রীঃ) প্রথমে এখানে একটি খড়ের ঘর তৈরি করে দেন। সেই থেকেই নিয়মিত পুজো হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে জন-সাধারণের সাহায্যে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।"

১১

ফেরার পথে ডাক্তারবাবু বাড়ি চলে গেলেন। পাছে আমার পথ ভুল হয়, তাই রবীনবাবু আবার আমার সঙ্গে হোটেলে এলেন।

হোটেলে এসে দেখি গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুনীলবাবুরা বিমানবন্দরে রওনা হচ্ছেন। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। আর কয়েক মিনিট দেরি হলেই ওঁদের সঙ্গে দেখা হত না। দক্ষিণাদা, সুবোধবাবু, বরুণবাবু, পল্টন ও সুনন্দারা—সবাই ওঁদের বিদায় জানাতে এসেছেন। রতনবাবু আর নিখিলবাবু তো রয়েছেনই। দেখা না হলে বড়ই আফসোস থেকে যেতো।

ঘোষবাবুকে আমার ও দক্ষিণাদার ফোন নম্বর দিয়ে দিলাম। ওঁরা বেলা দেড়টা নাগাদ দমদম পৌঁছে যাবেন। ফোনে বাড়িতে আমাদের কুশল সংবাদ দিয়ে দেবেন।

বিকেল চারটেয় আমাকে তৈরি থাকতে বলে রতনবাবু গাড়ি স্টার্ট করলেন। আমরা দু-পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আবার বিদায় জানাই ওঁদের – সেদিন যাঁদের সঙ্গে আসামে এসেছিলাম। আজ তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন ঘরে আর আমি থেকে যাচ্ছি অমরাবতী—আসামে। কিন্তু আমাকেও তো কাল বিদায় নিতে হবে, যেমন করে ওঁরা আজ বিদায় নিলেন। না, এখন ভাবব না সেকথা। ভবিষ্যতের ভাবনায় অস্থির না হয়ে পড়লে যে বর্তমানের প্রতি অবিচার করা হয়। আমি বর্তমানের মাঝে মিশে থাকতে চাই।

পল্টন তার গাড়িতে দক্ষিণাদাকে রতনবাবুর বাড়ি নিয়ে চলল। দক্ষিণাদা আবার মনে করে দিলেন, "বিকেল চারটেয় আসছি, 'রেডি' হয়ে থেকো।"

মাথা নাড়ি। পল্টনের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়।

যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁদের নিয়ে উঠে আসি ওপরে। সুনীলবাবুদের ঘর-গুলোর দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই। পাশাপাশি চারখানি ঘরে চারজন ছিলাম। তিনজন চলে গেলেন। কি জানি আজ রাতে হয়তো আমাকে এ অংশে একাই থাকতে হবে।

সুবোধবাবু আশ্বাস দেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন। এটা পান্থশালা, নতুন পথিক এলেন বলে।"

রবীনবাবু চা-য়ের অর্ডার দিয়ে এলেন। সবাই বেশ জাঁকিয়ে বসেছি। বলি "আজ আপনারাও সম্মেলনের ভারমুক্ত, আমিও আর বিশেষ অতিথি নই। অতএব আসুন, খানিকক্ষণ নির্ভেজাল আড্ডা দেওয়া যাক্, বিশেষ করে সুবোধবাবুকে যখন পাওয়া গিয়েছে।"

"তা যা বলেছেন।" বড়-সুনন্দা বলে, "সুবোধদা আজ বোধহয় মাস খানেক পরে এমন অখণ্ড-অবসর পেলেন।"

"আর বলো না।" সুবোধবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, "আজ কি মনে হচ্ছে জানো ?',

"কী ?" ছোট-সুনন্দা প্রশ্ন করে।

"আজ মনে হচ্ছে," সুবোধবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, "এই সাহিত্য সম্মেলনে আপনাদের সান্নিধ্য লাভ আমার এক পরম প্রাপ্তি। অথচ নানা তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত থাকায়, প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আপনাদের সঙ্গে কথা বলার অবসর পেলাম না। এ ক্ষোভ সহজে যাবে না।"

একবার থামেন সুবোধবাবু। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার শুরু করেন, "সেদিন এয়ারপোর্টে কয়েক মিনিট আলাপ করেই আপনার ব্যক্তিগত জীবন-দর্শনের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে মুগ্ধ হয়েছি। আর দ্বিধাহীন চিত্তে এই কথাটি বলার জন্যই আজ আমি এখানে এসেছি। "

হায় হরি। কোথায় নির্ভেজাল আড্ডা মারব বলে ঠিক হয়ে বসেছি.

আর ভদ্রলোক কিনা এমন একটা 'সীরিয়স্' বিষয়ের অবতারণা করে বসলেন! কিন্তু বিষয়টাকে আর এগোতে দেওয়া উচিত হবে না। যে-ভাবেই হোক্, সুবোধবাবুকে থামাতে হবে।

কিছুই করতে হল না, স্বয়ং মা-বুড়িগোহানী আমার সহায় হলেন। সুবোধবাবুকে নিজের থেকেই থামতে হল। বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। সুনন্দাদের বলি, "চা পরিবেশন কর।"

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ডাক দিই, "সুবোধদা!"

আমার নতুন সম্বোধনে বিস্মিত সম্পাদক বলে ওঠেন, "আজ্ঞে…"

"না, আজ্ঞে নয়।" গম্ভীরস্বরে বলি, "কোনোকালে কোনো দাদা তাঁর ছোট ভাইকে আজ্ঞে বলেন নি।"

ভদ্রলোকের বিস্ময় কাটে না। কিন্তু আমি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিই, "আচ্ছা, সুবোধদা, আপনি তো শুনেছি দীর্ঘকাল রাজনীতি করেছেন?"

তিনি কোনো মতে উত্তর দেন, "যৎসামান্য।"

"না, না।" রবীনবাবু প্রতিবাদ করেন, "উনি কলেজ ছেড়েই অভয়াশ্রমে যোগদান করেছিলেন। বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য করেছেন। এমনকি আমাদের বৌদিও রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন।"

"তাহলে আপনি এমন সেন্টিমেন্টাল হলেন কেমন করে?" রবীনবাবু থামতেই সুবোধদাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করি।

অপ্রস্তুত সুবোধদা চট করে কোনো জবাব দিতে পারেন না। এই সুযোগে নতুন ফরমাশ করে ফেলি। "যাক্ গে, আমার প্রশস্তি গেয়ে সময় নষ্ট না করে, জোড়হাটের কথা বলুন।'

"জোড়হাটের কথা!"

"হ্যাঁ। জোড়হাট নামের ইতিহাস বলুন।"

বাধ্য হয়ে আরম্ভ করেন তিনি, "আপনি জানেন যে জোড়হাটের আগে আহোম রাজাদের রাজধানী ছিল রংপুর অর্থাৎ শিবসাগরে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা স্বর্গদেব গৌরীনাথ সিংহ (১৭৮০-১৭৯৪ খ্রীঃ) জোড়হাটে

চলে আসেন।…”

“আচ্ছা, আহোম রাজারা নিজেদের স্বর্গদেব বলতেন কেন ?” রবীনবাবু মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে বসলেন।

সুবোধদা উত্তর দেন, “আহোম রাজারা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের আদি-পুরুষ সোজা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন।” একবার থেমে তিনি আবার বলতে থাকেন, “জোড়হাট জায়গাটা গৌরীনাথের খুবই পছন্দ হয়। কিন্তু সরকারী ভাবে রাজধানী ঘোষণা করতে পারার আগেই তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র কমলেশ্বর (১৭৯৫-১৮১০ খ্রীঃ) আসামের রাজা হন। তিনি ১৭৯৫ সালেই জোড়হাটকে আহোম রাজ্যের রাজধানী রূপে ঘোষণা করেন। তখন সম্ভবত জোড়হাটের নাম ছিল ন-বাহর।

“বৃটিশ আমলে বর্তমান বর-আলির ধারে দুটি কোঠা বা সেনানিবাস তৈরি হয়। সেখানে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধশিক্ষা দেওয়া হত। দুটি কোঠা বা ছাউনিতে দু পল্টন সৈন্য বাস করতেন।

“কিছুদিনের মধ্যেই ন'-বাহারের নাম হল ‘যোর-কোঠ’ অর্থাৎ দুই-ছাউনি। স্বাভাবিক ভাবেই দুই ছাউনিতে দুটি হাট বসতে শুরু করল। নাম হল—চকী হাট ও মাছের হাট। কালক্রমে হাট দুটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সবাই দুটি হাটকে একসঙ্গে বোঝাবার জন্য জায়গাটাকে যোরহাট (জোড়হাট) বলতে থাকল। সেই নামেই ন'-বাহার আজ সর্বত্র পরিচিত।”

শেষ করলেন সুবোধদা আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে আনন্দ—আনন্দ মণ্ডল, এ্যালক্যালি এ্যাণ্ড কেমিক্যালের রিপ্রেজেণ্টেটিভ। আঠাশ বছরের উৎসাহী ও সুপুরুষ যুবা। গত কয়েকদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে সম্মেলনের জন্য। আজ সে পাট চুকেছে। তাই এসেছে আড্ডা দিতে। না, একা আসে নি। আনন্দ তেমন ছেলে নয়। সদ্য বিবাহিত আনন্দ তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই এসেছে।

আনন্দর স্ত্রীভাগ্য ভালোই বলতে হবে। ভারতী শুধু সুশ্রী নয়, শিক্ষিতা

এবং বুদ্ধিমতীও বটে।
ওদের বসতে বলে চা-য়ের ফরমাশ করবার জন্য উঠে দাঁড়াই। ভারতী বাধা দেয়। বলে, "আমরা সকাল থেকে দু-বার চা খেয়েছি দাদা! এখন আর চা খাবো না।"
"আনন্দরও কি একই মত?" জিজ্ঞেস করি।
আনন্দ ভারতীর দিকে তাকায়। ভারতী আমাকে বলে, "ওকে বেশি চা খেতে বলবেন না দাদা! পেলেই খাবে, আর খেয়েই আমাকে ভোগাবে।"
"সুতরাং আনন্দও চা খাবে না।"
"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ভারতী বলে। একটু থেমে সে আবার বলে, "আমি কিন্তু আপনাকে চা-য়ের নেমন্তন্ন করতেই এসেছি।"
"কখন?" রবীনবাবু মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করেন।
ভারতী উত্তর দেয়, 'বিকেলে।"
"কিন্তু আমিও যে ঐকথা বলার জন্য সেই সকাল থেকে বসে আছি।" রবীনবাবু একটু থেমে আমার দিকে ফিরে বলেন, "আমার স্ত্রী কিন্তু বার বার বলে দিয়েছে, আপনাকে আজ বিকেলে একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।"
ভারতী বোধহয় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রবীনবাবু আগে এসেছেন সুতরাং আমাকে চা খাওয়াবার তাঁরই অগ্রাধিকার। তাই সে অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়।
একটু হেসে বলি, "ছোট বোন, দাদাকে চা খাওয়াবে, এতে আবার মতামত নেবার কি আছে। যাবো, অবশ্যই যাবো আপনার বাড়িতে। কখন যেতে হবে বলুন?"
"উঁহু, বলুন নয়, বল। ভারতী এবারে দুষ্টু মেয়ের মতো বলে ওঠে, "ছোট বোনকে কেউ কোনোকালে 'বলুন' বলে না।"
"বেশ, বল কখন যেতে হবে?" আমি সানন্দে ওর দাবি মেনে নিই।
এতক্ষণে আনন্দ কথা বলে, "আপনার যখন ইচ্ছে।"

এবারে সুবোধদা আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। বলেন, "আমি মহারাজের প্রোগ্রাম ঠিক করে দিচ্ছি—জোড়হাট ও নেঘেরীটিঙ দেখিয়ে রতনবাবু বিকেল সাড়ে ছটা নাগাদ আপনাকে আনন্দর বাড়িতে নামিয়ে দেবেন। আমি সাতটার সময় আনন্দর বাড়ি থেকে আপনাকে ক্লাবে নিয়ে আসব। রবীনবাবু ক্লাব থেকে আপনাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যাবেন, তারপরে পৌঁছে দেবেন রতনবাবুর বাড়িতে। সেখানেই আপনার রাতের খাওয়া।"

"আপনি আমার বাড়িতে কখন আসছেন?" সুবোধদা থামতেই ভারতী জিজ্ঞেস করে।

সুবোধদা উত্তর দেন, "সাতটা।"

"না। আপনিও সাড়ে ছটায় আসুন।"

"তুমি কি মহারাজের সঙ্গে আমাকেও চা-য়ের নেমন্তন্ন করছ?"

সুবোধদার প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই হেসে ফেলি। হাসি থামলে ভারতী উত্তর দেয়, "হ্যাঁ"

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তুমি নতুন জোড়হাটে এসেছো, তাই তোমার বোধহয় জানা নেই যে সুবোধ ভৌমিক কখনও নেমন্তন্ন 'মিস্' করে না।"

আবার হাস্যরোল।

আনন্দ ও ভারতীর সঙ্গে সুবোধদা ও রবীনবাবু বিদায় নিলেন, রইল শুধু সুনন্দারা। ওরা দুজন এতক্ষণ প্রায় চুপ করেই ছিল। এবারে কথা বলে ছোট-সুনন্দা, "আপনার ভাগ্য ভালো, আমাদের এখানে বাড়ি নেই, আমরা হস্টেলে থাকি।"

"বাড়িতে থাকলে তোমরাও আমাকে চা-য়ের নেমন্ত্রন্ন করতে, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"যেতাম।"

"তা বেশ তো হস্টেলেই আসুন না। মেয়েরা খুব খুশি হবে।" বড়

সুনন্দা বলে ওঠে।

ব্যাস্। নিজের জালেই নিজেই জড়িয়ে পড়লাম। অগত্যা আত্মসমর্পণ করতে হয়। সবিনয়ে বলি, "আজ আর পেরে উঠব না ভাই! পরের বার এসে নিশ্চয়ই তোমাদের হস্টেলে যাবো।"

সুনন্দারা বুঝতে পারে, এটা নেহাতই আমার কথার কথা। তাহলেও আর পেড়াপীড়ি করে না। বড়-সুনন্দা হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একখানি বই বের করে। সবিস্ময়ে দেখি, আমার লেখা 'উত্তরস্যাং দিশি।'

এই রে সেরেছে! এবারে নিশ্চয়ই মানসীর কথা জিজ্ঞেস করবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, লেখকের চেয়ে তার নায়িকা সম্পর্কে পাঠিকাদের কৌতূহল বেশি। তারা মাঝে মাঝেই আমার কাছে তাদের 'মানসীদির' ঠিকানা চেয়ে পাঠায়। বই লেখা সত্যই একটা বিপজ্জনক নেশা।

না, সুনন্দা আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য বই বের করে নি। বইখানি আমার হাতে দিয়ে সে বলে, "একটা সই করে দিন।"

হাঁপ ছেড়ে বলি, "সেকি! পয়সা দিয়ে বই কিনে লেখকের সই করিয়ে নেবে?"

"হ্যাঁ।"

"শুধু সই?"

"না। কিছু লিখে দিন।"

আমি লিখি—সুনন্দা! হিমালয় অসীম অনন্ত এবং শাশ্বত সুন্দর। হিমালয়ের পথে পদচারণা করে তুমি বুঝতে পেরেছো, হিমালয়ের কথা আমি কিছুই লিখতে পারি নি। তবু তুমি আমার বই কিনেছো। সুতরাং তোমাকে জানাই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

বড়-সুনন্দা কালই আমাকে বলেছে, সে গতবছর কেদার-বদ্রী গিয়েছিল। বইখানি তার হাতে ফিরিয়ে দেবার পরেই ছোট-সুনন্দা জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি আজ বিকেলে নেঘেরীটিঙ শিবমন্দির দেখতে যাচ্ছেন?"

"তাই তো বলে গেলেন রতনবাবু।" উত্তর দিই।

"ভারী সুন্দর জায়গা, ছবির মতো।" বড়-সুনন্দা বলে, "গাড়িতে জায়গা হলে আমরাও যেতাম।"

"জায়গা করে নেবো, তোমরা বিকেলে চলে এসো।" আমি ওদের নেমন্তন্ন করি।

"সবাই যে হ্যাংলা ভাববে ?"

"কেন ?

"বলবে, সুযোগ পেয়ে সাহিত্যিকদের সঙ্গে ছায়ার মতো খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"বলুক্ গে। লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক।"

আমার কথা শুনে ওরা দুজনে সোচ্চার স্বরে হেসে ওঠে। হাসি থামলে ছোট-সুনন্দা বলে, "তাহলে আমরা আবার বিকেলে আসছি ?"

"নিশ্চয়ই।" আমি কিছু বলার আগেই বড়-সুনন্দা বলে ওঠে।

কয়েকটি তরুণ-তরুণীকে নিয়ে প্রমথ ঘরে ঢোকে।

হেসে বলি, "কি ব্যাপার, অটোগ্রাফ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" একটি ছেলে জবাব দেয়। কিন্তু মেয়েরা সবাই নীরব। ব্যাপারটা বিস্ময়কর !

সুনন্দারা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। বলে, "আমরা তাহলে চলি।"

"আচ্ছা।" বলি, "বিকেলে এসো।"

ওরা মাথা নেড়ে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সরব হয় মেয়েরা। একটি মেয়ে আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেলে, "বাঁচা গেল।"

হেসে জিজ্ঞেস করি, "তোমরা বোধহয় ওদের ছাত্রী।"

"আর বলেন কেন ?"

সত্যিই বলবার কিছু নেই। বয়-ফ্রেণ্ড্‌দের সঙ্গে অটোগ্রাফ নিতে এসে দিদিমণিদের সামনে পড়ে গেলে কোন্ মেয়ে না অপ্রস্তুত হয় ? অতএব সুনন্দারা তাড়াতাড়ি কেটে পড়ে ওদের বড়ই উপকার করে গিয়েছে।

অটোগ্রাফ নিয়ে ছেলে-মেয়েরা বিদায় নেবার পরে প্রমথ জিজ্ঞেস করে, "দাদা, আপনি কি কাল সকালে শিবসাগর যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। শিবসাগর দেখে ডিব্রুগড় যাবো।"

"গাড়িতে জায়গা হবে?"

"কেন হবে না। আমি আর দক্ষিণাদা শুধু রতনবাবুর গাড়িতে যাবো। নিখিলবাবু ডক্টর নীলমণি ফুকণের সঙ্গে অন্য গাড়িতে যাবেন।"

"তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।"

"কেন, তুমি শিবসাগর দেখো নি?"

"দেখেছি। তবে আপনার সঙ্গে আরেকবার দেখব।"

"অর্থাৎ তুমি কালও কোকরাঝাড় রওনা হচ্ছ না?"

প্রমথ একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কোনোমতে বলে, "না, মানে আপনারা রয়েছেন তো। তাই কালকের দিনটা থেকে গেলাম আর কি। কাল বিকেলে শিবসাগর থেকে এখানে ফিরে আসব। পরশুদিন সকালে সোজা কোকরাঝাড় রওনা হব।"

আমরা এখানে রয়েছি বলে প্রমথ বাড়ি যেতে পারছে না। অথচ আমরা তাকে থাকতে বলি নি। সে চাকরিজীবী নয় যে শুধু ছুটি নষ্ট হচ্ছে। প্রমথ এ্যাডভোকেট। এই থাকার জন্য তার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তবু সে চলে যাচ্ছে না। লেখকদের প্রতি কি বিস্ময়কর ভালোবাসা এদের, কি অপরিসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা! কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে।

খেয়ে নিয়েই শুয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম একটু ঘুমিয়ে নেব। কিন্তু ঘুম নেই আমার চোখে। থাকবে কেমন করে? আজ চারদিন হল আমি আসামে এসেছি। চারদিন তো নয়, চারযুগ। অসংখ্য মানুষের অসামান্য ভালোবাসা কুড়িয়েছি এই চারদিন ধরে। তাঁদের কথা ও কাহিনী আমার নিদ্রা হরণ করেছে।

মাঝে মাঝে এঁদের ভালোবাসার আতিশয্যে ক্লান্ত বোধ না করেছি,

এমন নয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে, এর তুলনা নেই। এমন উপরি পাওনা সবার অদৃষ্টে জোটে না।. আমি সৌভাগ্যবান।

ব্রজপরিক্রমা এবং রাজস্থান ও গুজরাত ভ্রমণের সময় লেখার প্রয়োজনে সহযাত্রীদের কাছে আত্মগোপন করে থেকেছি। আর এবারে স্বপরিচয়ে আসামে এসেছি। শুধু তাই নয় পাঠক-পাঠিকাদের মাঝে অবস্থান করছি। আসার আগে ভয় ছিল—কি জানি কি অবস্থায় পড়তে হবে ? কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, আমি সৌভাগ্যবান আর এই সৌভাগ্যের কথা জানার জন্যই আমার আসামে আসার প্রয়োজন ছিল।

জানি, এমন অকৃত্রিম আন্তরিক ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা আমার নেই। জানি, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও কাজী নজরুলের বাংলা সাহিত্যে আমি লেখক না হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।

কথাটা আমার পাঠক-পাঠিকারাও জানেন। তবু তাঁরা আমাকে ভালোবাসেন। আর এই ভালোবাসা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। এবং আজ মনে হচ্ছে আমার চেয়ে ঐশ্বর্যবান মানুষ খুব বেশি নেই এ-জগতে।

ভাবনা থেমে যায়। কেউ কড়া নাড়ছে। আমি ভুলে গেলেও এরা ভুলে যায় নি। প্রগতির বোন লিবি এবং তার সেই বান্ধবীটি ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছে। গতকাল আমি ওদের অটোগ্রাফ দিতে পারি নি, আজ আসতে বলেছিলাম।

ওরা ঘরে এসে বসে। প্রথমেই লিবি কথা বলে, "শঙ্কুদা, আমি বেঙ্গলী ভাষা বলতে জানি না। আমার কথার মধ্যে কত ভুল থাকবে। তার বাবে আগেই ক্ষমা চাইলাম।"

হেসে বলি, "আমিও তো অসমীয়া জানি না। তোমরাও আমাকে ক্ষমা করো ভাই।"

কেউই কারও ভাষা ঠিকমতো বলতে পারি না, অথচ আমরা চুপ করে বসে নেই। সমানে কথা বলে চলেছি। বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না।

মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষা। কিন্তু ভাষা না জানলেও অন্ত-রের কথা অব্যক্ত থাকে না।
হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে লিবির। সে জিজ্ঞেস করে বসে, "আপুনি আজ আমার বাড়ি যাব না শম্ভুদা ?"
গতকাল জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বসেই সে বলেছিল কথাটা। উত্তর দিয়েছিলাম—সে তখন দেখা যাবে। আজ এখন কি বলি ওকে ?
না, লিবি অবুঝ নয়। বুঝিয়ে বলার পরে সে আর জোরজুলুম করে না। বরং বলে, "আপুনি আবার আসামে আসব বলে জেনে খুব আনন্দ লেগেছে। মিলুদিদি যখন জোড়হাট থাকব, তখন আসব। আপুনি আমার ঘর সাতদিন থাকব। আপোনাক সঙ্গে লৈ আমি খুব বেড়াব করব।"
এইভাবে আমরা বেশ কিছুক্ষণ অসমীয়া ও বাংলার মিলিত ভাষায় কথাবার্তা বলার পরে সুনন্দারা এসে হাজির হল। ওরা তো আমাদের কাণ্ড দেখে হেসেই খুন। হাসতে হাসতে বড়-সুনন্দা বলে, "বাংলা ও অসমীয়া ভাষা বিরোধ যে কত অর্থহীন, আজ আপনি তা প্রমাণ করে দিলেন।"
লিবিরা মাথা নেড়ে তার বক্তব্য সমর্থন করে। কিন্তু অসমীয়া জানা বাংলার অধ্যাপিকাদের সামনে ওরা আর নির্ভয়ে বাংলা বলতে পারছে না। ওরা অসমীয়াতেই কথা বলা শুরু করল আর সুনন্দারা দোভাষীর কাজ করতে থাকল।
কিছুক্ষণ বাদে একটি অসমীয়া তরুণ ঘরে ঢোক। সে আমারই খোঁজে এসেছে। এবং আমাকে চিনে নিতে তার কোনো অসুবিধে হয় না, কারণ ঘরে আমিই একমাত্র পুরুষ সদস্য।
ছেলেটি দু-হাত জড়ো করে আমাকে ও মেয়েদের নমস্কার করে। আমি তাকে বসতে বলি। তার পরিচয় জানতে চাই।
সে বলে, "আমার নাম মহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। মাজুলিতে আমার ঘর। আমি আপনার 'মধু-বৃন্দাবনে' ও 'তমসার তীরে তীরে' পড়েছি।

আজই সকালে 'দৈনিক জনমভূমি' কাগজে আপনাদের এখানে আসার খবর জানতে পারলাম। ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। আমার ভাগ্য ভালো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।" তার চোখে-মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

আনন্দিত আমিও। একটি অসমীয়া মুসলমান যুবক বাংলা 'মধু-বৃন্দাবনে' বই পড়ে, মাজুলি থেকে জোড়হাট ছুটে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এর পরেও কেউ যদি বলে, ভারতে ধর্ম ও ভাষা বিরোধ রয়েছে, তাহলে তাকে কি মূর্খের স্বর্গে বাস করতে বলা উচিত হবে না?

জাহাঙ্গীরের কথা শুনে আরেকটি কথা মনে পড়ে আমার। 'দৈনিক জনমভূমি' জোড়হাট থেকে প্রকাশিত অসমীয়া সংবাদপত্র। শুধু জনম-ভূমি নয়, আসামের প্রায় প্রত্যেক অসমীয়া এবং ইংরেজী কাগজে আমা-দের সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কল-কাতার বাংলা কাগজগুলি এই বাংলা সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। অথচ সর্বাধিক প্রচারিত দুটি বাংলা সংবাদপত্রের প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক ও বর্তমান সহকারী সম্পাদক এই সম্মেলনের সভাপতি ও প্রধান অতিথি। জাতীয় সংহতি ও সাহিত্যসেবার কথা না হয় বাদই দিলাম, ব্যবসার কারণেও তাঁদের এই নীরবতা বিস্ময়কর। কারণ আসামবাসী বাঙালীরা সবাই তাঁদের সংবাদপত্রের খদ্দের।

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আলাপ করে খুশি হই। সে চাষীর ছেলে। চাষের কাজ সবই জানে এবং নিয়মিত ক্ষেতে-খামারে কাজ করে। কিন্তু সে মূর্খ নয়, গতবছর বি. এ. পাশ করেছে। ইচ্ছে আছে অসমীয়াতে এম. এ. পরীক্ষা দেবার। মুশকিল হয়েছে, বই-পত্র যোগাড় করতে পারছে না। গৌহাটি না গেলে বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অথচ বাপ বুড়ো হয়েছে, সে বড় ছেলে—সংসার ফেলে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

মুখে বলি, "ক্ষেতের কাজ যখন কম থাকবে, তখন গিয়ে-গিয়ে কিছুদিন করে গৌহাটি থেকে আসবে।"

মনে মনে বলি—জাহাঙ্গীর! তোমার মতো ছেলে যে দেশে জন্মায়, সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা কখনই নিরাশ হয়ে পড়ব না?
জাহাঙ্গীর কিন্তু অটোগ্রাফ নিতে আসে নি! সে শুধুই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। হয়তো তার অটোগ্রাফ নেবার বাতিকও নেই। কিন্তু লিবিদের হাতে অটোগ্রাফের খাতা দেখে, সে-ও প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, "আপনার কাছে কাগজ আছে?"
হেসে বলি, "লেখকের কাছে কাগজ থাকবে না তো কি ঢাল-তরোয়াল থাকবে?"
লজ্জা পায় জাহাঙ্গীর। মাথা নিচু করে কোনোমতে বলে, "না, মানে আমি নিয়ে আসি নি কিনা।"
"কাগজ দিয়ে কি করবে?"
"আপনার একটা সই নেব।"
"কি করবে?"
"রেখে দেব।"
মাজুলির অসমীয়া মুসলমান যুবক কলকাতার বিগতযৌবন হিন্দু বাঙালী লেখকের স্বাক্ষর স্মৃতিচিহ্ন রূপে রেখে দেবে নিজের কাছে। হয়তো বা সযত্নে সঞ্চয় করবে—শুধু আমার স্বাক্ষর নয়, সেই সঙ্গে আজকের এই মধুর স্মৃতি। আমার মনেও এই বৈশাখী বিকেলের স্মৃতি বহুকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আজ জাহাঙ্গীর যে জানিয়ে দিয়ে গেল —আমরা হিন্দু নয় মুসলমান নয়, আমরা অসমীয়া নই বাঙালী নই, আমরা ভারতীয়। 'আমি আটায়ে ভারতীয়।'

১২

রতনবাবু সাহেব মানুষ। বিকেল ঠিক চারটায় তাঁর গাড়ি এসে হোটেলের সামনে দাঁড়ালো। সবাইকে নিয়েই নেমে এলাম নিচে। জাহাঙ্গীর ও লিবিদের কাছ থেকে বিদায় নিই। সুনন্দাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠি। দক্ষিণাদা সামনে রতনবাবুর পাশে বসেছেন। আমরা তিনজন পেছনে। গাড়ি এগিয়ে চলে।

প্রথমে এলাম হাতিগড়ের শিব-দ'লে। অসমীয়া ভাষায় দ'ল মানে মন্দির। আমরা জোড়হাট শহর থেকে পাঁচ মাইল পুবে এসেছি। আহোমরাজ স্বর্গদেব গৌরীনাথ সিংহের আদেশে পূর্ণানন্দ বুড়াগোঁহাই ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহের জন্য তখন মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি। পরে সেই ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর এই ছোট মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

আসাম ট্রাঙ্ক রোডে গাড়ি রেখে প্রায় পোয়া মাইল পথ হেঁটে আমরা মন্দির দর্শন করি। তারপরে আসি বালিগাঁবর গরখীয়া দ'লে। এ মন্দিরটি জোড়হাটের তিন মাইল উত্তরে।

এলাম টোকলাই আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন চার্চে। হেসে রতনবাবুকে বলি, "মন্দির কি শেষ হয়ে গেল? এখুনি যে গীর্জায় নিয়ে এলেন?"

রতনবাবু উত্তর দেন, "আসাম তো মন্দিরময় ভারতেরই অংশ। তার ওপরে জোড়হাট বেশ পুরনো শহর। কাজেই জোড়হাট ও তার উপকণ্ঠে বহু মন্দির রয়েছে, আছে অসংখ্য সত্র। কিন্তু উল্লেখযোগ্য দুটি মন্দির মাত্র দেখালাম আপনাদের। এবারে নিয়ে যাবো এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দিরে।"

"কোথায়, নেঘেরীটিঙে ?"
"হ্যাঁ।"
"কত মাইল জোড়হাট থেকে ?"
"সতেরো। আর গোলাঘাট থেকে চোদ্দ মাইল।"
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা লোকালয় ছাড়িয়ে এলাম। পথের দু-পাশে চা-বাগান—বুক সমান উঁচু সবুজের সারি। কিছু বড়গাছ তাদের মাথার ওপরে ডাল-পালার চন্দ্রাতপ ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আর বাঁশবন। চারিদিকে শুধুই সবুজ। তারই ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত মসৃণ পিচ-ঢালা পথ—সামনের দিগন্তে পৌঁছে ধূসর পাহাড়ে মিশেছে। শুনেছি গাড়ি চড়ে এই পথ-পরিক্রমা না করলে অমরাবতী-আসামের অপরূপ রূপ দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
মনে পড়ছে Dr. R. C. Muirhead-Thomson-য়ের সেই উক্তি। তিনি তাঁর 'Assam Valley' বইতে লিখেছেন—'There are places in upper Assam whcre one can drive hundreds of miles without meeting any great variation of rice field and busti (village), bamboo bari and tea garden, bheel and jungle. The plain too seems to run smoothly to the very foot of the hills,...'
ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে—যেদিকেই তাকাচ্ছি, দু-চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসাম সত্যই সুন্দর—অপরূপা-আসাম।
সব কিছুই ভালো লাগছে। তাহলেও চা-বাগানের মতো সুন্দর যেন আর কিছুই নয়। বুক-সমান উঁচু সারি সারি গাছ—যতদূর দেখা যায়। মাঝে মাঝে মেয়েরা সারি বেঁধে কাজ করছে—দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি তুলছে।
আমি ওদের দেখছি আর ভাবছি। ভাবছি চা-য়ের কথা। মনে আছে ছোটবেলায় পূর্ববঙ্গের সেই ছোট শহরে সকালবেলা দাদুর সঙ্গে বাজারে গেলেই দেখতে পেতাম—একটা গাড়ি দাঁড় করানো, তার গায়ে লেখা

'Tea Expansion Board.'

কেউ গাড়িটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই তাকে চা খেতে দিত। না, পয়সা চাইত না। দাদু বলত—ওরা বিনি পয়সায় চা খাওয়ায়।

জিজ্ঞেস করতাম—কেন।

দাদু উত্তর দিত—মানুষ যাতে চা-য়ের নেশায় পড়ে।

—নেশায় পড়লে কি হবে?

—তখন চা কিনে খেতে হবে।

তারপরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। আমার সেই জন্মভূমি আজ আর আমার দেশ নয়। আমি এখন স্বাধীন ভারতের জনৈক নগণ্য নাগরিক। এখন 'টি এক্‌সপ্যান্‌শন বোর্ড' শুধুই 'টি বোর্ড।' তাঁরা কাউকে আর বিনে পয়সায় চা খাওয়ান না। অথচ আমরা নিয়মিত চা খাই। তার মানে আমরা এখন চা-য়ের নেশায় পড়ে গিয়েছি।

শুধু আমরা নই, কেবল ভারত কিংবা এশিয়া নয়, সারা পৃথিবী এখন চা-য়ের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছে। চা এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়।

মসলার মতো চা-য়েরও প্রথম ব্যবহার ওষুধ হিসেবে। কিন্তু মসলার চেয়ে চা-য়ের বয়স অনেক কম। প্রায় ৩৭০০ বছর আগেও মানুষ মসলার ব্যবহার জানত কিন্তু চা-য়ের বয়স বড়জোর হাজার দেড়েক বছর। পণ্ডিতরা অনুমান করেন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তখন অবশ্য কাঁচা-সবুজ পাতা (unprocessed green leaves) থেকেই পানীয় প্রস্তুত করা হত। তবে সে ব্যবহার শুধু যে-সব দেশে চা জন্মাতো, সেই সব দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ চীনের য়ুনান থেকে আসাম পর্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরাই কেবল চা খেতেন।

৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চীনদেশে প্রথম চা-য়ের চাষ এবং ব্যবসা শুরু হয়। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে 'লু ইউ' নামে জনৈক চৈনিক

লেখক চা-য়ের ওপরে 'চা চিং' (Tea Classic) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না। চীনের সর্বত্র চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাপানীরাও চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বলা বাহুল্য বর্তমান বিশ্বের চা উৎপাদন এবং ব্যবসা য়ুরোপীয়দের অবদান। কিন্তু য়ুরোপের মানুষ চা-য়ের কথা জানতে পারে মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে। পর্যটক, নাবিক এবং জেস্যুইট মিশনারীরা চীন থেকে ফিরে গিয়ে প্রথম য়ুরোপের মানুষদের কাছে ওষুধ হিসেবে চা-য়ের উপকারিতার কথা উদাত্ত কণ্ঠে প্রথম ঘোষণা করেন। Father Matteo Ricci (১৫৫২-১৬১০ খ্রীঃ) নামে জনৈক জেস্যুইট মিশনারী চা-য়ের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন—'a peculiar mild bitterness, not disagreeable to the taste !*'

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ডেনিস ফরেস্ট আরও বলেছেন '…the Europeans took several Centuries to accept the fact, there is only one species, the full title of which is *Camellia sinensis* (*L*) *O. Kuntze.*'

বলা বাহুল্য সেই 'স্পিশিজ'-ই হল চা-গাছ।

চীন চা-য়ের প্রথম উৎপাদক হলেও আজ বিশ্বের বাজারে অধিকাংশ চা যোগাচ্ছে ভারত। আবার ভারতের বৃহত্তম চা উৎপাদন ক্ষেত্র এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। অর্থাৎ বিশ্বের বৃহত্তম চা-বাগান অঞ্চলের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি।

আসামের চা আজ সারা বিশ্বে বন্দিত। অথচ এ রাজ্যে চা-য়ের বয়স মাত্র শ'দেড়েক বছর। আসামের জঙ্গলে চা-গাছ আবিষ্কৃত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, যে বছর বর্মীরা প্রথম আসাম আক্রমণ করে। তখন চা-গাছ নাকি ছিল ১৫।২০ ফুট উঁচু এবং তার পাতা ছিল ৯ ইঞ্চি লম্বা। স্থানীয়রা সেই পাতা সেদ্ধ করে জল খেতেন। তাঁরা চা-কে বলতেন 'ফিনাক।'

---

*'Tea for the British' by Denys Forrest.

১৮২৩ সালে রবার্ট ব্রুস নামে জনৈক বৃটিশ কর্মচারীর কানে এলো কথাটা। কিন্তু আসামে তখনও বৃটিশ শাসন কায়েম হয় নি। আসাম ছিল বিদেশীদের কাছে নিষিদ্ধ দেশ। সুতরাং রবার্ট আসাম থেকে সেই পাতা সংগ্রহ করতে পারলেন না।

তাঁর আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অপূর্ণ রইল না। বর্মীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আহোমরাজ বৃটিশদের সাহায্য চাইলেন। আসামকে বর্মীমুক্ত করতে যে বৃটিশ সেনাদল পাঠানো হল, রবার্ট ব্রুসের ভাই সি এ. ব্রুস তাদের সেনাপতি হয়ে এলেন। আসাম বর্মীমুক্ত হবার পরে সি. এ. ব্রুস সেই গাছের কয়েকটি পাতা পাঠালেন কলকাতায়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বললেন—ওগুলো চা পাতা নয়।

ব্রুস কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না। তিনি আবার নমুনা পাঠালেন। দু-বছর বাদে সরকারী উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা অভিমত দিলেন যে পাতাগুলি প্রকৃতই চা-পাতা।

একটি কমিটি গঠন করে ১৮৩৫ সালে ভারত সরকার প্রথম লখিমপুরে চা-বাগান তৈরির কাজ আরম্ভ করলেন। পরের বছর সেই বাগান থেকে এক পাউণ্ড চা কলকাতায় এলো। ১৮৩৮ সালে বিলেতে চা রপ্তানী করা হয়। ১৮৩৯ সালে প্রথম চা কোম্পানী খোলা হল। নাম দেওয়া হয়—আসাম টি কোম্পানী লিমিটেড। পরবর্তী চা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোড়হাটে, ঠিক বিশ বছর বাদে, ১৮৫৯ সালে।

আসামের চা-গাছ নিয়ে শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন্স-য়ে চা-চাষের চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য সে চেষ্টা সফল হয় নি।

চীন থেকে বিশেষজ্ঞ এনে আসামে প্রথম চা-বাগান তৈরি করা হয়।

"আমরা এসে গেছি। সামনেই দেরগাঁও। জোড়হাট থেকে ১৬ মাইল। সেখান থেকে তিনদিকে তিনটি পথ চলে গিয়েছে—গোলাঘাট, কুমার-গাঁও আর শিকারীঘাট। গোলাঘাট দেরগাঁও থেকে ১৪ মাইল। আমরা এখন ডানদিকের কাঁচা রাস্তা ধরছি। এই রাস্তায় মাইল খানেক এগিয়েই নেঘেরীটিঙ শিব-দ'ল।"

রতনবাবুর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। তবে যার কথা ভাবছিলাম, সেই চা-গাছ কিন্তু আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। ডানদিকের এই পথটি সংকীর্ণতর। পথের পাশেই চা-বাগান। প্রায় তাদের গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গাড়ি চলেছে। আমরা এখন উত্তরে যাচ্ছি।

একটা টিলার পাদদেশে পৌঁছে গাড়ি থামালেন রতনবাবু। এজায়গাটারই নাম নেঘেরীটিঙ। পাশের চা-বাগানেরও একই নাম।

গাড়ি থেকে নেমে দেখি একসারি সিঁড়ি উঠে গিয়েছে টিলার ওপরে। সুনন্দারা সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। আমি ওদের অনুসরণ করি। রতনবাবু পেছনে আসছেন, দক্ষিণাদাকে নিয়ে।

দেখতে দেখতে ওপরে উঠছি। শান্ত-সুন্দর, নির্জন ও রমণীয় পরিবেশ। আমার ডানদিকে ও পেছনে, যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধুই সবুজ—সীমাহীন সবুজ। বাঁয়ে বহুদূরে সবুজের সীমায় সাদা প্রলেপ—ব্রহ্মপুত্রের ধবলধারা। পায়ের নিচে কালো পাথর। আর মাথার ওপরে নীল আকাশ—সেখানে সাদা মেঘের অবিরাম আসা-যাওয়া।

উঠে এলাম ওপরে। টিলাটি খুব উঁচু নয়, তাহলেও চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মপুত্রকে এবারে পরিষ্কার চিনতে পারছি। আর চারিপাশের চা-বাগানকে মনে হচ্ছে একখানি পটে আঁকা ছবি।

টিলার ওপরটা প্রায় সমতল। মাটিও বেশ নরম। তাই প্রায় সবটা জুড়েই সবুজ ঘাস। রয়েছে বড় বড় গাছ। মন্দিরের সামনে কয়েকটা কাঠগোলাপ ও বেল গাছ—চেয়ে দেখার মতো।

ঠিক মাঝখানে মন্দির—নেঘেরীটিঙ শিব-দ'ল। বেশ বড় মন্দির। চারপাশে চারটি ছোট ও মাঝখানে মূল-মন্দির। নিচের দিকে মন্দিরগাত্রে কিছু মূর্তি ও অন্যান্য খোদাই কাজ রয়েছে। আমরা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। দরজা বন্ধ, মানুষজন নেই।

ছোট "সুনন্দা বলে, এতদূর ছুটে এলেন, কিন্তু দর্শন করতে পারলেন না।"

"কেন?" আমি উৎকণ্ঠিত।

সে উত্তর দেয়, "দেখছেন না মন্দির বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"
ঘড়ির দিকে তাকাই। বলি, "ছ'টাও বাজে নি, আর এরই মধ্যে মন্দির বন্ধ! এ তোমাদের কেমন মন্দির?"
"এখানে তো কোনো লোকালয় নেই। পূজারী আসেন দেরগাঁও থেকে। তাঁকে সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরে যেতে হয়।"
বড়-সুনন্দা থামতেই দক্ষিণাদা বলেন, "আমরা না হয় পাপী বলে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন পেলাম না। পাপীরা পেঁছিবার আগেই পুণ্যাত্মা পূজারী পালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তোমরা তো পুণ্যবতী, মন্দির দর্শন করেছো। সংক্ষেপে বল না এই মন্দিরের কথা।"
"এই দরজার পরেই সিঁড়ি আছে।" বড়-সুনন্দা বলতে থাকে, "সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়। সিঁড়ির শেষে গর্ভ-মন্দির—স্যাঁতস্যাঁতে ও অন্ধকার। সেখানেই লিঙ্গমূর্তি—নেঘেরীটিঙের বাণলিঙ্গ।..."
"না, এভাবে নয়।" রতনবাবু বাধা দেন। "কোথাও বসে নেওয়া যাক্, তারপরে গোড়া থেকে শোনা যাবে।"
ছোট-সুনন্দা বলে, "তাহলে মন্দিরের পেছনদিকে চলুন, ওদিকটা আরও সুন্দর।"
আমরা তাকে অনুসরণ করি। ঠিকই বলেছে সুনন্দা। মন্দিরের পেছনে চমৎকার ঘাসে ছাওয়া একফালি আঙিনা। তারপরেই বড় বড় গাছের সারি। সেই সবুজ প্রাঙ্গণে বসে পড়ি সবাই। বড়-সুনন্দা শুরু করে, "আমরা জোড়হাট থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এসেছি। বলা বাহুল্য এটাও শিবসাগর জেলা। এ অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে এরকম আরও অনেক টিলা আছে।
"এই টিলাটির নাম নেঘেরীটিঙ কেন হল, তা নিয়ে দুটি মত রয়েছে। আসামে নেঘেরী নামে টিপটিপ শব্দ করা এক জাতের পাখি আছে। এখানে সেই পাখি খুব বেশি থাকায় নাকি এ টিলাটির নাম হয়েছে নেঘেরীটিঙ।..."
"আরেকটি মত?" দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন।

সুনন্দা উত্তর দেয়, "এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই শিবমন্দির সেকালে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। দেবদাসীরা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এখানে থাকত। তারা প্রতি সন্ধ্যায় নাচ-গান করে বাবা বিশ্বনাথের বন্দনা করত। নাচের সময় দেবদাসীরা উঁচু করে খোঁপা বাঁধত। সেই খোঁপার ওপরে ওড়না দিলে মনে হত পাহাড়ের চূড়া। দেবদাসীদের সেই খোঁপার নাম ছিল নেঘেরী খোঁপা। আর অসমীয়া ভাষায় চূড়াকে বলে টিঙ।"

"আচ্ছা, একটু আগে তুমি বললে বাণলিঙ্গ। এই মন্দিরের শিবলিঙ্গকে কি বাণলিঙ্গ বলে?" এবারে আমি জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ।" সুনন্দা উত্তর দেয়। বলে, "লিঙ্গমূর্তিটি তিন ফুট উঁচু। মূর্তির বেড়ও তিন ফুটের মতো। এটি খুবই প্রাচীন লিঙ্গমূর্তি, অনেকে মনে করেন অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর।

"প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে আমলের মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। বাণলিঙ্গটি পড়েছিল ঘন জঙ্গলে। বহুকাল পরে আহোমরাজ স্বর্গদেব বুদ্ধিস্বর্গ-নারায়ণ (সুসেংফা) এই লিঙ্গমূর্তির সন্ধান পেয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করান। তিনি বাণলিঙ্গর সেবা-পূজার ব্যবস্থা করে দেন।"*

"এটিই কি সেই মন্দির।" দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।

"না।" সুনন্দা উত্তর দেয়, "স্বর্গদেব জয়ধ্বজ সিংহের আমলে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে দিহিং ও লুই-য়ের মিলিতধারা···"

"লুই নামে আবার কোনো নদী আছে নাকি?"

সুনন্দা হেসে উত্তর দেয়, "আছে। অসমীয়ারা লোহিত মানে ব্রহ্মপুত্রকে বলেন লুই।"

লজ্জা পেয়ে বলি, "ঠিক আছে। বল, কি বলছিলে?"

"ষোড়শ শতকে দিহিং ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত ধারা সে-মন্দির ভেঙে ফেলে

* স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর বইতে দুজন সুসেংফার কথা বলেছেন—একজন ১৪৩৯ থেকে ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আহোমদের রাজা ছিলেন। অপরজন ১৬০৩ থেকে ১৬৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন।

কিন্তু শিবলিঙ্গটি সেখানেই জলের নিচে থেকে যায়। পরে সেখানে চড়া জেগে ওঠে। কথাটা কিন্তু স্থানীয়দের অজানা থাকে না। তাই তাঁরা সেই জায়গাটার নাম রাখেন শীতল-নেঘেরী।

"পুরুষানুক্রমে এই বাণলিঙ্গের অস্তিত্ব এবং মাহাত্ম্যের কথা মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। কাহিনীটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আহোমরাজ স্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের (১৭৫১-১৭৬৯ খ্রীঃ) কানে আসে। তিনি পবিত্রভাবে সেই বাণলিঙ্গকে নিয়ে আসেন এখানে। তারপরে কারুকার্যখচিত এই সুন্দর দেবালয়টি নির্মাণ করান। শোনা যায় কয়েকটি ভগ্ন মন্দিরের ইট ও পাথর দিয়ে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। অনেকের মতে এটি শিবসাগর জেলার সবচেয়ে সুন্দর মন্দির।

"বাইরের দেওয়ালে আপনারা যেমন বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ও অন্যান্য খোদাই-কাজ দেখলেন, ভেতরেও তেমনি আছে। গর্ভ-মন্দিরে রয়েছেন বাণলিঙ্গ আর দু-পাশের ছোট মন্দির চারটিতে বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ ও দুর্গা। কথিত আছে রাজেশ্বর সিংহ এই মন্দির নির্মাণ করলেও তিনি মন্দিরে বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না।..."

"কেন?"

"লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন। পরে তাঁর পুত্র রাজা লক্ষ্মী সিংহের আমলে (১৭৬৯-১৭৮০ খ্রীঃ) মূর্তি প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে গর্ভ-মন্দিরে আরও কয়েকটি লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"শুনেছি শ্রীভূধর আগমাচার্য এই মন্দিরের প্রথম পূজারী। তিনি কন্দলি গোসাঁই ও মধুমিশ্র গোসাঁই-য়ের আদিপুরুষের সঙ্গে কান্যকুব্জ থেকে আসামে এসেছিলেন। আজও আগমাচার্যের বংশধরগণ এই মন্দিরের পূজারী। তাঁরা রাজার কাছ থেকে বরঠাকুর উপাধি পেয়েছেন।

"পরবর্তীকালের আহোম রাজারাও লক্ষ্মী সিংহের মতোই বাণলিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরা এই মন্দিরের নির্মাল্য না নিয়ে দিনের আহার্য গ্রহণ করতেন না।" সুনন্দা চুপ করে।

বলে উঠি, "হয়ে গেল ?"

"না।" সুনন্দা বলে, "আরেকটি ছোট্ট গল্প আছে।

"তাড়াতাড়ি। সময় হয়ে এলো, এবারে উঠতে হবে।" রতনবাবু ঘড়ি দেখেন।

সুনন্দা শুরু করে, "পুরাকালে এ-অঞ্চলে ঔর্ব নামে একজন ঋষি বাস করতেন। তিনি এখানে দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই এই বাণলিঙ্গ ও অন্যান্য লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন। কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে ঔর্বের মনস্কামনা পূর্ণ হয় না, দ্বিতীয় কাশী ঋষির কল্পনাই থেকে যায়। কিন্তু তাঁর কল্পলোকের এই বাস্তব মহাতীর্থে এসে আজ আমাদের জীবন ধন্য হল।"

১৩

ফিরে চলেছি জোড়হাট। একই পথ।—চা-বাগানের পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে ছুটে। যাবার পথে আমি চা-য়ের কথা ভাবতে ভাবতে গিয়েছি; আর ফেরার পথে রতনবাবু চা-য়ের কথা বলতে বলতে গাড়ি চালিয়েছেন। আমরা নীরবে শুনছি।

রতনবাবু বলছেন, "প্রত্যেক চা বাগানে হুটি বিভাগ আছে –Plantation অর্থাৎ চা-বাগিচা রক্ষণাবেক্ষণ এবং Manufacturing বা চা-তৈরি বিভাগ। রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ চারা লাগানো, গাছ-ছাঁটা, গাছের গোড়া পরিষ্কার করা, মাটি ও সার দেওয়া, পোকা মারা, জল নিষ্কাশন ও পাতা তোলার ব্যবস্থা প্রভৃতি করে।

"চা-তৈরি বিভাগের কাজ হল পাতা থেকে চা তৈরি করা। পাতা তোলার কাজ বর্ষার ওপরে নির্ভর করে। কারণ বৃষ্টি পড়লেই নতুন পাতা গজায়। সাধারণত মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আসামের বাগানে চা-পাতা তোলা যায়। সপ্তাহে সাধারণত একবার করে পাতা পাওয়া যায়। পাতার ওপরে চা-য়ের মান নির্ভর করে। হুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে পাতা হয়, তাকে বলে First flush. জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত যে পাতা পাওয়া যায়, তাকে বলে Second flush. এই পাতাই সবচেয়ে ভালো। অবশ্য বাগানের মাটি ও আর্দ্রতা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞরা এই বিভাগ করে থাকেন। সব বাগানে যে 'ফ্লাশ'-য়ের সময় এক হবে তার কোনো মানে নেই।

"আরেকটা কথা।" রতনবাবু বলে চলেন, "চা তোলার সময় Plucking table ঠিক রাখা একান্ত দরকার।"

'Plucking table ?" বড়-সুনন্দা বুঝতে পারে না।

রতনবাবু বুঝিয়ে দেন, "চা গাছের উপরিভাগ। চা-বাগানে দেখেছেন সমস্ত গাছগুলোর মাথা সমান করে ছাঁটা। ফলে নতুন পাতা গজালে সহজেই নজরে আসে। এতে একদিকে যেমন কচি পাতা তোলা যায়, আরেকদিকে একটি নতুন পাতাও পড়ে থাকে না।"

"এবারে একটু চা-তৈরির কথা বলুন।" রতনবাবু থামতেই ছোট-সুনন্দা আবদার করে।

রতনবাবুকে তাই একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করতে হয়, "সারাদিনের তোলা পাতা দিনের শেষে কারখানায় আসে। ওজন করার পরে পাতাগুলো লম্বা Tray অথবা পাটাতনের ওপর বিছিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়। সাত/আট ঘণ্টা বাদে পাতাগুলোর কিছু জলীয় অংশ শুকিয়ে যায়। এই শুকোবার কাজটি কারখানার যে অংশে করা হয়, তাকে বলে Withering House.

"সেখান থেকে যেখানে পাতা নিয়ে আসা হয়, তার নাম Rolling Room. ঐ ঘরে রোলারের সাহায্যে (Rotorvane) পাতাগুলোকে পিষে ফেলা হয়।"

"Rotorvane থেকে বেরুবার পরে সেই পিষ্ট পাতাকে আবার C. T. C. মেশিনের কাঁটাযুক্ত রোলারের ভেতর চালান করা হয়। এবারে পাতাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

"টুকরোগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় Fermenting ঘরে, এলুমিনিয়াম পাতের ওপরে বিছিয়ে দেওয়া হয়। গরম বাষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত সেই ঘরে ঘণ্টা দুই রাখার পরের পাতাগুলোর রং তামার মতো হয়ে যায় এবং তাতে চা-য়ের গন্ধ জন্মলাভ করে। 'ফার্মেন্টিং'-য়ের ওপরে চা-য়ের গুণাগুণ বহুলাংশে নির্ভর করে।

"তারপরে পাতাগুলোকে ভাজা হয়। যে যন্ত্রের সাহয্যে এ কাজটি করে তাকে বলে Drier.

"উৎপন্ন চা-কে তখন নিয়ে আসা হয় Sorting Room-য়ে। সেখানে

প্রথমেই Fibre Eutractor যন্ত্র দিয়ে 'ফাইবার' অর্থাৎ পাতার বোঁটা-গুলোকে আলাদা করে। তারপরে ছাঁকনি জাতীয় কয়েকটি যন্ত্রের সাহায্যে চা-য়ের Grading করা হয়।" থামলেন রতনবাবু।

বড়-সুনন্দা বলে, "এতো শুধু C. T. C-চা তৈরির কথা বললেন। এবারে Orthodox তৈরির কথা বলুন।"

মৃদু হেসে রতনবাবু বলেন, "আজ আর বলা গেল না।"

"কেন বলুন তো ?"

"শঙ্কুবাবু এখুনি নেমে যাবেন।"

"তার মানে ?"...প্রশ্নটা করলেও সুনন্দা রতনবাবুকে উত্তর দেবার সময় দেয় না। বাইরের দিকে তাকিয়েই আবার ওঠে, "আরে তাই তো ! আমরা যে আনন্দবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছি।"

শুধু সুনন্দা নয়, আমিও বিস্মিত। চা-য়ের গল্প শুনতে শুনতে খেয়ালই করি নি কখন আমাদের গাড়ি চা-বাগান অঞ্চল ছাড়িয়ে জোড়হাটে ফিরে এসেছে।

গাড়ির শব্দে ভারতী বেরিয়ে আসে বাইরে। বলে, "আসুন দাদা !"

মুচকি হেসে বড়-সুনন্দা বলে, "দেখবেন, বোনের বাড়ি গিয়ে আবার আমাদের ভুলে যাবেন না যেন। দশটার ভেতরে হোস্টেলে ফিরতে না পারলে, গাছতলায় রাত কাটাতে হবে।"

"কেন ?" সহাস্যে বলি, "সুনীলবাবুরা চলে গিয়েছেন, ম্যাড্রাস হোটেলে অন্তত একখানি ঘর নিশ্চয়ই খালি আছে।"

"হ্যাঁ, যাতে কাল সকালে কলেজে গেলেই প্রিন্সিপ্যাল ডিসচার্জ লেটার হাতে ধরিয়ে দেন।"

"ক্ষতি কি ? আমার সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাবে। তোমার মা তো শুনেছি যোধপুর পার্কে থাকেন। আমার বাড়ি থেকে মোটেই দূর নয়। আমি তোমাকে মা-য়েব কাছে পৌঁছে দেব।"

"এত কষ্টের দরকার নেই দাদা ! দয়া করে আটটার মধ্যে রতনদার বাড়িতে চলে আসুন।"

"ভয় নেই সুনন্দাদি !" এবারে সহাস্যে ভারতী বলে, "দাদা এক বোনের জন্য দু-বোনকে ভুলে যাবেন না।"
ওর কথায় সবাই হেসে উঠি। সুনন্দারাও বাদ যায় না।
সুবোধদা ও আনন্দ বাইরের ঘরেই বসেছিল। ভারতী আমাকে বসতে বলে ভেতরে চলে যায়। সুবোধদাকে জিজ্ঞেস করি, "কখন এসেছেন ?"
"তা বেশ কিছুক্ষণ। কি করব ? পেটুক মানুষ। পাছে দেরি হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।"
আমরা হেসে উঠি।
ভেতর থেকে ভারতীর গলা ভেসে আসে, "উঁহু। এখন কোনো গল্প নয়। আমি আসার পরে গল্প শুরু হবে।"
"তুমি না এলে গল্প জমবেও না। মনে খাবার চিন্তা থাকলে কি মুখে গল্প আসে ?" সুবোধদা ভারতীকে আশ্বস্ত করেন।
আমাদের হাসির শব্দ বাড়ে।
আনন্দ বলে, "একে তো সবে সংসার শুরু করেছে, তার ওপরে সারা-দিন একা-একা থাকে। কেউ বাড়িতে এলে তাকে আর ছাড়তে চায় না।"
আমি মাথা নাড়ি। মনে মনে ভারতীর কথাই ভাবতে থাকি। সত্যই বড় কষ্ট মেয়েটার। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে এসেছে কিন্তু এখানে না আছেন শাশুড়ী, না আছে ননদ। এমন কি একটা ঠাকুরপো পর্যন্ত নেই।
মেয়ের পাত্র নির্বাচনের সময় বাপ-মা আজকাল একান্নবর্তী পরিবার বর্জন করার চেষ্টা করেন। মেয়েরাও সুখ-সারীর সংসার পছন্দ করে। একক সংসারের প্রতি এই আসক্তি হয়তো অকারণে নয়। তা হলেও বলব, জটিলা-কুটিলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি এ-সংসারে।
সুবোধদা কিংবা আমার, যার কথা ভেবেই ভারতী আয়োজন করে থাক্, সে চায়ের সঙ্গে বেশ ভালো 'টা'-য়ের ব্যবস্থা করেছে। সময় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং চা খেয়েই উঠে পড়তে হয়।

ভারতী জিজ্ঞেস করে, "কথাটা মনে আছে তো দাদা!"

আমি তার দিকে তাকাই।

সে বলে, "পরের বার জোড়হাটে এসে আমার এখানে উঠবেন।"

কিছুক্ষণ আগে লিবি এই একই দাবি জানিয়েছে, কিছুক্ষণ পরে রতনবাবুর স্ত্রী-ও হয়তো একই দাবি করবেন। সেদিন ডাক্তার ব্যানার্জীও এই প্রস্তাব করে রেখেছেন।

জানি না আবার কবে জোড়হাট আসব? জানি না তখন এদের কে কে জোড়হাটে থাকবে? কিন্তু জানি, এদের এই আন্তরিক আমন্ত্রণের কথা আমার মনে থাকবে বহুকাল।

সুবোধদার সঙ্গে বেঙ্গলী ক্লাবে এলাম। অনেকেই অপেক্ষা করছেন। আলাপ হয়েছে এঁদের প্রায় সবার সঙ্গে কিন্তু নাম জানি না অধিকাংশের। যাঁদের নাম জানি, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী কল্যাণকুমার রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব ভট্টাচার্য ও তুষ্টুদা এবং ডাক্তার সলিল মুখোপাধ্যায়, প্রমোদচন্দ্র রায় ও বরুণদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য।

বলা বাহুল্য রবীনবাবুও এসে গিয়েছেন। তুষ্টুদার একটু জ্বর হয়েছে, তবু তিনি না এসে পারেন নি। সুবোধদা বলেছিলেন—সবাই একসঙ্গে বসে এককাপ করে চা খাবো। এখন বুঝতে পারছি, সেই এককাপ চা-কে অবলম্বন করে এঁরা একটি ক্ষুদ্র সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছেন। সুতরাং সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কিছুক্ষণ বক্তৃতা চলল। বরুণদেব বললেন—আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি। লেখক শঙ্কু মহারাজকে যদিও বা ভুলে যাই কখনো, মানুষ শঙ্কু ঘোষকে ভুলব না কোনোদিন।

বাধ্য হয়ে আমাকেও বলতে হল কয়েকটি কথা, তারপরে আমি ওঁদের একখানি 'রাজভূমি-রাজস্থান' উপহার দিলাম। ওঁরা আমাকে দিলেন ডাইনিং টেবিলের জন্য একসেট মাদুর ও টেবিল সাজিয়ে রাখবার জন্য একজোড়া নাগা তীর।

আমি সানন্দে সে উপহার মাথায় তুলে নিলাম। তারপরে বিদায় নিলাম

বন্ধুদের কাছ থেকে। আবার জোড়হাটে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রবীনবাবুর সঙ্গে যখন রাস্তায় নেমে এলাম, তখন রাত ঠিক আটটা। সুনন্দা আটটার মধ্যে রতনবাবুর বাড়িতে পৌঁছতে বলেছিল কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি। রবীনবাবু একবার আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন বলে সকাল থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। আমি এখন সেখা-নেই চলেছি।

রিক্সা পাওয়া গেল না। সুতরাং হেঁটেই রওনা হতে হল। হাঁটায় আপত্তি নেই। বিপদ হয়েছে সময় নিয়ে। রতনবাবুর বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। শ্রীমতী রত্না নাকি আজ সারাদিন বসে রান্না করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা রাজসী ও বিদুষী ঘুমিয়ে পড়বার আগেই আমার সেখানে পৌঁছন দরকার। রতনবাবুর মেয়ে দুটি ভারী মিষ্টি। ছেলেটিও ভারী সুন্দর। তবে সে বড্ড ছোট, মাত্র দেড় বছর। সে নিশ্চয়ই তখন ঘুমিয়ে থাকবে। রতনবাবু ছেলের নাম রেখেছেন অর্কশম্ভু।

কিন্তু আমি যে নিরুপায়। এমন ঠাসা 'প্রোগ্র্যাম্' হলে 'টাইম্ শিডিউল্' মেনে চলি কি করে? ভগবানের অসীম করুণা, তিনি আমাকে ভি. আই. পি. করে দিয়েছেন। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, চারদিনের 'সুলতানী' আজই শেষ হয়ে যাবে। কাল থেকে 'পুনর্মূষিকো ভব'।

রিক্সা না পাবার জন্য রবীনবাবু সংক্ষিপ্ত পথে নিয়ে এলেন। সময় বেশি লাগল না। কিন্তু রবীনবাবুর আফসোসের অন্ত নেই। খুবই স্বাভাবিক। আমরা যারা বই-টই লিখি, তারা সবাই যে চাঁদের দেশের মানুষ। আমাদের দেশে জল-কাদা নেই, খানা-খন্দ নেই, অন্ধকার নেই।

রবীনবাবুর বাড়িটি ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। সামনে ছোট্ট একফালি বাগান, তারপরে বাংলো টাইপের বাড়ি। নাম সীতা-কুটির। আর এই মহল্লাটিকে বলে বাঁশবাড়ি।

বারান্দায় উঠে আসতেই বাইরের আলো জ্বলে উঠল। এরা বোধকরি

আমাদের পথ চেয়ে বসেছিল।

দরজা খুলে যায়। মধ্য তিরিশ বয়সী জনৈকা মহিলা ওপাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর মাথায় ঘোমটা, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর। খুব ফর্সা না হলেও গায়ের রং কালো নয়, কিন্তু বড্ড রোগা। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালী পরিবারের কুলবধূ।

কিন্তু বাড়িতে কোনো অপরিচিত মানুষ এলে তাঁরা তো কখনও এমন সামনে এসে দাঁড়ান না। কি জানি হয়তো আমি ওর অপরিচিত নই। আমার লেখা আমাকে ওর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছে।

শ্রীমতী ভৌমিক বলে, "ভেতরে আসুন।" সে একখানি চেয়ার এগিয়ে দেয়।

আমি বসে পড়ি।

পাঠিকা অভিযোগ করে, "সেই সকাল থেকে পথ চেয়ে রয়েছি, আর এতক্ষণে আপনার সময় হল দাদা!

এ অভিযোগের উত্তর আমার জানা রয়েছে, তবু কিছু বলতে পারি না। কি বলব? সকালে বুড়িগোহানী মন্দিরে ও বিকেলে নেঘেরীটিঙ শিবদ'ল দর্শন করতে গিয়েছিলাম?

জীবনে তো কত শত মন্দির দর্শন করেছি, কিন্তু অপরিচিত একটি বোনের এমন আকুল প্রতীক্ষা তো এর আগে খুব বেশি দেখি নি। এখন মনে হচ্ছে আমার কাছে জোড়হাটের এই 'সীতা-কুটিরের' মূল্য নাসিকের রাম মন্দিরের চেয়ে কোনোমতেই কম নয়। বুঝতে পারছি বুড়িগোহানী কিংবা নেঘেরীটিঙ মন্দির দর্শন না করেও আমার এই সীতা-কুটিরে আসা উচিত ছিল।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধহয় রবীনবাবু আমার হয়ে ওকালতী করেন। আমার বোনটির বোধহয় সে ওকালতী মনঃপূত হয় না। তবে সে আর কোনো অভিযোগ করে না। ছেলে-মেয়েকে এঘরে ডাকে। তারা এলে পরিচয় করিয়ে দেয়, "আমাদের ছেলে-মেয়ে —রথীন্দ্র ও গায়ত্রী। রথীন এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে, কলেজে

পড়ছে। আশীর্বাদ করবেন দাদা!"

ওরা আমাকে প্রণাম করে। তারপরে গায়ত্রী বলে, "আমি তাহলে আপনার চা নিয়ে আসি।"

মা বলে, "তুই বোস, আমি চা নিয়ে আসছি।"

"না।" কিশোরী কন্যা প্রতিবাদ করে। বলে, "সেই সকাল থেকে তো মামার পথ চেয়ে বসে আছো। এখন মামা এসেছেন, তুমি এখানে বসো।"

মা মেয়ের কথা মেনে নেয় সে সামনের চেয়ারখানিতে বসে পড়ে। রথীন বাবার কাছে গিয়ে বসে। গায়ত্রী ভেতরে চলে যায়।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে শ্রীমতী ভৌমিক সহসা শুরু করে, "আপনাকে দেখার ইচ্ছে আমার বহুদিনের।..."

"কিন্তু আমি যে মোটেই দেখার মতো নয় ভাই!"

কথাটা কিন্তু কানে নেয় না সে। বলে চলে আপন মনে, "আপনাকে দেখব, আপনার সঙ্গে কথা বলব—এ ছিল আমার স্বপ্ন, বহুদিনের স্বপ্ন, আজ আমার সেই স্বপ্ন সত্য হল। আজকের দিনটি আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে রইল।

"আপনার বই পড়তে পড়তে কখন যেন আমিও আপনার ভ্রমণপথের সঙ্গী হয়ে যাই। আপনার সুমন, শ্যামা, মানসী ও জানকী আমার মনে যেমন সাড়া জাগিয়েছে, তেমনটি..."

কষ্টকর হলেও কথাগুলো শুনে যেতে হচ্ছিল, প্রতিবাদ করতে পারছিলাম না। ভয় হচ্ছিল প্রতিবাদ করলে পাঠিকা কষ্ট পাবে। কিন্তু ভগবান ভদ্রলোক খুব নির্দয় নন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন গায়ত্রীকে। সে চা নিয়ে এসেছে। পেছনে রবীনবাবুর বৃদ্ধ মা। তাঁর হাতে আমার জলখাবারের থালা।

শ্রীমতী ভৌমিক উঠে দাঁড়িয়ে শাশুড়ীর হাত থেকে থালাখানি নিয়ে আমার সামনে রাখে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে গিয়ে রবীনবাবুর মাকে প্রণাম করি। বৃদ্ধা চিবুক ছুঁয়ে আমাকে আর্শীবাদ

করেন, “সুখে থাকো বাবা ! বড় হও, আরও বড় ।”

ফিরে এসে জায়গায় বসি। থালাখানির দিকে নজর পড়ে। বলি, “এত খেতে পারব না। একটু আগে ভারতীর বাড়িতে খেয়েছি, রাতে আবার রতনবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন !”

“কিন্তু আমি যে সারা সকাল বসে খাবার বানিয়েছি দাদা !” করুণ কণ্ঠে আমার বোন বলে।

“বেশ। সবগুলোই তবে একটু একটু করে খাবো।”

এবারে আর সে আপত্তি করে না। নীরবে আমার খাওয়া দেখতে থাকে। তারপরে হঠাৎ উঠে ভেতরে চলে যায়।

খাওয়া শেষ হয়। হাত ধুয়ে চা-য়ে চুমুক দিই। পাঠিকা ফিরে আসে। তার হাতে একখানি ‘গঙ্গাসাগর।’

বইখানি আমার হাতে দিয়ে বলে, “আমার কাছে আপনার আরও কয়েকখানি বই আছে। কিন্তু বেশি সময় নষ্ট করব না, শুধু এই বইখানিতে আজকের তারিখ দিয়ে একটা সই করে দিন।”

চা-য়ে শেষ চুমুক দিয়ে বইখানি কাছে টেনে নিই। তার অনুরোধ রক্ষা করে উঠে দাঁড়াই। বলি, “এবারে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।”

“আপনি পথিক। আমার কি সাধ্যি যে আপনাকে বেঁধে রাখি। কিন্তু চলে যাবার আগে একটা কথা দিয়ে যেতে হবে।”

“কি কথা ?”

“আবার যদি কখনো জোড়হাট আসেন, অন্তত একবেলা আমার রান্না খেতে হবে।”

“বেশ। কথা দিলাম।”

“আরেকটা কথা।”

আবার থামতে হয় আমাকে।

বইখানি মেয়ের হাতে দিয়ে সে কাঁধের ওপর থেকে আঁচলটা টেনে নামায়। কি যেন একটা বাঁধা রয়েছে আঁচলে। নিশ্চয় আমার জন্য কোনো উপহার। কিন্তু এতটুকু কি উপহার হতে পারে ?’

রবীনবাবু, তাঁর মা এবং ছেলে-মেয়েও তাকিয়ে আছে আমার বোনের দিকে। মনে হচ্ছে কেউই কিছু জানে না।

ছোট্ট একটুকরো কাগজ। হ্যাঁ, অত্যন্ত সাধারণ সাদা একটু কাগজ বেরিয়েছে আঁচল থেকে, চারদিকটা সমান করে কাটা নয় পর্যন্ত।

কাগজটুকু আমার হাতে দিয়ে সে সহসা নিচু, হয়ে প্রণাম করে আমাকে। বাধা দেবার কোনো সুযোগ পাই না।

কাগজখানির দিকে তাকাই। বিস্মিত হই। কাঁচা মেয়েলী অক্ষরে চার লাইনের কবিতা আমি কবি নই। আমার ছন্দজ্ঞান নেই। সুতরাং কবিতা হিসেবে এর কি মূল্য জানা নেই আমার। এটি শাস্ত্র-সম্মত কোনো কবিতা হয়েছে কিনা, তাও জানি না। শুধু জানি আমার কাছে এটি কবিতা, অমূল্য কবিতা। আমি বিস্ময় ও বিমুগ্ধ অন্তরে বার বার পড়ে যাই—

'ভারত-মন্থন করি' যে অমৃত তুমি
ঢালিয়াছো মোর প্রাণে,
আমার অন্তর তাহা বহি'
লয়ে যাবে সুধা-ধামে।'

১৪

সকালে ঘুম ভাঙল একই সময়ে কিন্তু আজ আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। কেমন একটা অবসাদ যেন আমার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। আজ যে জোড়হাট থেকে বিদায় নিতে হবে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার যে-মন জোড়হাটে এসেছিল, সে-মন জোড়-হাট থেকে ফিরে যাচ্ছে না। তার অনেকখানি রেখে যাচ্ছি এখানে। তাই অবসাদ আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

কিন্তু শুধু তো রেখে যাচ্ছি না, সেই সঙ্গে যে নিয়ে যাচ্ছি তার চেয়ে বেশি। গত চারদিন ধরে অসংখ্য মানুষের যে অকৃত্রিম ভালোবাসা কুড়িয়েছি, তা আমার জীবনের এক মহৎ সঞ্চয়। এমন অকুণ্ঠ প্রীতির পরশ পাবার পরেও কেন আমি মনমরা হয়ে রয়েছি ?

তাতাতাড়ি উঠে বসি। বাথরুম সেরে বাইরে আসি—বারান্দায় দাঁড়াই। গতকাল এসময় ঠিক এখানে ঘোষবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজ ঘোষবাবু নেই। আগামীকাল এসময়ে আমিও থাকব না এখানে। আসা আর যাওয়া নিয়েই জীবন। আমরা সবাই পথিক।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। রোজ বেল বাজাতে হয়। আজ নিজের থেকেই এনেছে। কি জানি, আসামে আমার অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর মধ্যে সে-ও হয়তো একজন।

চা-য়ের কাপ ঠোঁটে ঠেকিয়ে গতরাতের কথা ভেবে চলি। রাজসী ও বিদুষী ঘুমিয়ে পড়বার আগেই রবীনবাবু আমাকে রতনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওরা যদিও তখন দক্ষিণাদাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আজ দাদু চলে আসার সময় নিশ্চয় কান্নাকাটি করবে। দাদুও চোখের জল সামলাতে পারবেন না।

সুনন্দারা গত কাল রাত পৌণে দশটা পর্যন্ত রতনবাবুর বাড়িতে ছিল। তারপরে পল্টন রতনবাবুর গাড়িতে করে ওদের হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। যাবার সময় ওরা খুবই দুঃখ করেছে। ক্লাশ আছে বলে আজ সকালে আর আসতে পারবে না এখানে।

একদিকে বোধহয় ভালোই হয়েছে। মেয়ে দুটি গত চারদিন প্রায় ছায়ার মতো ছিল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। ওরা অধ্যাপনা করলেও মায়ের জাত। বিদায় বেলায় এখানে উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি জুড়ে দিত। হয়তো বা আমিও চোখের জল সামলাতে পারতাম না।

সবার আগে এলেন সুবোধদা। সঙ্গে সংঘমিত্রা—একমাত্র মেয়ে। এবারে ইংরেজীতে এম. এ. দেবে।

তারপরে এলো পল্টন। সম্মেলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নীরব কর্মী। অভিজ্ঞান ছাপা থেকে শুরু করে টাকা-পয়সার হিসেব রাখা পর্যন্ত সর্বদা সর্ববিষয়ে রতনবাবুকে সাহায্য করেছে কিন্তু কেউ তার উপস্থিতি টের পায় নি।

"দুষ্টুদা কেমন আছেন?" জিজ্ঞেস করি পল্টনকে।

সে উত্তর দেয়, "বাবার জ্বরটা একটু বেড়েছে, তাই আসতে পারলেন না দেখা করতে।"

"না, না, তিনি জ্বর নিয়ে আসবেন কি? আমরাই যাবার সময় দেখা করে যাবো তাঁর সঙ্গে।"

একটু বাদে প্রমথ আসে। না, সে একা নয়। তার সঙ্গে এসেছেন বাউল সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী মঞ্জু দাস। পূর্ণবাবুরা এই হোটেলেই আছেন। ওঁরাও আজ ফিরে যাবেন কলকাতায়।

মঞ্জুদেবী জানালেন, পূর্ণবাবুর শরীরটা নাকি ভালো নয়। তিনি শুয়ে আছেন।

তাহলে তো আমাকে একবার দেখা করে আসতে হয়। মঞ্জুদেবী ও প্রমথর সঙ্গে পূর্ণবাবুর ঘরে আসি।

না, ঠিক অসুস্থ নয়। পর পর তিনরাত গান গেয়ে বোধহয় একটু শ্রান্ত

হয়ে পড়েছেন। তাই শুয়েছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতেই উঠে বসলেন। কথায় কথায় বললেন, "দাদা, আমরা এক পাড়ায় থাকি আর জোড়-হাটে এসে দেখা হয় আমাদের। কথা দিন, ফিরে গিয়ে একদিন সময় করে আসবেন আমার বাড়িতে।"

কথা দিয়ে ফিরে আসি ঘরে। এসে দেখি দক্ষিণাদাকে নিয়ে রতনবাবু এসে গিয়েছেন। অর্থাৎ জোড়হাট থেকে আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে সমাগত।

রতনবাবু বলেন, "রত্না আসতে পারল না দেখা করতে।"

"না, না, সে আবার এই সাত সকালে এখানে আসবে কি? কাল সারাদিন বসে রান্না করেছে। আর রাত বারোটায় সেই খাওয়ার পাট চুকেছে।"

"সেজন্য নয়।" দক্ষিণাদা বলেন, "রত্না তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারল না মেয়েদুটোর জন্য। ভেবেছিল ওদের স্কুলে পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে চলে আসবে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে আমাকে স্যুটকেস গোছাতে দেখেই তারা ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। স্কুলেই গেল না। আসার সময় বড্ড কান্নাকাটি করেছে।" একবার থামেন দক্ষিণাদা। তারপরে আবার বলেন, "আমি তো ওদের কেউ নই, তবু ওরা কেন যে আমায় এত ভালোবেসে···"

শেষ করতে পারেন না দক্ষিণাদা। তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে। তিনি চোখ মোছেন।

কেউ কোনো কথা বলছেন না। আমিও চুপ করে থাকি। ভাবি—ভালো-বাসা তো রক্তের সম্পর্কের মুখাপেক্ষী নয়। সে শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃ-তির ধার ধারে না। দেশ, কাল ও পাত্র মানে না। ভালোবাসা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে।

"রত্না এই চিঠিটা আপনাকে দিয়েছে।"

রতনবাবুর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। আমি তাঁর হাত থেকে কাগজটুকু নিই।

ছোট চিঠি। রত্না লিখেছে —

'আমাদের মহারাজ!

আপনি এসে, দেখে, জয় করে ফিরে যাচ্ছেন।

আপনার সাম্রাজ্যের বিস্তার যথাযথ ভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে।

আপনি আমাদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি

গুণমুগ্ধা রত্না

'এন. এইচ. থার্টিসেভেন' বা সাঁইত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আমাদের গাড়ি চলেছে ছুটে। রতনবাবু গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে দক্ষিণাদা। পেছনে আমি ও প্রমথ। নিখিলবাবু সকালেই ডক্টর নীলমণি ফুকণকে নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছেন। ওঁরা সোজা ডিব্রুগড় চলে যাবেন। আমরা পথে শিবসাগর দেখব।

আহোম রাজাদের প্রিয়তম রাজধানী শিবসাগর। মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে আহোমরাজ স্বর্গদেব গৌরীনাথ সিংহ ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী শিবসাগর থেকে জোড়হাটে নিয়ে আসেন। জোড়হাট থেকে শিবসাগর ৩৫ মাইল। নিয়মিত বাস চলাচল করে। প্রমথ বাস-য়ে করেই ফিরে আসবে বিকেলে।

বাস-য়ে করে ডিব্রুগড়ও যাওয়া যায়। আসাম চা-সাম্রাজ্যের রাজধানী ডিব্রুগড়। শিবসাগর থেকে ৫০ ও জোড়হাট থেকে ৮৫ মাইল। ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। ট্রেনেও যাওয়া যায়। তবে যেতে হয় অনেক ঘুরে। জোড়হাট থেকে মরিয়ানী। সেখান থেকে মেনলাইন ধরে তিনশুকিয়া। তারপরে ব্রাঞ্চ লাইনে ডিব্রুগড়। তার চেয়ে বাস-য়ে যাওয়া অনেক সহজ। চার/পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে। ভাড়া আট টাকা থেকে চোদ্দ টাকা।

আমরা উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছি। জোড়হাট থেকে ১০ মাইল

এগিয়ে পৌঁছব কোকোজান। আরও ১৬ মাইল গিয়ে গৌরীসাগর। গৌরীসাগর থেকে একটি পথ গিয়েছে দিখাউমুখ—মাত্র ৬ মাইল। গৌরীসাগর ছাড়িয়ে জাতীয় সড়ক ধরে ৯ মাইল উত্তর-পূর্বে এগিয়ে শিবসাগর।

আমরা শিবসাগর চলেছি। আসামের ইতিহাসে শিবসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তার ওপরে প্রমথ সঙ্গে রয়েছে। প্রমথ ভালো ছাত্র ছিল। সে ১৯৭০ সালে এম. এ., একাত্তরে বি. টি. ও বাহাত্তরে এল. এল. বি. পাশ করেছে। ইতিহাস নাকি ওর সবচেয়ে 'ফেভারিট্ সাবজেক্ট'। তাছাড়া ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ওদের আদিনিবাস হলেও, ওরা প্রায় আশি বছর অর্থাৎ তিনপুরুষ ধরে আসামে বাস করছে। সুতরাং আসামের ইতিহাস প্রমথর নখদর্পণে।

প্রমথকে বলি, "শিবসাগর পৌঁছতে তো অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগবে। এই অবসরে সংক্ষেপে একটু আসামের ইতিহাস বলে ফেলো না। আমরা যে ঐতিহাসিক নগরী শিবসাগরে চলেছি।"

"উত্তম প্রস্তাব।" দক্ষিণাদা সমর্থন করেন আমাকে।

শুধু দক্ষিণাদা নন, রতনবাবুও সমর্থন করেন আমার প্রস্তাব। তিনি প্রমথকে বলেন, "শুরু করে দাও, সময়টা ভালো কাটবে। চুপচাপ গাড়ি চালানো বড়ই বিরক্তিকর।

সুতরাং শুরু করে প্রমথ, "আসামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে গিয়ে প্রথমে আমি যাঁর নাম করব, তিনি হলেন Dr. John Peter Wade. তাঁর 'An Account of Assam' বইখানি আধুনিক যুগে আসামের ওপর রচিত প্রথম ইতিহাস। তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই বইখানি রচনা করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত হবার পূর্ববর্তী যুগের আহোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস তাঁর এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। আদিযুগ থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত আসামের ইতিহাস আমরা এই বইতে পাই।

"ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় Dr. G. A. Grierson-এর উক্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'The Assamese are justly proud of their nat-

ional literature (History)···in which India is as a rule, curiously deficient. Remnants of historical works that treat of the time of Bhagadatta—a contemporary of the great Kuru-Panchala war of the Mahabharata are still in existence. The chain of historical authenticity can be relied upon. These historical works or Buranjis as they are styled in Assam, are numerous and voluminous···'

"এই বুরুঞ্জির কথা রাজপ্রাসাদের বাইরে বড় একটা কেউ জানতেন না। ডাক্তার ওয়েড প্রথম সেগুলির অনুবাদ করান। তাঁর 'An Account of Assam' হচ্ছে সেই অনুবাদ। কাজেই আসামের ইতিহাস বলার আগে আমাকে সেই ইতিহাসখানির ইতিহাস বলে নিতে হবে।"

"ইতিহাসের ইতিহাস?" প্রমথ থামতেই দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, জেঠু!" দক্ষিণাদাকে জেঠু বলে ডাকে। সে বলতে থাকে, "মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণে রাজধানী শিবসাগর হারিয়ে আহোমরাজ গৌরীনাথ সিংহ (১৭৮০-১৭৯৪ খ্রীঃ) লর্ড কর্নওয়ালিসের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কর্নওয়ালিস ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌শ-য়ের নেতৃত্বে এক বৃটিশবাহিনীকে আসামে পাঠান। ডাক্তার জন পিটার ওয়েড সেই সেনাবাহিনীর এ্যাসিস্ট্যান্ট্ সার্জেন বা চিকিৎসক হয়ে এসেছিলেন।···"

"চিকিৎসক?" দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ। একজন চিকিৎসকই আসামের প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম আবিষ্কারক।"

"অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ইতিহাস যাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ঐতিহাসিক ছিলেন না। তবে কর্নেল টড কিংবা স্যার এডওয়ার্ড গেইট-য়ের মতো তাঁরা প্রায় সকলেই শাসনকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।" দক্ষিণাদা যোগ করেন।

প্রমথ আবার শুরু করে, "প্রকৃতপক্ষে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের আগে আসাম বাইরের জগতের কাছে প্রায় অজানা ছিল। এ সম্পর্কে তৎকালীন বৃটিশ শাসকরা বলেছেন—'Assam was entirely unknown and inaccessible to Europeans and scarcely even visited by Bengalees. *The king scrupulously denied adm*ission to strangers of any description and country…'

"তবে কর্নওয়ালিসের সৈন্যরাই কিন্তু আসামের মাটিতে প্রথম য়ুরোপীয় নন।" রতনবাবু মাঝখান থেকে বলেন, "তাঁদের বহু আগে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে দুজন পর্তুগীজ জেস্যুইট মিশনারী পাণ্ডুতে এসেছিলেন।"

"তাঁদের নাম?" দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন।

রতনবাবু উত্তর দেন, "Father Stephen Cacella এবং Father John Cabral. তারা ২রা আগস্ট হুগলী থেকে রওনা হয়ে ১২ই আগস্ট ঢাকা পৌঁছান। আবার ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে নৌকোয় রওনা হয়ে ২৬শে সেপ্টেম্বর পাণ্ডুতে পৌঁছান। কয়েকদিন সেখানে থেকে কোচবিহার হয়ে স্থলপথে ভুটান চলে যান।"*

রতনবাবু থামতেই প্রমথ আবার আরম্ভ করে, "তাহলেও বৃটিশবাহিনী আসামে আসার পরেই বাইরের জগৎ প্রকৃতপক্ষে আসামের কথা জানতে পারে। আগেই বলেছি ডাক্তার ওয়েড বৃটিশবাহিনীর চিকিৎসক হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা তাকে একটা বড় করতে হত না। তাই ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌শ যখন আসামের শহরে ও গ্রামের রাজনৈতিক খবরাখবর দিতেন, তখন ডাক্তার ওয়েড আসামের অতীত কাহিনী সংগ্রহ করতেন। তিনি যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধৈর্যশীল। ফলে মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে তিনি আসামের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে অসমীয়া ভাষায় লিখিত একখানি আসামের

ইতিহাস ছিল। ঐ বইখানির অনুবাদ করে ১৮০০ সালে তিনি সেখানি লেঃ কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক-কে উপহার দেন। সেই পাণ্ডুলিপিতে ডাঃ ওয়েড-য়ের স্বাক্ষর ছিল।

"সম্ভবতঃ লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস পাঠাগারকে প্রাচ্যদেশীয় গবেষণা-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার পরে ঐ পাণ্ডুলিপি সেখানে নিয়েযাওয়া হয়। কিন্তু অনেকের ধারণা আটত্রিশ বছরের মধ্যে কেউ কখনও সে পাণ্ডু-লিপি পরীক্ষা করেন নি। ১৮৩৮সালে Montgomery Martin নামে জনৈক গবেষক প্রথম সেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করেন।

"কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপির কথা আসামের মানুষ প্রথম জানতে পারে ১৯১৮ সালে।"

"১৯১৮?" দক্ষিণাদা বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" প্রমথ উত্তর দেয়, "পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের ১১৮ বছর পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীবেণুধর শর্মা 'Geographical Sketch of Assam' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে জানতে পারেন, জনৈক ডাক্তার ওয়েড গৌরীনাথ সিংহের রাজত্বকাল নিয়ে একখানি বই লিখে প্রকাশের জন্য বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বইখানি প্রকাশিত হয় নি। তখন তিনি কল-কাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও আসাম সরকারের সাহায্যে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার থেকে ১৯২২ সালে বইখানি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন।

"বইখানি আসামে আসার পরে শ্রীশর্মা সবিস্ময়ে দেখেন যে তিনি যে-বই চেয়েছিলেন, এটি সে-বই নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য-বান ঐতিহাসিক দলিল। আসামের প্রামাণ্য প্রাচীন ইতিহাসের, চমৎ-কার ইংরেজী অনুবাদ। এইভাবে প্রায় সওয়া শ' বছর পরে আধুনিক কালে লিখিত আসামের প্রথম ইতিহাস আসামে এলো।"

"প্রথম ইতিহাস বলছ কেন?" রতনবাবু স্টীয়ারিং-য়ে হাত রেখে এক-বার আমাদের দিকে ফেরেন। তারপরে আবার সামনের দিকে মুখ করে বলেন, "তার আগেই তো স্যার এডওয়ার্ড গেইটয়ের 'A History of

Assam প্রকাশিত হয়েছে!"
"হ্যাঁ, ১৯০৫ সালে।" প্রমথ উত্তর দেয়। "আর মধুপুর টি এস্টেটের সাহায্যে শ্রীবেণুধর শর্মার সম্পাদনায় ওয়েড-য়ের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৭ সালে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি ওয়েড এই বই লেখা শেষ করেছিলেন ১৮০০ সালে। কাজেই বই পরে প্রকাশিত হলেও ওয়েডই আসামের প্রথম ইংরেজ ঐতিহাসিক।"
"গেইট নিশ্চয়ই ওয়েড-য়ের বই থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন।" প্রমথ থামতেই দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন।
"না।" প্রমথ বলে, "কারণ গেইট তাঁর ভূমিকায় বলেছেন মুসলমানদের আসার আগে ভারতীয়দের যখন ইতিহাস সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না, তখনও আসামের আহোম রাজাদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক জ্ঞান ছিল। তাই তাঁরা তাঁদের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়ে গিয়েছেন। এই বিবরণে ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত আসামের ইতিহাস রয়েছে।
"তা সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বৃটিশ অধিকারের আগে আসামের কথা জানতে পারে নি। কারণ মোগলরাও আসাম অধিকার করতে পারেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত স্বাধীন আসাম আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে ছিল। তাই বাইরের কেউ আসামের ইতিহাস জানতেন না। গেইট তাঁর ইতিহাসের প্রস্তাবনায় বলেছেন—'In the Histories of India as a whole, Assam is barely mentioned, and only ten lines are devoted to its annals in the historical portions of Hunter's "*Indian Empire*." The Only attempt at a connected history in English is the brief account given by Robinson—some 43 pages in all, in his "*Descriptive Accounts of Assam*" published in 1841."

"অবশ্য গেইট বলেছেন যে অসমীয়া ভাষায় আসামের দুখানি ইতিহাস ১৮৪৪ ও ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।" একবার থামে প্রমথ। তারপরে আবার বলে, "কাজেই মনে হয় গেইট তার ইতিহাস রচনার সময় ওয়েড-য়ের বইয়ের কথা জানতে পারেন নি। যদিও দুখানি ইতি-হাসেরই মূল-উৎস একই।"

"কি রকম?" দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন।

প্রমথ উত্তর দেয়, "সে-কথা পরে বলছি, আগে ডাক্তার ওয়েড-য়ের কথা বলে নিই।"

"বেশ বল।"

প্রমথ বলতে থাকে, শ্রীবেণুধর শর্মার ভূমিকা থেকে জানা যায় ডাক্তার ওয়েড মাসিক দেড় শ' টাকা মাইনেয় এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের কাজ নিয়ে ক্যাপ্টেন ওয়েল্শ-য়ের সঙ্গে আসামে এসেছিলেন। তিনি একজন পণ্ডিত ও প্রতিভাবান গবেষক ছিলেন। আসামের ইতিহাস ও ভূগোলের ওপরে রচিত তাঁর কয়েকটি গবেষণামূলক রচনা সেকালেই স্বীকৃতি লাভ করে।

"আসাম থেকে ফিরে যাবার পরেই ১৭৯৪ সালে তিনি সার্জন পদে উন্নীত হন। ১৭৯৭ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন। তাঁর লিখিত 'A Geographical Sketch of Assam' প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সরকারী ও বেসরকারী মহলের আসাম সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। Charles Stewart ১৮১৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'History of Bengal' বইতে একাধিক-বার ডাঃ ওয়েড-য়ের নাম উল্লেখ করেছেন।

"Annals of Oriental Literature লেখার সময় Dr. Hamilton ওয়েড-য়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৮২৪ সালের এশিয়াটিক জার্নাল থেকে জানা যায় ডাঃ ওয়েড ১৭৯৮ সালে দ্বিতীয়বার আসামে এসেছিলেন। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত গেজেটীয়ার-য়ে ওয়েডকে আসা-মের বিশেষজ্ঞ বলা হয়েছে।

"কেবল ইতিহাস কিংবা ভূগোল নয়, আসামের খনিজ ও কৃষি সম্পদ, মাটি ও জলবায়ুর ওপরেও তিনি বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তিনি ঐসব বিষয়ে একটি বিস্তৃত বিবরণ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য সেই বিবরণ তৈরি করার পরিশ্রম সইতে পারল না। ১৮০২ সালে আসামের এই অমর-প্রেমিক অমর-লোকে মহাপ্রস্থান করেন।"

একবার থামে প্রমথ। তারপরে অপেক্ষাকৃত ভারী স্বরে বলে, "কলকাতার পার্ক স্ট্রীট সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ রয়েছে। আজও নতমস্তকে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পাবেন লেখা আছে—'In memory of Dr. John Peter Wade. Died on 14 th October, 1802.'

গৌরীসাগর বাজারে কয়েক মিনিটের জন্য গাড়ি থামালেন রতনবাবু। এক গ্লাশ চা খেয়ে নিয়ে আবার রওনা হওয়া গেল। শিবসাগর এখনও ৯ মাইল। আমরা জোড়হাট থেকে ১৬ মাইল এসেছি।

গাড়ি ছাড়ার পরেই দক্ষিণাদা পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। প্রমথকে বললেন, "এবারে বলো, ডাক্তার ওয়েড-য়ের ইতিহাসে কি আছে?"

সহাস্যে উত্তর দেয় প্রমথ, "শিবসাগর পৌঁছবার মধ্যে তো সে ইতিহাস শেষ হবে না জেঠু! তার চেয়ে শিবসাগর থেকে ডিব্রুগড় যাবার পথে রতনদা আপনাদের কাছে আসামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলবেন।..."

"আমি!" রতনবাবু বিস্মিত।

প্রমথ শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, রতনদা আপনি। আমি জানি আসামের ইতিহাস খুব ভালো পড়া আছে আপনার। শিবসাগর থেকে ডিব্রুগড় যেতে আপনার অন্তত ঘন্টাদুয়েক সময় লাগবে। তার মধ্যে অনায়াসে আসামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনি বলে দিতে পারবেন। আমি বরং অন্য কথা বলছি।"

রতনবাবু আর কোনো প্রতিবাদ করেন না। তিনি নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে থাকেন।

প্রমথ শুরু করে, "১৮০০ সালের ২০শে মার্চ কিশেনগঞ্জ থেকে লেখা একখানি চিঠিতে ডাক্তার ওয়েড লেঃ কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক-কে লিখেছেন—আসামের আদি ইতিহাস রয়েছে দুটি ভাষায়। প্রথমটি 'বাইলুংঘ' (Bailoongh) অথবা আহোম রাজবংশের প্রাচীন ভাষায়, আর দ্বিতীয়টি 'ভাখা' (Bhakha) অর্থাৎ তৎকালীন বাংলা ভাষায়।

"বাইলুংঘ ইতিহাসখানি অদ্ভুত। কারণ সেটি কাপড়ের ওপরে লেখা এবং এমন ভাষায় লেখা যা তৎকালীন অসমীয়া এবং বাঙালী পণ্ডিতরাও পড়তে পারতেন না। কেবল আহোম রাজাদের এক মন্ত্রীপরিবার পুরুষানুক্রমে সেই ভাষার ব্যবহার জানতেন। তাঁদের সাহায্যেই ওয়েড সেই ইতিহাসের অনুবাদ করেছিলেন। মূল-পুঁথিখানি ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌শ আসাম থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"একটা কথা।" রতনবাবুর কথায় প্রমথর কথা থামাতে হয়। রতনবাবু বলেন, "ওয়েড সেই প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'Written on cotton cloth' অথচ গেইট বলেছেন—'Written on oblong strips of bark.' 'বার্ক' মানে তো বল্কল, গাছের ছাল?"

"হ্যাঁ। গেইট বলেছেন—আহোমদের অত্যন্ত উন্নতমানের ঐতিহাসিক জ্ঞান বা দক্ষতা ছিল। রাজা, তাঁর পুরোহিত ও অন্যান্য শিক্ষিত পরিবারদের নিজস্ব বুরুঞ্জি থাকত। তাঁরা কিছুদিন বাদে বাদে সেগুলিতে নতুন তথ্য সংবলিত করতেন। গেইটের ভাষায়—'periodically brought up to date."

"বুরুঞ্জি কি?"

"ইতিহাস। গেইটের ভাষায়—'*Buranji* is one of the very few Assamese words which are derived from the Ahom. The literal meaning is a store that teaches the ignorant *Bu*, ignorant persons, *ran* teach and *i* store or granary.'

গেইট বলেছেন এই বুরুঞ্জিগুলো যুগের পর যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত ও সংবর্ধিত হয়েছে এবং এগুলোর সংখ্যা অনেক। তিনি ৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বুরুঞ্জি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে আহোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুকাফার (১২২৮–১২৬৮ খ্রীঃ) আগের বুরুঞ্জিগুলোকে ঠিক ইতিহাস বলা উচিত নয়, কিন্তু পরেরগুলো খুবই বিশ্বাসযোগ্য।

"আগের বুরুঞ্জিগুলো আহোম ভাষায় লিখিত।" আর শেষেরগুলো অসমীয়া ভাষায় লিখিত।"

"তাহলে কি আহোম এবং অসমীয়া একভাষা নয়?"

"না, না। একেবারে আলাদা ভাষা।" একটু থেমে প্রমথ বলতে থাকে, "আপনারা জানেন যে এই রাজ্যের পূর্বদিকে পাটকৈ গিরিশ্রেণী। সেই পাহাড় পেরিয়ে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার পঙ রাজ্য থেকে শান উপজাতীয় নেতা সুকাফা পূর্ব-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উপনীত হন। তিনিই আহোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সুকাফার মাতৃভাষা ছিল আহোম। আহোম অক্ষর অনেকটা পালির মতো। পরবর্তীকালে আহোম রাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা মাগধী প্রাকৃত আর্যভাষা বলতে থাকেন। তারই বর্তমান রূপ অসমীয়া ভাষা।

'আগেই বলেছি এডওয়ার্ড গেইটের ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৫ সালে। তিনি তখুনি দেখেছেন, দেওধাই বংশীয় পুরোহিতদের কয়েকজন বৃদ্ধ শুধু আহোম ভাষা পড়তে পারেন। তাঁদেরই সাহায্যে শ্রীগোলাপচন্দ্র বরুয়া নামে লখিমপুরের জনৈক রাজকর্মচারী তিনবছর বসে গেইটকে আহোম বুরুঞ্জিগুলোর ইংরেজী অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

"আহোম রাজ্যের মানুষদের আহোম ভাষা ভুলে যাবার জন্য গেইট খুবই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—'...the rising generation has been taught Assamese and not Ahom, and in a few years the knowledge of the latter language will have disappeared altogether.' বলা বাহুল্য গেইটের সে আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত।"

১৫

"শিবসাগর এসে গেছে।"

রতনবাবুর কথায় প্রমথ থামে। তাড়াতাড়ি বাইরে তাকাই। হ্যাঁ, পথের বাঁদিকে লোকালয়। ঘড়ি দেখি—বেলা এগারোটা। তার মানে জোড়হাট থেকে শিবসাগর আসতে আমাদের একঘন্টার একটু বেশি লেগেছে। গল্প করতে করতে এসেছি। রতনবাবু আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়েছেন।

ডানদিকে ইসারা করে প্রমথ বলে, "আমরা তো প্রথম ওখানে যাবো, তাই না রতনদা?"

"হ্যাঁ, তলাতল ঘরে।"

তাকিয়ে দেখি—খানিকটা দূরে মাঠের মাঝে একটি ভাঙা বাড়ি, একটা কাঁচা রাস্তা গিয়ে সেই বাড়ির সামনে শেষ হয়েছে।

রতনবাবু গাড়ি ঘুরিয়ে বলেন, "তলাতল ঘর মানে বহুতল বাড়ি। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রাজেশ্বর সিংহ এই সাততলা প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। এ জায়গাটার নাম রংপুর। গড়গাঁও থেকে রাজধানী এখানে নিয়ে আসা হয়।

"এই প্রাসাদের তিনটি তলা নাকি রয়েছে মাটির নিচে। শেষের তলাটি থেকে একটি সুড়ঙ্গপথ দিয়ে দিখৌ নদীর তীরে পৌঁছন যেতো।"

গাড়ি থামালেন রতনবাবু। গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে আমরা প্রাসাদে পৌঁছলাম। এখন চারিদিক ঝোপঝাড়ে বোঝাই পতিত জমি। কিন্তু সেকালে গোঁসাইঘর, শিবমন্দির ও বুড়িগোহানী দেবালয় প্রভৃতি ছিল। রাজারা নিয়মিত সেইসব মন্দিরের নির্মাল্য গ্রহণ করতেন! মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহী ও বর্মী হানাদারদের কবলে পড়ে মন্দিরগুলি

ধ্বংস হয়ে গেছে।

মূল-প্রাসাদের পাশে আরও কয়েকখানি অর্ধভগ্ন ঘর। কোনোটি চৌকো, কোনোটি গোল গম্বুজাকৃতি। সিঁড়ি বেয়ে মূল-প্রাসাদে উঠে আসি। নিচের তিনতলার কথা বলতে পারব না। কারণ আলো ছাড়া সেখানে নামা সম্ভব নয়। ওপরে মাত্র দুটি তলা অক্ষত রয়েছে—তাও অংশ-বিশেষ। ছোট-ছোট দরজা, সরু সিঁড়ি ও উঁচু ধাপ। পাতলা ইঁটের তৈরি বাড়ি।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি, বারান্দায় পায়চারি করি। আর ভাবি—সেকালে আসামের সঙ্গে দিল্লী-আগ্রার রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু আসামের স্থাপত্যের সঙ্গে উত্তর-ভারতের স্থাপত্যকলা সম্পর্কহীন নয়। নইলে রংপুরের এই প্রাসাদ দেখে আমার দিল্লী কিংবা আগ্রা দুর্গের কথা মনে পড়বে কেন?

ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখি।

পাশেই প্রকাণ্ড এক জলাশয়। জিজ্ঞেস করি, "ওটা কোন্ সাগর?"

রতনবাবু উত্তর দেন, "জয়সাগর! এখন মজে গিয়েছে, নইলে এটি আকারে শিবসাগরের চেয়ে বড়। অথচ মহারাজা রুদ্র সিংহ তাঁর মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য মাত্র ৪৫ দিনে খনন করিয়েছেন এই সুবিশাল জলাশয়। এর সঙ্গে তাঁর মা সতী-জয়মতীর অবিস্মরণীয় পতিভক্তি ও আত্মত্যাগের কাহিনী রয়েছে জড়িয়ে।"

"কি সে কাহিনী?"

"সে এক আদর্শ পাতিব্রত্যের ইতিহাস। আর আসামের মানুষ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সেই ইতিহাস।" একবার থেমে একটু ভেবে নেন রতনবাবু। তারপরে বলতে থাকেন, "তখন সিংহাসনকে কেন্দ্র করে আহোম রাজপরিবারের পারিবারিক কলহ চরমে পৌঁচেছে। ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীরা সুলিকফা নামে জনৈক অস্থিরচিত্ত তরুণকে সিংহাসনে বসিয়েছেন।

"সুলিক্‌ফা জানতেন, শরীরের কোনো অঙ্গহানি হলে সে আর আহোম

সিংহাসনে বসতে পারে না। তাই তিনি সিংহাসনের দাবীদারদের অঙ্গ-হানি করতে শুরু করলেন।"

"মানে?"

"কারও একটা হাত কেটে ফেললেন, কারও কান কেটে দিলেন কার-বা ওরা চোখ নষ্ট করলেন। রুদ্র সিংহের বাবা গদাধর সিংহও সিংহাসনের একজন দাবীদার কাজেই তাঁর স্ত্রী জয়মতী তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। কথাটা সুলিক্‌ফার কানে এলো। তিনি জয়মতীকে বন্দী করলেন। তাঁর কাছে পলাতক গদাধরের হদিশ জানতে চাইলেন। সতী-জয়মতী নীরবে সেই পাষণ্ডের সকল অত্যাচার সইলেন, কিন্তু শত্রুকে স্বামীর ঠিকানা জানালেন না। আর এজন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হল।

"জয়মতীকে যেখানে হত্যা করা হয়, তাঁর সুযোগ্য পুত্র রুদ্র সিংহ ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, সেখানেই খনন করিয়েছেন এই জলাশয়। সরোবরের তীরে ঐ যে বড় মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছেন ওটিও তিনি ১৭০০ সালে একই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন। মন্দিরটির নাম জয়-দ'ল। ওখানে আরও চারটি মন্দির আছে। পাঁচটি মন্দিরকে পঞ্চদেবতা অর্থাৎ বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, বিশ্বনাথ ও মহাদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। আর এই সব কিছুর সঙ্গেই মিশে আছে সতী-জয়মতীর অক্ষয় স্মৃতি।"

গাড়ি এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে। আগেই বলেছি পথের দুদিকেই ঝোপঝাড় ও উন্মুক্ত প্রান্তর। রতনবাবু তারই মাঝে ডানদিকে ভাঙা দেওয়াল ঘেরা একটি ভাঙা বাড়ি দেখিয়ে বলেন, "ওটা হচ্ছে রং-ঘর। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রমত্ত সিংহ ওটি নির্মাণ করেছেন। প্রমত্ত সিংহ মহারাজা শিব সিংহের ভাই। তিনি ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং সাত বছর রাজত্ব করেন।"

"কিন্তু রং-ঘরটা কি?" দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।

রতনবাবু বলেন, "রঙ্গালয় অর্থাৎ 'amphitheatre.' রাজারা ওখানে হাতি কিংবা ষাঁড়ের লড়াই অথবা কুস্তি দেখতেন। অনেক সময় ওখানে

সম্মানিত অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হত, কখনও বা যাত্নবিদ্যা কিংবা গানের আসর বসত।"

বড় রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে শিবসাগরের দিকে।

আমরা শহরে পৌঁছে গিয়েছি। এখন পথের ত্নদিকেই বাড়ি-ঘর।

আমি কিন্তু এসব বাড়ি-ঘর দেখছি না। এখনও তলাতল ও রং-ঘরের কথাই ভেবে চলেছি। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে রংপুরের এই রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'It is a building of irregular shape, consisting of a long flight of rooms running from east to west, with several smaller wings in its northern and southern side. The lower storey apparently served principally as stables, store-rooms, servants quarters, etc. while the royal appartments were located in the upper storey, which has now disappeared for the greater part···It has a stair leading up to the terrace, and the anteroom is covered by a vaulted roof···The area within which the palace stands is surrounded by a wall, which is approximately two miles in circumference···'

আজকের তলাতল ঘরের সঙ্গে অবশ্য এ বর্ণনার মিল খুব সামান্যই। দেওয়ালটা প্রায় সবই ভেঙে গিয়েছে।

ঐ একই গেজেটীয়ারে রংঘর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'It is the best preserved ruin of the ancient Ahom capital, Its shape is octagonal, but the northern and western sides are much longer···with three large and two small openings. The building has two storeys·· the western chamber is occupied by the stairs leading to the upper storey, outside a gap is left in the staircase, sufficient

to allow an elephant standing between it. A person mounted on an elephant thus could ascend the steps ···from the back of his elephant, without dismounting first···'

বলাবাহুল্য চুয়াত্তর বছরের অযত্নে সেই ধ্বংসাবশেষও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর তাই রতনবাবু আমাদের সেটি না দেখিয়েই এগিয়ে চলেছেন শিবসাগরের দিকে।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারে শিবসাগর শহর সম্পর্কে বলা হয়েছে—'Head quarters of the District ·· situated in 26·59′ N. and 94·38 E. on the right bank of Dikho river. It' lies on the trunk road along the south bank of the Brahmaputra, and is connected by road with the railway ··'

ঐ গেজেটীয়ারে বলা হয়েছে, ১৯০১ সালে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ৫,৭১২ জন। আর ১৯৭১ সালে শিবসাগর শহরের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭,৪২৬ জন। তাঁদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১১,১৪৮ জন। ৫,২৯৬টি বাড়িতে ৫৩০৭টি পরিবার বাস করেন এই শহরে।

১৯০৯ সালেও এখানে একটি হাসপাতাল এবং জেল ছিল। তখুনি জেলাসদর জোড়হাটে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। *

শিবসাগর সুপ্রাচীন জনপদ, প্রাক্তন রাজধানী। শিবসাগর সুবিরাট দীঘি, প্রখ্যাত তীর্থ। দীঘির নামেই শহরের নাম হয়েছে। কেউ বলেন দীঘির নাম হয়েছে মহারাজা শিব সিংহের নাম থেকে। আবার কেউ বা বলেন, রাণী অম্বিকা (অনেকের মতে মদাম্বিকা) ১৭৩৪ সনে এই দীঘি খনন করে জগৎসংহর্তা শিবকে উৎসর্গ করেন। নাম রাখেন শিব-সাগর। খনন করতে প্রায় একবছর সময় লেগেছিল। রাণী অম্বিকা

ছিলেন মহারাণী ফুলেশ্বরীর ছোট বোন। ফুলেশ্বরীর মৃত্যুর পরে শিব সিংহ তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

শহরের ভেতর দিয়ে কয়েক মিনিট চলে আমরা শিবসাগরের তীরে পৌছলাম। একটা বড় গাছের ছায়ায় রতনবাবু গাড়ি থামালেন। আগে এখানকার নাম ছিল কলঙ্কুপার।

আমরা জোড়হাট থেকে গাড়িতে শিবসাগর এসেছি। প্রমথও বাস-য়ে করে জোড়হাট ফিরে যাবে। কিন্তু ইচ্ছে করলে রেলে চড়েও আসা যায় শিবসাগর। মরিয়ানী-তিনশুকিয়া রেলপথের সিমালুগুড়ি জংশন থেকে একটি লাইন প্রসারিত হয়েছে মোরাণহাট পর্যন্ত। সেই রেল-পথে সিমালুগুড়ির পরের স্টেশন শিবসাগর। দূরত্ব মাত্র দশ মাইলের মতো।

পথ থেকে কয়েক ধাঁপ সিঁড়ি বেয়ে শিবসাগরের তীরে উঠে আসি সামনেই মন্দির--মুক্তিনাথ শিব-দ'ল।

দক্ষিণাদা ও রতনবাবু এগিয়ে যান মন্দিরের দিকে। আমি ও প্রমথ এসে দাঁড়াই সাইনবোর্ডটির সামনে। পকেট থেকে ডায়েরী বের করি। আমার লেখার সুবিধার জন্য প্রমথ পড়ে যায়—"Sibdol, Sibsagar (1734 A.D). The last and biggest Hindu temple in Assam both in height and size, enshrine a Linga, stands on the bank of Sibsagar tank between two other temples—the *Debidol* with an image of Durga on its north and *Vishnudol* on its south. The three temples are said to have been built in 1734 A.D. by Rani Ambika…'

লেখা হয়ে যাবার পরে সেই পথ দিয়ে প্রমথর সঙ্গে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। দক্ষিণাদারা দর্শন করে ফিরে চলেছেন। রতনবাবু বলেন, "আমরা গাড়িতে বসছি, আপনি আসুন।"

মাঝারী আকারের সুন্দর মন্দির। প্রথমে একটি কাঠ ও টিনের দেওয়া-

লহীন দোচালা—নামঘর, তারপরে নাট-মন্দির। মন্দিরটি কিন্তু বেশ বড় এবং উঁচু। পরিধি ১৯৫ ফুট আর উচ্চতা ১২৮ ফুট। মূল-চূড়ার চারপাশে খানিকটা নিচে চারটি ছোট-চূড়া। গম্বুজাকৃতি মন্দির শীর্ষ। অনেকে বলেন গম্বুজটি নিরেট গালার ওপরে এক ইঞ্চি পুরু সোনার প্রলেপ দিয়ে তৈরি। তাই ১৮১৬-২১ সালের মধ্যে বর্মী আক্রমণকারীরা কয়েকবার কামানের গোলা মেরে গম্বুজটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছে। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। কিন্তু গম্বুজটি আজও গোলার চিহ্ন গায়ে নিয়ে সেই বর্মী পৈশাচিকতার সাক্ষী হয়ে আছে।

একটি নয়, পর পর দুটি নাট-মন্দির। প্রচুর পায়রা রয়েছে দেখছি।

আমরা নাট-মন্দির ছাড়িয়ে গর্ভ-মন্দিরে আসি। ভেতরটা অন্ধকার। অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলছে বটে, কিন্তু অন্ধকার দূর হয় নি। প্রথমেই শ্বেতপাথরের নন্দীমূর্তি। তারপরে মন্দিরের ঠিক মাঝখানে ছোট একটি কুণ্ডের ভেতরে শিবলিঙ্গ—মুক্তিনাথ। মাথার ওপরে রুপোর ছত্র ও কলস। কলস থেকে দুধ পড়ছে মহাদেবের মাথায়।

আমরা প্রণাম করি—দেবাদিদেব মহাদেব, শিবসাগরের মুক্তিনাথকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করি। তাঁকে প্রদক্ষিণ করি। কামনা করি—হে ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ! তোমাকে অবলম্বন করে একদিন এদেশে আর্য ও অনার্যের মহামিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হে মহেশ্বর, হে করুণাময়-কেদার-নাথ! তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো। তোমার কৃপায় আমরা যেন আবার ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারি।

দর্শন শেষে এসে দাঁড়াই শিবসাগরের তীরে। তিনদিকে লোকালয়, একদিকে মন্দির। সারা শিবসাগরকে ছবির মতো দেখাচ্ছে এখান থেকে। আর সে ছবি শুধু মাটিতে নয়, জলেও। শিবসাগরের শান্ত ও স্বচ্ছ জলে মন্দির ও লোকালয়ের প্রতিবিম্ব পড়েছে। আমার সে দূরদৃষ্টি নেই। থাকলে দেখতে পেতাম কেবল বর্তমানের নয়, আসামের গৌরব-ময় অতীতের স্মৃতিও বুকে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিবসাগর।

আমাদের পুবে বিষ্ণু-দ'ল, পশ্চিমে দেবী-দ'ল। তাঁদেরও গড়ন শিব-

দ'লের মতো, তবে আকারে ছোট। প্রমথ বলে, "ঐ মন্দির দুটির আকার একই। পরিধি ১২০ ফুট আর উচ্চতা মাত্র ৬০ ফুটের মতো।"
এই তিনটি মন্দিরের সহাবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীহেম বরুয়া লিখেছেন—'it would be wrong to divide Assam into zones on the basis of religious compartmentalism; things overlap here. The juxtapsition of the three doles (temples) dedicated respectively to Siva, Vishnu and Devi on the bank of Sibsagar is expressive of the spirit that actuates religious life here; this spirit is a spirit of spiritual co-existence with *animus* towards none ..."
আমরা ফিরে চলি। চলতে চলতে প্রমথ বলে, "শিব-দ'লের প্রধান উৎসব শিবরাত্রি। সেদিন বেশ বড় মেলা বসে এখানে। দেবীদ'লে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হয়। তবে সেখানে দশভূজার কোনো বড় মূর্তি নেই। পুজোর আগে মাটির প্রতিমা তৈরি করা হয়। আর বিষ্ণুদ'লের শ্রেষ্ঠ উৎসব রথযাত্রা। খুব ধুমধামের সঙ্গে রথ টানা হয়। তখনও এখানে বড় মেলা বসে।"
একবার থামে প্রমথ। তারপরে আবার বলে, "শিবসাগরের চারিদিকে আরও অনেক দর্শন আছে। আপনাদের সময় নেই, নইলে সব দেখিয়ে দিতাম।"
"দেখাতে যখন পারলে না, তখন মুখে বল। অন্তত দ্রষ্টব্য স্থলগুলোর নাম জেনে যাই।"
প্রমথ বলতে শুরু করে, "শিবসাগরের নিকটবর্তী দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে প্রথমেই সরাইদেওর নাম বলতে হয়।
"আপনি এখান থেকে আহোমদের প্রথম রাজধানী প্রাচীন নগরী সরাইদেও দেখতে যেতে পারেন। দূরত্ব ১৮ মাইল।
যেতে পারেন মহারাজা রাজেশ্বর সিংহ নির্মিত সাত-তলা গড়গাঁও দুর্গ

ও কারেংঘর দেখতে। গড়গাঁও এখান থেকে মাত্র ৬ মাইল। আপনারা যেতে পারেন রুদ্রসাগর ও গৌরীসাগরে। কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে শাক্তধর্ম গ্রহণ করার পরে রাণী ফুলেশ্বরী গৌরীসাগর খনন করান।

"এছাড়া এ অঞ্চলে অসংখ্য মন্দির ও থান-সত্র আছে। সব কয়টি দর্শন করতে হলে আপনাকে বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে এখানে।"

রতনবাবু হর্ন দিচ্ছেন। আর দেরি করা উচিত হবে না। প্রমথর একখানি হাত হাতে নিয়ে বলি, "এখন তাহলে এবারের মতো বিদায় দাও ভাই! কথা দিচ্ছি, এ বিদায় চিরবিদায় নয়। আবার আমি আসব আসামে, আসব তোমাদের কাছে।"

মুহূর্তে প্রমথর হাসিমাখা মুখখানি গম্ভীর হয়ে যায়, তার চোখদুটি জলে ভরে ওঠে। নিঃশব্দে নত হয়ে সে প্রণাম করে আমাকে।

উঠে দাঁড়াতেই আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। এ্যাডভোকেট প্রমথ অবুঝ শিশুর মতো কেঁদে ফেলে। আমারও চোখদুটি অশ্রুসিক্ত।

একটু বাদে যথাসম্ভব অবিকৃত কণ্ঠে ডাক দিই, "প্রমথ!" বলি "রতনবাবু, হর্ন দিচ্ছেন।"

"হ্যাঁ।" সে-ও সামলে নেয় নিজেকে। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ মুছে বলে, "দাদা! আপনি সবার মন জয় করে গেলেন, এতে আমার গৌরব সবচেয়ে বেশি। কারণ কমিটির মিটিং-য়ে আমিই প্রথম আপনাকে নিমন্ত্রণ পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলাম। অনেকেই সেদিন বলেছিলেন, আপনি আসবেন না। কিন্তু কেন যেন আমার মন বলেছিল, আপনি আসবেন।

"আপনি এসেছেন। চারদিন আমি আপনার সান্নিধ্য লাভ করেছি। এর প্রতিক্রিয়া আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু বিদায় বেলায় এইটুকু বলে নিই—এ আমার ক্ষুদ্র জীবনের চরম পাওয়া। আপনার স্নেহে আমার জীবন ধন্য হল।"

প্রমথকে শিবসাগর বাসস্ট্যাণ্ডে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম ডিব্রু-গড়ের দিকে। উত্তর-পূর্বে পথ চলেছি। একই পথ—এন এইচ. থার্টি-সেভেন।

রতনবাবু একই গতিতে গাড়ি চালিয়েছেন। দিব্যি গল্প করতে করতে পথ চলেছেন। দেখে মনে হচ্ছে না তাঁর কোনো কষ্ট হচ্ছে। তেমনি কষ্ট হচ্ছে না আমাদের।

মনে মনে রতনবাবুর কথাই ভাবছিলাম। তাঁর জন্ম বহরমপুরে। ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী। এখন সেখানেই তাঁদের বাড়ি। আদি নিবাস ছিল ঢাকার বারদীতে। রতনবাবু সেখানকার বিখ্যাত নাগচৌধুরী পরি-বারের ছেলে।

রতনবাবুর পিতামহ শম্ভুচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতের প্রথম এম. এ.। পিতা সুরেশচন্দ্র কৃতী পদার্থ বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহকারী ও সহযোগী। পিতৃব্য অধ্যাপক ভূপেশচন্দ্র ছিলেন অনুশীলন সমিতির একজন প্রধান সংগঠক। বিপ্লবী সূর্য সেন ও যতীন বাগচী প্রভৃতি তাঁর ছাত্র ছিলেন।

রতনবাবুরা পাঁচ ভাই ও দু বোন। রতনবাবু সবার ছোট। আড়াই বছর বয়সে পিতৃহীন হন। মায়ের সুশিক্ষায় মেধাবী রতনবাবুর ছাত্র-জীবন গৌরবময়। তিনি বহু পদক পেয়েছেন, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি-বিজ্ঞানের স্নাতক হয়েছেন। সেই সূত্রে বড় চাকরি করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি একজন দার্শনিক। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের মূল নীতি—কর্ম ও উপাসনা, সংসারে থেকেও নিস্পৃহতার নৈষ্ঠিক সাধন।

আমার কাছে রতনবাবুর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি হিমালয়-প্রেমিক। তিনি গোমুখী ও বদ্রীনাথ দর্শন করেছেন।

না, রতনবাবুর জন্যই রতনবাবুর ভাবনা থামাতে হল। দক্ষিণাদার তাগিদে শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে শুরু করলেন, "আপনারা জানেন, আসামের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছে

বৃটিশ আমলে. তাহলেও আর্যাবর্তের মানুষ এ রাজ্যের কথা জানতেন বৈকি। এর আমরা প্রথম প্রমাণ পাই রামায়ণে। সীতা অপহরণের পরে সুগ্রীব বিনত নামে যূথপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—তুমি শত সহস্র বানর সঙ্গে নিয়ে পূর্বদিকে গিয়ে সীতা ও রাবণের অন্বেষণ কর। এই পূর্বদিকের প্রসঙ্গে তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উল্লেখ করেছিলেন। কবি কৃত্তিবাসের ভাষায়—

'ব্রহ্মপুত্র তরি রঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দর পর্বতে যাইও কিরাতের দেশ॥'

একবার থামেন রতনবাবু। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "তবে আসাম নামটি মোটেই পুরনো নয়। মহাভারতের যুগে এ রাজ্যের নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষ। মহাপরাক্রমশালী নরক ছিলেন সেই রাজ্যের রাজা। তাঁর কথা রয়েছে মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে। নরকের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র মহাবীর ভগদত্ত এই রাজ্যের রাজা হন। কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে তিনি কৌরবদের দলে যোগ দিয়েছিলেন।..."

"ওকি! থামলেন কেন?" রতনবাবু থামতেই বলে উঠি।

"ভগদত্তের কাহিনীটি আপনি বলুন মহারাজ! আমি ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরাই।"

অতএব আমাকেই শুরু করতে হয়, "মহাভারতে ভগদত্তের বীরত্ব ও শক্তির কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে দ্রোণপর্বের ২৯ অধ্যায়ে। যুদ্ধের দ্বাদশ দিবসে অর্জুন সুশর্মার ভাইদের নিহত করলেন। তখন প্রাগ-জ্যোতিষেশ্বর মহাবীর ভগদত্ত হাতির পিঠে চড়ে ছুটে এলেন অর্জুনের সামনে। তিনি অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। অর্জুনের শরাঘাতে তাঁর হাতির বর্ম ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ক্রুদ্ধ ভগদত্ত তখন মন্ত্রপাঠের পরে অর্জুনের বক্ষদেশ লক্ষ্য করে বৈষ্ণব-অঙ্কুশ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদ গণলেন। তিনি জানতেন সেই চরম অস্ত্র সইবার শক্তি নেই ধনঞ্জয়ের। তাই তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অর্জুনকে আড়াল

করে দাঁড়ালেন, নিজের বুকে বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করলেন। বিষ্ণুর বুকে বেঁধে বৈষ্ণবাস্ত্র বৈজয়ন্তী মালায় রূপান্তরিত হল। পার্থসারথি পার্থের জীবনরক্ষা করলেন।"

"তাছাড়া মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের কথা বলা হয়েছে।" আমি থামতেই দক্ষিণাদা যোগ করেন।

আমি মাথা নাড়ি। দক্ষিণাদা আবার বলেন, "মণিপুর, চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহনের কাহিনী থেকেও বোঝা যায়, সেকালে এরাজ্যের সঙ্গে আর্যাবর্তের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। যাক্ গে, এবারে রতন আসামের ইতিহাস বলো।"

রতনবাবু শুরু করেন, "রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপের কথা থাকলেও, আহোমদের পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। মহাভারতের যুগে আসাম অসুর রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। নরকাসুর এই বংশের রাজা। তাঁর পরে এই বংশের আরও উনিশজন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। শেষ রাজার নাম সুবাহু।

"কথিত আছে বর্তমান সদিয়ার কাছে সেকালে বিদর্ভ নামে এক রাজ্য ছিল। রুক্মিণীর বাবা ভীষ্মক নাকি সেই রাজ্যেরই রাজা ছিলেন। কোথায় দ্বারকা আর কোথায় সদিয়া···"

সত্যই তাই। আমি ভেবে চলি—দ্বারকার কৃষ্ণ সদিয়ার রুক্মিণীকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। আর সাহিত্য পরিক্রমার পথে আমিও তো দ্বারকা থেকে জোড়হাটে এসেছি, 'মন-দ্বারকায়' লেখার পরে 'অমরাবতী-আসাম' লিখছি।

'খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে আসামের ইতিহাস মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য।" আবার রতনবাবুর কথায় মনোনিবেশ করি। তিনি বলে চলেছেন, "পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (৪৩০-৬৬৩ খ্রীঃ) বর্মণ বংশীয় রাজারা আসামে রাজত্ব করতেন। ৬৬৪ থেকে ৭৩৯ কিংবা ৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসাম স্তম্ভ বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। তারপরে ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন বংশের রাজারা রাজত্ব করেছেন এখানে।

১০০০ থেকে প্রায় ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসাম পাল বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। তাঁদের পরে দেব বংশীয় রাজারা আসাম শাসন করতে থাকেন।

"এই সময়েই সুকাফার নেতৃত্বে আহোমরা আসামে আসেন। আহোমরা তাই (Tai) অথবা 'শান' (shan) উপজাতীয়দের বংশধর। তাঁরা উচ্চ-ব্রহ্ম এবং পশ্চিম-য়ুনান (Yunnan) প্রদেশের অধিবাসী। তাঁদের রাজ্যের নাম ছিল পঙ বা পাংনা। ইরাবতীর উচ্চ-উপত্যকায় এই নামে এখনও একটি জায়গা আছে। তাঁরা নিজেদের 'তাই' অর্থাৎ দেবতার বংশধর বলে পরিচয় দিতেন। আর এই কারণেই হয়তো পরবর্তীকালে আহোম রাজারা নামের আগে স্বর্গদেব লিখতে আরম্ভ করেন।

"কথিত আছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পঙের সিংহাসন নিয়ে গোলমাল শুরু হয়। সুকাফা ছিলেন সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার। কিন্তু তিনি গৃহবিবাদে সুবিধা করতে পারেন না। তাই নয় হাজার স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকাকে নিয়ে তাঁকে প্রায় তেরো বছর ইরাবতী উপত্যকা ও পাটকৌ পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়। অবশেষে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুকাফা একদিন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পাটকৈ গিরিশ্রেণী পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকায় উপনীত হলেন। তাঁর সঙ্গে দুটি হাতি ও তিনশ' ঘোড়া ছিল।

"তখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনেক পাহাড়ী জাতি বাস করতেন। তাঁরা একে একে সবাই সুকাফার অধীনতা স্বীকার করলেন। আর তারই ফলে আহোম সাম্রাজ্যের পত্তন হল।

"১২৬৮ সালে সুকাফা পরলোকে গমন করেন। তাঁর পুত্র সুতেফা সিংহাসনে বসেন। এইভাবে ১২২৮ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ছ'শ' দশ বছর ধরে আহোমরা এই রাজ্যে রাজত্ব করেছেন। তাঁদের শেষ রাজার নাম স্বর্গদেব পুরন্দর সিংহ।"

"কিন্তু"···রতনবাবু থামতেই দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন, "বৃটিশরা তো ১৮২৪

খ্রীষ্টাব্দে আসাম জয় করে। তুমি ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত আহোমরাজারা রাজত্ব করেছেন বলছ কেন?”
“আপনি ঠিকই বলেছেন।” রতনবাবু উত্তর দেন, “প্রকৃতপক্ষে ১৮২৪ সাল থেকেই আসামে বৃটিশ রাজত্বের শুরু কিন্তু তারপরেও কয়েক বছর মানে ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরন্দর সিংহ অনেকটা আশ্রিত রাজার মতো আপার-আসামে রাজত্ব করেছেন।”
একটু থেমে রতনবাবু আবার বলতে থাকেন, “আহোমযুগে রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল। কিন্তু পিতার পরে পুত্রই সব সময় রাজা হন নি। কখনও ভাই, কখনও বা দূর সম্পর্কীয় ভাইপোরা পর্যন্ত সিংহাসনে বসেছেন। রাজা নির্বাচনে রাজকর্মচারীদের একটা অধিকার ছিল। রাজ-দরবারে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজকর্মচারী ছিলেন বুড়াগোঁ-হাই, বরগোঁহাই ও বরপাত্রগোঁহাই। গোঁহাই পদ ছিল বংশানুক্রমিক। গোঁহাইদের পরেই ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন বরবরুয়া ও বরফুকণ। তাঁরা যথাক্রমে রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ শাসন করতেন। এই পদ দুটি কিন্তু বংশানুক্রমিক ছিল না!”
“আচ্ছা।” দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন, “আহোমদের পতনের প্রধান কারণ কি?”
“একটি নয়, অন্তত চারটি।” রতনবাবু উত্তর দেন।
“কি, কি?”
“রুদ্র সিংহের পরবর্তী রাজারা প্রায় প্রত্যেকেই অলস ও আরামপ্রিয় ছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভ্রান্ত আভিজাত্যবোধ ও প্রজাপীড়ক প্রকৃতির জন্য তাঁরা জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন। বার বার মুসলমান আক্রমণ ও দীর্ঘস্থায়ী মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহে রাজশক্তি হয়ে পড়েছিল দুর্বল। অবশেষ বদনচন্দ্র বরফুকণের দেশদ্রোহীতা ও বর্মী আক্রমণের অনিবার্য পরিণতি হল আহোম সাম্রাজ্যের পতন।”
হঠাৎ চুপ করলেন রতনবাবু। তাকিয়ে দেখি একটা তে-রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামিয়েছেন তিনি। কয়েকটি ছোট ও মাঝারী দোকান আর

বাড়িঘর নিয়ে গঞ্জের মতো জায়গা। বাঁদিকের রাস্তাটাকে দেখিয়ে তিনি বলেন, "এই রাস্তা দেহিংঘাটে চলে গেল। এ জায়গাটার নাম দেমাউ। আমরা শিবসাগর থেকে ১২ মাইল এসেছি।"

চারিদিকটা ভালো করে দেখে নেবার পরে আগের রাস্তা ধরে আবার গাড়ি উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চলল। একটু বাদে রতনবাবু বলেন, "পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্।"

"নিশ্চয়ই।" দক্ষিণাদা বলে ওঠেন। "কিন্তু এবারে তুমি আসাম নামটি কেমন করে হলো, তাই বলে নাও আগে।"

রতনবাবু শুরু করেন, "আহোমরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নাম রাখেন মুংডুনসুনখাম (Mungdunsunkhan), অর্থাৎ সোনালী বাগানে ভরা দেশ। বিদেশীরা বহুকাল আসামকে ঐ নামেই অবহিত করেছেন।

"গবেষকদের মতে আহোমদের আগমনের বহু পরেও আসাম নামটি প্রচলিত হয়েছে। তাঁরা অনেকে বলেন, এই রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি অসমান। তাই বাংলার সমতল থেকে পৃথক করে বোঝাবার জন্য 'অসম' অর্থাৎ অসমতল শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। আবার কারও মতে—তৎকালীন বিজিত আদিবাসীরা বিজয়ী আহোমদের অতুলনীয় শক্তি বোঝাবার জন্য 'অসম' শব্দটির প্রচলন করেন।

"আবার কেউ বা বলেন—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আহোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত এই রাজ্যকে বলা হত সৌমার। কিন্তু তারপরে মুসলমান (মোগল) লেখকরা আহোমদের 'আসাম' নামে অবহিত করেন।

"ডক্টর বি. কাকতি বলছেন – '*Assam* might have come from *asama* which in its turn was the sanskritisation of *acham* meaning undefeated or unconquered.

"ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'The word Ahom··· is just an Indian modification of Burmese. *Rham*.*

---

* 'Assam in the Ahom Age' by Dr. Nirmal Kumar Basu.

থামলেন রতনবাবু। ষ্টিয়ারিং-য়ের ওপরে হাত রেখেই আবার একটা সিগারেট ধরালেন। আমি ও দক্ষিণাদা ও-রসে বঞ্চিত। সুতরাং তাঁকে আতিথেয়তা করতে হচ্ছে না।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রতনবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, "আগেই বলেছি, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে এই রাজ্যকে বলা হত প্রাগ-জ্যোতিষ। পরবর্তীকালে প্রাগজ্যোতিষ সাম্রাজ্যের সীমা বর্তমান ভারতের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল—চীন ও তিব্বতের কিছু অংশ এবং সমস্ত ভুটান প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"প্রাগজ্যোতিষের পরে এই রাজ্যের নাম হয় কামরূপ। তবে প্রথম-দিকে কিছুকাল দুটি নামই প্রচলিত ছিল। এলাহাবাদে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শিলালিপিতে প্রথম কামরূপ নামটি পাওয়া যায়। ঐ শিলালিপিটি ৩৬০ থেকে ৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহারাজা সমুদ্র গুপ্তের আমলে খোদিত। তখন কামরূপ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হলেও সম্ভবত কামরূপের রাজারা গুপ্তসম্রাটদের সমীহ করে চলতেন।

"মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রাগজোতিষ ও কামরূপ দুটি নামেরই উল্লেখ করেছেন। কালিকা পুরাণে এই দুটি নামের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়ান চোয়াঙ বলেছেন 'কিয়ামো-লিউ-পো' (*Kiamo-leu-po*) অর্থাৎ কামরূপ। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিবরণের অংশ বিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে। কারণ য়ুয়ান চোয়াঙের বর্ণনা থেকে আমরা সেকালের আসাম সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। তিনি বলেছেন, 'The climate is soft and temperate. The manners of the people are simple and honest. The men are of small stature and their complexion a dark yellow. Their language differs a little from that of mid-India. Their nature is very impetuous,·· their memories are retentive and they are earnest in study. The king is fond of learning and the people are so likewise in imitation of him. Men of high talent from

distant regions, seeking after office, visit his dominion *.

মোরাণহাট নামে একটা জায়গায় এসে আবার গাড়ি থামালেন রতন-বাবু। আমরা দেমাউ থেকে ১৫ মাইল এসেছি। এখান থেকে ডিব্রুগড় ২৩ মাইলের মতো। পথে পড়বে খোয়াং, মোরাণহাট থেকে মাইল সাতেক।

কয়েকমিনিট বিশ্রামের পরে গাড়ি ছাড়লেন। আমরা এখনও উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চলেছি। খোয়াং থেকে নাকি রাস্তাটা সোজা পূর্বমুখী হবে।

রতনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, আপনারা কি 'বোর' হয়ে যাচ্ছেন?"

"না, না।" দক্ষিণাদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন, "বিরক্ত বোধ করব কেন? এমন সুন্দর পথ, তার ওপরে তুমি তো আমাদের গল্পে ভুলিয়ে রেখেছো।"

"সুতরাং গল্পটাই শুরু করুন আবার।" আমি প্রস্তাব করি।

রতনবাবু বিনা প্রতিবাদে বলতে থাকেন, "আগেই বলেছি, কালিকা-পুরাণে প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপ এই দুটি নামেরই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। দুটি নামই একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অবশ্য সুলতান মাহ্‌মুদের সহযাত্রী সত্যদ্রষ্টা পর্যটক আল বিরুণি বলেছেন 'কামরূ'। তিনি তাঁর বিবরণে লিখেছেন—'Thence we came to mountains of *Kamru* which stretch away as far as the sea †'

"তেজপুরের কাছে পাওয়া একখানি শিলালিপি থেকে জানা যায়, কেবল গুপ্ত স্থাপত্যকলা নয়, নবম শতাব্দী থেকে আসামে গুপ্তাব্দের পর্যন্ত প্রচলন হয়েছিল।

"মহারাজা সুকাফা শিবসাগরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সরাইদিউ নামে

* 'The Land & People—Assam' by S. Barkataki.
† 'Introduction to Assam' by Dimbeswar Neog.

একটা জায়গায় প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। তারপরে রাজধানী হয় গড়গাঁও এবং রংপুর বা শিবসাগর আর অবশেষে জোড়হাট।"

আমরা মাথা নাড়ি। রতনবাবু বলতে থাকেন, "১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আসামে মুসলমান আক্রমণ শুরু হয়। বিশ ত্রিশ বছর বাদে বাদেই এক একটা নতুন হামলা হয়েছে। কিন্তু ১৬৬২ সালের আগে মুসলমানরা কোনো যুদ্ধে জয়ী হতে পারে নি। এটি ভারতের ইতিহাসে একটি তুলনাহীন নজির।

"১৬৬২ সালের সেই আক্রমণ ছিল মুসলমানদের পঞ্চদশ অভিযান। বাংলার মোগল রাজ্যপাল মীরজুমলা সেই আক্রমণের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৭ই মার্চ গড়গাঁও অধিকার করেন।

"কিন্তু অপরাজেয় আহোমদের গরিলা আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে মীরজুমলাকে শেষ পর্যন্ত আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের (১৬৪৮-১৬৬৩ খ্রীঃ) সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে আহোমদের অবশ্য গৌহাটিসহ লোয়ার-আসামের খানিকটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়। আর সেই সঙ্গে সম্রাটের জন্য উপঢৌকন পাঠাতে হয় কুড়ি হাজার তোলা সোনা, তার ছয় গুণ রূপা, চল্লিশটি হাতি ও একটি রাজকন্যে।"

"চমৎকার।" দক্ষিণাদা বলে ওঠেন, "এই একটা ব্যাপারে সম্রাটরা বড়ই উদার ছিলেন। গোয়ালিয়র কিংবা গড়গাঁও যেখান থেকেই রাজকন্যে নিয়ে যাওয়া যাক্, তাঁরা কখনও কোনো রকম বাছবিচার করেন নি, সস্নেহে হারেমে ঠাঁই দিয়েছেন।"

হাসি থামার পরে রতনবাবু আবার আরম্ভ করেন, "ভগ্নহৃদয় জয়ধ্বজ পরের বছরই প্রাণত্যাগ করেন। চক্রধ্বজ সিংহ (১৬৬৩-১৬৬৯ খ্রীঃ) সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি লাছিত বরফুকণের সাহায্যে আহোম সেনাবাহিনীকে নতুন ভাবে সংগঠিত করে তুললেন। ১৬৬৭ সালে অগাস্ট মাসে বরফুকণ গৌহাটি আক্রমণ করলেন। তাঁরা মোগল থানাদার সৈয়দ ফিরোজ খানকে দু-মাস অবরোধ করে রাখলেন। অবশেষে মোগলরা অধীনতা স্বীকার করল। লাছিত গৌহাটি ও পাণ্ডু

অধিকার করলেন। বহু মোগল সৈন্য বন্দী হল। আহোমরা প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করলেন।

"নভেম্বর মাসে নতুন যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে মোগলরা গৌহাটি আক্রমণ করল কিন্তু আহোম নৌবাহিনীর হাতে তাদের সম্পূর্ণ পরাজিত হতে হল।"

"ওকি থামলে কেন?" রতনবাবু নীরব হতেই দক্ষিণাদা বলে ওঠেন। "বাকিটা বলে ফেল।"

"আজ শেষ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।"

"কেন বলুন তো?" এবারে আমি জিজ্ঞেস করি।

তিনি উত্তর দেন, "খোয়াং ছাড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। খোয়াং থেকে ডিব্রুগড় মোটে ১৬ মাইল। এখন আমরা সোজা পুবে এগোচ্ছি।"

ঘড়ির দিকে তাকাই—একটা বেজে গিয়েছে। পথের পাশে চা-বাগানের ফাঁকে ফাঁকে জনপদ উঁকি দিচ্ছে। তাহলেও রতনবাবুকে বলি, "যতটা হয় বলুন, বাকিটা ডিব্রুগড়ে গিয়ে বলবেন।"

মৃদু হেসে রতনবাবু বলেন, "ডিব্রুগড় গিয়ে কি আর আপনাদের আসামের ইতিহাস শোনার সময় হবে?"

"না হলেও ক্ষতি নেই।" আমি বলি, "ইতিহাস কি কখনও শেষ হয়? ইতিহাসের আরম্ভ আছে, শেষ নেই। আপনি বলুন।"

রতনবাবু আরম্ভ করেন, "আওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর মসনদে। সুতরাং কাফের চক্রধ্বজ সিংহের এই ঔদ্ধত্যে তাঁর রক্ত গরম হয়ে উঠল। মোগলদের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ আওরঙ্গজেব তিন মাসের মধ্যে আবার আসামে সৈন্য পাঠালেন। কাফেরের গর্ব খব করতে সম্রাট কিন্তু একজন কাফেরকেই সেনাপতি মনোনীত করলেন। তাঁর নাম রাজা রামসিংহ।

"আঠারো হাজার বন্দুকধারী অশ্বারোহী, ত্রিশ হাজার বন্দুক ও কামানধারী এবং পনেরো হাজার তীরন্দাজ পদাতিকের এক সুশিক্ষিত ও সুবিরাট বাহিনী নিয়ে রাম সিংহ আসামে এলেন।

"১৬৬৯ সালের এপ্রিল মাসে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তেজপুরের কাছে

প্রথম তুটি যুদ্ধ মোগলদের জয় হল। কিন্তু তারপরেই আহোমরা গৌহাটির অপর পারে অবস্থিত মোগলদের প্রধান ঘাঁটি রংমহল অধিকার করে নিলেন। রাজা রাম সিংহ গৌহাটি আহোমদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাজোতে পালিয়ে গেলেন।"

"আচ্ছা, লাছিত বরফুকণের সঙ্গে রাম সিংহের সেই যুদ্ধই কি ইতিহাসে শরাইঘাঁটের যুদ্ধ নামে খ্যাত ?"

"হ্যাঁ।" রতনবাবু উত্তর দেন।

আমি বলি, "আহোমদের সেই বিজয় অভিযানের ওপরে লেখা আমি একখানি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়েছি। নাম—'রক্তস্নাত শরাইঘাঁট।"

"কে লিখেছেন ?" রতনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই, "ব্রহ্মপুত্র ছদ্মনামে শিলং-য়ের একজন লেখক। আসল নাম —মহেশচন্দ্র দেব।"

"কেমন লিখেছেন ?" দক্ষিণাদা প্রশ্ন করেন।

আমি বলি, "ভালোই, বেশ ভালো লেগেছে আমার। বিশেষ করে বইয়ের শেষে আহোম সেনাপতি লাছিত বরফুকণ সম্পর্কে রাজা রাম সিংহের মন্তব্যটি মনে রাখবার মতো।"

"মনে আছে কি ?"

"মনে করার চেষ্টা করতে পারি।"

"বেশ বলে ফেলো।"

একটু ভেবে নিয়ে আমি শুরু করি, "মোগল সেনাপতি রাজা রাম সিংহ যখন বুঝতে পারলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তখন তিনি সহকর্মী রসিদ খাঁকে বললেন—'সারাটা জীবন বলতে গেলে প্রায় যুদ্ধ করেই কাটিয়েছি। কিন্তু লাছিত বরফুকণের মতো এমন কুশলী ও সাধনায় একনিষ্ঠ সেনানায়কের দেখা পাই নি কখনও। কি অদ্ভুত বীরত্ব! আমি শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছি রসিদ খাঁ! আমি দেখছি, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি কি করে একজন সাধারণ সৈনিকের মতো

যুদ্ধ করছেন? আর আহোম সৈন্যরাও অদ্ভুত। একই সৈন্য যেমন দক্ষ ধনু চালনায়, তেমনি দক্ষ নৌ-যুদ্ধে বা বড়-তোপ চালনায়। যে দেশে লাছিত বরফুকণের মতো স্বদেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা সেনানায়ক আছেন, যে দেশের প্রতিটি সৈন্য বীরত্বের এক একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি, সে দেশকে বিশ্বের, কোনোজাতি কোনোদিন পদানত করতে পারবে না রসিদ খাঁ!…"

১৬

বেলা ঠিক দেড়টার সময় নিখিলবাবুর বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন রতনবাবু। শব্দ পেয়েই নন্দীদম্পতি বেরিয়ে এলেন বাইরে আর সেই সঙ্গে তাদের দুই সারমেয় সহচর। বড় নয়, ঝাঁকড়া লোমওয়ালা দুটি ছোট-ছোট বিলিতী কুকুর—'ল্যাপ ডগ্' বলা যেতে পারে।

নিখিলবাবুর একমাত্র পুত্র দেবাশীষ কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে। নবম শ্রেণীতে পড়ে, ফার্স্ট হয়। ফলে নন্দীদম্পতি সারমেয়দের অপত্য-স্নেহে লালন-পালন করছেন।

গাড়ি থেকে থামতেই মিসেস নন্দী নমস্কার করেন। বলেন, "আসুন দাদা!"

তাঁর আন্তরিক আমন্ত্রণে অভিভূত হই। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, মিসেস নন্দী দেখতেও সুন্দর। ভদ্রমহিলার নাম অমিতা। হুগলীর মেয়ে। ছাত্রী-জীবন কেটেছে দিল্লীতে। তখন তিনি দিল্লী বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত গায়িকা ছিলেন। শুনেছি তিনি ভ্রমণ করতে খুবই ভালোবাসেন। কিছু-দিন আগেও আমেরিকা এবং কানাডা ঘুরে এসেছেন।

আমরা বাড়িতে উঠে এলাম। ছোট বাড়ি—খানচারেক ঘর, এ বারান্দা, একফালি উঠান, আউট-হাউস ও গ্যারেজ। কিন্তু সবটা মিলিয়ে যেন একখানি পটে আঁকা ছবি। নিখিলবাবু যে এমন গুণীলোক এতদিন বুঝতেই পারি নি। তাঁর বাড়িখানিকে চিড়িয়াখানা ও বটা-নিক্স-য়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে।

ছোট কুকুরদুটির কথা আগেই বলেছি। একটা বড় কুকুরও আছে। আর সারি সারি খাঁচায় ঝুলছে নানা রঙের ছোট-বড় পাখি। রয়েছে কয়েকটি খরগোশ। তারা বেশ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুর তাদের কিছুই

বলছে না—আশ্চর্য সহাবস্থান।

ড্রয়িংরুমে এসে বসি। মিসেস নন্দী আমাদের চা-য়ের যোগাড় করতে ভেতরে চলে যান।

নিখিলবাবু আমার নীরবতার কারণ বুঝতে পারেন। হাসতে হাসতে বলেন, "ছেলেটা এখানে থাকে না। কাজকর্মের পরে যে সময়টুকু পাই, এই পশুপাখি ও গাছপালা নিয়ে থাকি।"

একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "তবে পশুপাখি যাদের দেখছেন, তারা সবাই আমার স্ত্রীর সম্পত্তি। আমার ওসব ঝামেলা ভালো লাগে না। কেমন করে লাগবে বলুন, সারাদিন চীৎকার আর চেঁচামেচি। একটু বসুন, শুনতে পাবেন ময়না'র দুর্বোধ্য চীৎকার। আমার স্ত্রী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সাফাই গাইবে—কথা বলার অভ্যাস করছে। কি জানি হবে হয়তো!"

তাঁর বলার ধরনে হাসি পায় আমাদের। আমরা হেসে উঠি।

ভেতর থেকে মিসেস নন্দীর প্রশ্ন ভেসে আসে, "আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি বুঝি আমার পশু-পাখির দুর্নাম রটাচ্ছ?"

কিন্তু নিখিলবাবু সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলতে থাকেন, "ওর পশু-পাখির ভাণ্ডারে আপনারা দেখতে পাবেন ডজনখানেক বদ্রিকা পাখি বা Love bird—সাদা, সবুজ, হলুদ ও নীল রঙের। খরগোশদুটো ফাঁক পেলেই খাঁচার নিচে দাঁড়িয়ে বদ্রিকাদের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।"

একবার থেমে কি যেন একটু ভেবে নেন নিখিলবাবু। তারপরে বলেন, "আমার স্ত্রী মউমাছি পালন করেন। কিন্তু হুল খাবার ভয়ে বাক্স-গুলোকে আমার বাগানে transfer করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য মধুর মালিক তিনি।"

আমরা হাসতে গিয়েও পেরে উঠি না। মিসেস নন্দী ট্রে হাতে ঘরে প্রবেশ করেছেন। ট্রে-টা সেণ্টার-টেব্‌লের ওপরে রেখে বলেন "খুব আমার পশু-পাখির দুর্নাম করছিল তো?"

"সুনাম করেন নি।" দক্ষিণাদা বলেন, "তবে যতটুকু বলেছেন, তাকে ঠিক দুর্নামের পর্যায়ে ফেলা যায় না।"
দক্ষিণাদার সার্টিফিকেটে কিন্তু মিসেস নন্দীর মন ভরে না। তিনি চা পরিবেশন করতে করতে পাল্টা অভিযোগ করেন, "নিজে তো সারা বছর ট্যুর করে বেড়ান, তখন যে আমাকেই বাগানের পরিচর্যা করতে হয়।" একটু থেমে কণ্ঠস্বরকে তিক্ততর করে বলতে থাকেন, "এমন স্বার্থপর মানুষ সংসারে আপনারা আর দেখেন নি দাদা! অফিস ট্যুরে তো সঙ্গী হবার প্রশ্ন ওঠে না। সাহিত্য সম্মেলনে জোড়হাট যাবার সময় বলে গেলেন, পরে তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।"
"পরে দেখলাম, তোমার সম্মেলনে যোগ দেবার সুযোগ নেই। স্থানা-ভাবের জন্য কর্তৃপক্ষের কেউ পরিবার নিয়ে আসে নি। মিসেস নাগ একদিন বিচিত্রানুষ্ঠানে এসেছিলেন, সেদিন মিস্টার নাগ বাড়িতে রয়ে-ছেন।" নন্দীবাবু নিজের বক্তব্য পেশ করে ফেলেন।
কিন্তু মিসেস সহজে ছেড়ে দেন না। বলেন, "আমার বেলাতেও না হয় সেই ব্যবস্থাই করতে। তাছাড়া সম্মেলনে নাই বা যেতাম, কয়েকটা দিন তো নাগসাহেবের বাড়িতে কাটিয়েআসতে পারতাম। রত্নার সঙ্গে প্রাণভরে গল্প করা যেতো।"
দক্ষিণাদা রায়দান করেন, "এর পরে আর নিখিলের কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। কাজেই আত্মপক্ষ সমর্থনের বৃথা চেষ্টা না করেআমা-দের বরং তোমার বাগান এবং বৌমার পশু-পাখি দেখাও।"
"কিন্তু বেলা যে দুটো বেজে গিয়েছে দাদা! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" মিসেস নন্দী আপত্তি করেন।
চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে দক্ষিণাদা উঠে দাঁড়ান। বলেন, "ক'মিনিট আর লাগবে, তুমি বরং খাবার রেডি করো, আমরা একটু বাদেই বসে পড়েছি।"
নিখিলবাবুর সঙ্গে আমরা বাড়ির পেছন দিকে আসি। সত্যই দেখবার মতো। নানা ধরনের, নানা আকারের অসংখ্য অর্কিড ও ক্যাক্টাস।

বহু রঙের ফুল ফুটে আছে।

কথায় কথায় নিখিলবাবু বলেন, "একশ সাতাশি রকমের অর্কিড আছে আমার বাগানে। এটি হল উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত অর্কিড—Blue Vanda. তারপরে এই দেখুন—Cymbidium lowianum. আর এগুলো নানারকমের Dendrobium."

আবার থামেন নিখিলবাবু। কয়েকটি অপরূপ অর্কিড দেখিয়ে বলেন, "এগুলো ভারতের বাইরের ক্যাটেলিয়া। নাম Cattleya trianaei, Catt. labiata Cooerlea, Catt. citrina ইত্যাদি।"

নিখিলবাবু আমাদের ক্যাক্টাসের বাগানে নিয়ে আসেন। তারপরে বলেন, "আমি এ পর্যন্ত তিনশ' একচল্লিশটা ক্যাক্টাস সংগ্রহ করেছি। এই সংগ্রহে মেক্সিকোর বিখ্যাত Cactii রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের Mamillaria, Notocactus, Ferocactus এবং Lobivia. আর এখানে রয়েছে দুষ্প্রাপ্য Leuchtenbergia principis ও Astrophytum প্রভৃতি।"

মিসেস নন্দী গতকাল বিকেলেই আমাদের আসার খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রাণভরে বাজার ও রান্না করার সুযোগ পেয়েছেন। আর তাই দু'রকমের মাছ, মাংস, ডাল, তরকারী, ভাজা, চাটনী ও পুডিং সহযোগে খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল।

খাবার পরেই দিদিভাই খবরটা দিলেন। মিসেস নন্দী আমাকে দাদা ডাকছেন। আমিও তাঁকে দিদিভাই ডাকতে শুরু করেছি।

দিদিভাই জানালেন, "দাদা, ডাঃ প্রাণেশ সেন ও এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজে এসে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বসেছিলেন, আপনাদের দেরি দেখে শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছেন। যাবার সময় সেই ভদ্রলোক আপনাকে এই চিঠিখানি দিয়ে গিয়েছেন।"

অবাক হই। প্রাণেশ নামে আমি মাত্র দুজনকেই চিনি—পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তী ও প্রাণেশ চৌধুরী। তারা উত্তরপাড়া ও আসানসোলে থাকে। ও-নামে আর কেউ তো জানা নেই আমার।

চিঠিখানি পড়ে আরও বেশি অবাক হতে হয়। আমার ডাক্তার প্রদীপচন্দ্র সিনহার চিঠি। স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ প্রাণেশ সেন তাঁরই শ্বশুরমশাই। ডাঃ সিনহা সপরিবারে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে আমি যেন একবার সে বাড়িতে যাই।

সে না হয় গেলাম। কিন্তু আমি যে আজ এখানে আসব, এখবর ডাঃ সিন্‌হা জানলেন কেমন ক'রে!

সহাস্যে দিদিভাই বলেন, "দাদা আজ আপনারা ডিব্রুগড়ের ভি. আই. পি. সারা শহরে সংবাদ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে যে আজ আপনাদের রিসেপশন দেওয়া হবে।"

"রিসেপশন!" দক্ষিণাদার সঙ্গে আমিও প্রায় চেঁচিয়ে উঠি।

মৃদু হেসে নিখিলবাবু বলেন, "আজ ডিব্রুগড়বাসীরা আপনাদের দু'জনকে এবং ডক্টর নীলমণি ফুকণকে সংবর্ধনা জানাবেন বলে স্থির করেছেন।"

নিখিলবাবু শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে রতনবাবু ও দিদিভাই হেসে ওঠেন। নিখিলবাবুও যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে। আমি আর দক্ষিণাদা নীরবে তাকিয়ে থাকি।

আমরা সত্যই বোকা। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। ভেবেছি ডিব্রুগড় বেড়াতে যাচ্ছি। অথচ ওঁরা আমাদের সবংর্ধনা দেবার জন্যই নিয়ে এসেছেন। সুতরাং সাফল্যের হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছেন ওঁরা। আর আমরা বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছি ওঁদের দিকে।

তিনটে বাজে, সাতটায় সংবর্ধনা। হাতে মাত্র ঘণ্টা চারেক সময়। এরই মাঝে ডিব্রুগড় ঘুরে দেখতে হবে। যেতে হবে ডাঃ প্রাণেশ সেনের বাড়ি ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে। দেখা করতে হবে ডঃ যোগীরাজ বসুর সঙ্গে। যেতে হবে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্ অফিসে—সিট বুক করতে।

আমরা কাল সকালেই গৌহাটি চলে যেতে চাই।

রতনবাবু ও নিখিলবাবুর সঙ্গে প্রথমে এলাম এয়ারলাইন্স-য়ের অফিসে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। কাল সকালের ফ্লাইট-য়ে জায়গা পাওয়া গেল। ন'টায় এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করতে হবে।

তারপরে এলাম নালিয়াপুলের কাছে, ডিব্রুগড়ের নতুন পাড়ায়—ডাঃ সিন্‌হার শ্বশুরবাড়িতে।

ডাঃ সেন চেম্বারে যাচ্ছিছিলেন। পথে দেখা হল তাঁর সঙ্গে। তিনিও ফিরে এলেন বাড়িতে।

মিসেস সেন খুবই খুশি। ডাঃ সেন যোগ করলেন, "ওনার গরজেই আজ নন্দীবাবুর বাড়িতে গিয়ে বসেছিলাম আপনাকে নিয়ে আসার জন্য। উনি যে আপনার বই পড়তে খুবই ভালোবাসেন।"

আমি তাঁকে প্রণাম করি। বলি, "আপনাদের স্নেহাশীষ আমার লেখক-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।"

ডাঃ সিন্‌হার স্ত্রী সংঘমিত্রার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। ওঁদের এক-মাত্র কন্যা ছ'বছরের মুমুনকেও আমি দেখেছি। আজ আলাপ হল ডাঃ সেনের ছোট মেয়ে শাশ্বতীর সঙ্গে। কলেজের পাঠ শেষ করে শাশ্বতী এখন সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে। বেশ ভালো গান গায়। কলকাতা বেতারকেন্দ্রেও গান গেয়েছে সে।

কথায় কথায় ডাঃ সিন্‌হা বলেন, "আজ আপনাদের সংবর্ধনা সভায় শাশ্বতী গান গাইবে।"

"তাহলে তো আমরাও শুনতে পাবো।" সঙ্গে সঙ্গে রতনবাবু বলে ওঠেন।

শাশ্বতী সহসা প্রশ্ন করে আমাকে, "কি গান গাইব বলুন তো?"

সমূহ সর্বনাশ। বলি, "এই রে বিপদে ফেললে! 'বন্দেমাতরম্', 'জন-গণ-মন' এবং 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ছাড়া যে আর কোনো গান জানা নেই আমার।"

আমার কথায় সবাই হেসে ওঠেন। হাসি থামার পরে শাশ্বতী বলে,

"বেশ কার গান গাইব বলুন—রবীন্দ্রনাথ, না অতুলপ্রসাদ ?"

"রবীন্দ্রসঙ্গীত নিশ্চয়ই কেউ না কেউ গাইবেই, তুমি বরং অতুলপ্রসাদের গান গেও।"

চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম ডাঃ সেনের বাড়ি থেকে। গোটা পরিবার আমাদের এগিয়ে দিলেন গাড়ি পর্যন্ত।

"সন্ধ্যার সময় ইণ্ডিয়া ক্লাবে আবার দেখা হবে," বলে রতনবাবু গাড়ি ছাড়লেন। ওঁরা হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। বলা বাহুল্য মুমুনও 'টা-টা' বলতে কার্পণ্য করছে না।

আমি নিখিলবাবুর অতিথি। দক্ষিণাদাও রাতে এখানকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ সেনের বাড়িতে থাকবেন। কাজেই আমাদের মধ্যে এখন নিরাশ্রয় শুধু রতনবাবু।

তিনি বড় চাকুরে, সুতরাং অফিসের 'প্রেস্টিজ' রক্ষার প্রয়োজনে তাঁকে উঠতে হবে 'টি প্ল্যাণ্টারস্ ক্লাবে।' এখন সেখানেই চলেছি।

শহর ছাড়িয়ে চা-বাগানের মাঝে টি প্ল্যাণ্টারস্ ক্লাব। সমস্ত চা-বাগান অঞ্চলেই এ ধরনের ক্লাব রয়েছে। এগুলো চা-বাগানের অফিসারদের নৈশ আড্ডা অর্থাৎ মদ্যপান কেন্দ্র। বিভিন্ন বাগানের মালিক ও অফিসাররা তাঁদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতি রাতে মউমাছির মতো ছুটে আসেন এইসব ক্লাবে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নাচ-গান ও মদ্যপানের পালা চলে। ওঁরা দিনে যেমন ভূতের মতো খাটেন, রাতে তেমনি পাগলের মতো স্ফূর্তি করেন।

আমাদের চা বাগানগুলো ইংরেজদের অবদান। ইংরেজরা চলে যাবার ত্রিশ বছর পরেও তাই হয়তো এখানে ইংরেজী সমাজ-ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' হয়েও ভারতীয় হয়ে ওঠে নি।

রতনবাবু বিখ্যাত বিলেতী কোম্পানীর বড় অফিসার। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। তার ওপরে এখানে একজন মানুষের দৈনিক থাকা-খাওয়ার খরচ পড়ে শতাধিক টাকা। তবু চাকরির প্রয়োজনে তাঁকে এখানেই

থাকতে হবে।

রতনবাবুর ঘর নির্বাচনের ফাঁকে নিখিলবাবু আমাকে ক্লাবের 'বার' এবং 'বল রুম'-টা দেখিয়ে দিলেন। এখন অবশ্য দুটিই প্রায় জনহীন। রাত ন'টা নাগাদ তৃষ্ণার্ত নর্তক-নর্তকীদের আগমন শুরু হবে।

ক্লাবের পেছনে 'সুইমিং পুল' সহ একটি কৃত্রিম জলাধার রয়েছে। সেটিও এখন জনশূন্য। কারণ ওটি কেবল ছুটির দিনের বিলাস-সরোবর।

ফিরে চলেছি শহরে—ডিব্রুগড় শহরে। বলা বাহুল্য রতনবাবুই গাড়ি চালাচ্ছেন। নির্দিষ্ট ঘরে স্যুটকেসটি রেখে তিনি আবার আমাদের সঙ্গী হয়েছেন।

ডিব্রুগড় উত্তর-পূর্ব আসামের বৃহত্তম শহর। শুধু আসামের চা ও তেল উৎপাদনের প্রধান কর্মকেন্দ্র নয়, লখিমপুর জেলার সদরও বটে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই নগরী। ব্রহ্মপুত্র যেমন ডিব্রুগড়ের সমৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়, তেমনি আবার তার ক্ষয় (erosion) থেকে এই শহরকে রক্ষা করাও একটা কঠিন সমস্যা।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত গেজেটীয়ারে বলা হয়েছে—'Head quarters of the district of Lakhimpur,···situated in 27°28´ N. and 94°55´ E. on the left bank of Dibru River···Dibrugarh is one of the most desirable stations in the plains of Assam···Dibrugarh was constituted a municipality ···in 1887. The town possesses a medical school and a high school···. There are four small printing presses in the town, at two of which a weekly newspaper is published in English.' তখন (১৯০১ খ্রীঃ) এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ১১,২২৭ জন, আর এখন (১৯৪৪ খ্রীঃ) সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০,৩৪৮ জন।

বর্তমান ডিব্রুগড় আসামের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে যে উপনগরী গড়ে

উঠেছে, সেটি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত। শিবসাগর থেকে আসার পথে সেটি দেখে এসেছি।

সুতরাং সেদিকে না গিয়ে আমরা চলেছি বড়বাড়ির দিকে—আসাম মেডিক্যাল কলেজ দেখতে। শুনেছি ব্রহ্মপুত্রের ক্ষয়ে অতিষ্ঠ হয়ে দলে দলে মানুষ গিয়ে বাসা বাঁধছেন ঐ অঞ্চলে। ফলে ওদিকটায় শহর খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে। গড়ে উঠেছে এক রমণীয় উদ্যান-নগরী।

আমাদের গাড়ি এখন তারই ভেতর দিয়ে পথ চলেছে। ঝকঝকে প্রশস্ত পথ। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে সুসজ্জিত দ্বীপ। আর দু পাশে ছবির মতো সুন্দর-সুন্দর বাড়ি-ঘর।

গাড়ি ঘোরালেন রতনবাবু। কি করবেন ? তিনি যে জনৈক ভি. আই. পি.-কে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাকে আজ সন্ধ্যা সাতটায় ডিব্রুগড়বাসীরা সংবর্ধনা জানাবেন।

আমি সঙ্গে না থাকলে রতনবাবু গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারতেন সদিয়া কিংবা ডিগবয়। সদিয়া থেকে যাওয়া যেতো পরশুরাম কুণ্ডে। দূরত্ব ৫০ মাইল। কিছুকাল আগেও সদিয়া উত্তর-পূর্ব আসামের একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। ১৯৫০ সালের প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সেখানে ব্রহ্মপুত্রের ধারা ভিন্নপথে প্রবাহিত হয়। ফলে সদিয়া এখন পরিণত হয়েছে এক নিঃসঙ্গ ও অবহেলিত নগরীতে।

কিন্তু এখনও সদিয়া থেকে যাওয়া যায় পরশুরামকুণ্ড এবং ব্রহ্মকুণ্ডে। দূরত্ব যথাক্রমে ৫০ ও ৫৪ মাইল। ব্রহ্মকুণ্ডে ব্রহ্মপুত্র সমতলে অবতরণ করেছে। কাজেই জায়গাটি শুধু পুণ্যতীর্থ নয়, 'হর কি প্যারী'-র মতো পরম রমণীয়।

তৈল-নগরী ডিগবয় ডিব্রুগড় থেকে মাত্র ৬০ মাইল। নিয়মিত বাস এবং রেল যাতায়াত করে। প্রায় একশ' বছর থেকে ডিগবয় আমাদের আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খনিজসম্পদ উপহার দিয়ে চলেছে। ১৮৮৯ সালে 'আসাম অয়েল কোম্পানী' সেখানে শোধনাগার নির্মাণ করেন। কিন্তু ডিগবয় কেবল তৈলনগরী নয়, আসামের একটি

সুন্দরতম শহরও বটে।
ডিগবয় থেকে যাওয়া যায় লেডো কয়লাখনি অঞ্চলে এবং মারঘেরিটায়। সমৃদ্ধ বনভূমির মাঝে মারঘেরিটা (Margherita) একটি রমণীয় জনপদ। জনৈক ইতালীয় ইঞ্জিনীয়ার তৎকালীন ইতালীর রাণী মার্গারেটের নামে সেইজনপদের নাম রেখেছেন। ব্রহ্মপুত্রের বৃহত্তম উপনদী ডিহিং-য়ের বাঁতীরে অবস্থিত এই জনপদ। সেখানে একটি বিরাট করাত-কল আছে। ডিব্রুগড় থেকে ট্রেনে কিংবা বেসরকারী বাসে মারঘেরিটা যাওয়া যায়। দূরত্ব এখান থেকে ৬৩ মাইল। ডিব্রুগড়ের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই জনপদ। আসাম অয়েল কোম্পানীর একটি সুন্দর অতিথি নিবাস আছে সেখানে।
মারঘেরিটা থেকে যাওয়া যায় ব্রহ্মদেশ সীমান্তে। সেখানেও নির্মাণ বিভাগের একটি ইন্‌সপেকশন বাংলো রয়েছে।
আসামে এসেও আমার যাওয়া হল না সদিয়া। দেখা হল না ডিগবয়। অথচ আমার বাবা কিছুদিন চাকরি করেছেন অয়েল কোম্পানীতে, থেকেছেন ডিগবয়ে। পিত্রালয় দেখা হল না আমার।
দেখা হল না অনেক কিছুই। কিন্তু যা দেখেছি আর যা দেখব, তাও তো কম নয়। সুতরাং অদেখা জায়গার ভাবনায় ব্যস্ত থাকা অর্থহীন। তাই নিখিলবাবুকে জিজ্ঞেস করি, “কাল তো সকাল ন'টার আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে।”
“আজ্ঞে হ্যাঁ।” নিখিলবাবু উত্তর দেন।
আবার প্রশ্ন করি, “বিমানবন্দর শহর থেকে কত দূরে?”
“ডিব্রুগড়ে দুটি এয়ারপোর্ট—মোহনবাড়ি ও চাবুয়া। দূরত্ব যথাক্রমে ৮ ও ১৪ মাইল। মোহনবাড়ি মেরামত করা হচ্ছে বলে এখন সব বিমান চাবুয়া থেকে যাতায়াত করছে।”
“আচ্ছা, ডিব্রুগড় শহর ও শহরতলীতে শুনেছি বহু বাঙালী আছে তাঁদের সংখ্যা কত?”
“প্রায় ৪৫,০০০। স্থায়ীভাবে ৬,৫০০ বাঙালী পরিবার এই শহরে বাস

করে।”
“বাংলা স্কুল আছে?”
“আছে। ডিব্রুগড়ে ছেলেদের ছ'টি ও মেয়েদের তিনটি উচ্চ বিদ্যালয়, তার একটি করে স্কুলে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। আর এখানকার ছাব্বিশটি প্রাথমিক স্কুলের দশটি বাংলা স্কুল। এছাড়া ডিব্রুগড়ে ছ'টি কলেজ ও একটি করে মেডিক্যাল কলেজ ও ল' কলেজ রয়েছে।”
“এগুলো তো সবই ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে?”
“হ্যাঁ। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃত পক্ষে '৬৭ থেকে এখানে স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হয়েছে। বর্তমানে চৌদ্দটি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে আর তার মধ্যে রয়েছে Petrolium Technology.”
থামলেন নিখিলবাবু। আমরা শহরের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। মনে হচ্ছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবো তাঁর বাড়িতে। তারপরে আর সময় পাওয়া যাবে না। তাই তাড়াতাড়ি কথাটা বলে ফেলি তাঁকে; বলি, “গত পাঁচদিন আপনার সঙ্গে রয়েছি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না। সংক্ষেপে নিজের কথা কিছু বলুন না।”
“এইবারে মুশকিল করলেন,” নিখিলবাবু বিপদে পড়ার ভঙ্গি করেন। বলেন, “আমার সম্পর্কে আমিই যে যৎসামান্য জানি।”
“তাই বলুন।” আমি নাছোড়বান্দা।
গম্ভীর স্বরে নিখিলবাবু শুরু করেন, “আমার সম্পর্কে আমি এই জানি যে আমার গায়ের রং কালো, ওজন ৫০ কেজি এবং আমি একজন সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভ তার মানে ফেরিওয়ালা। আমার নেশা নস্যি এবং তাশ খেলা। আমার ছেলে কলকাতায়। কাজেই ডিব্রুগড়ে থাকি আমরা তিনজন— আমি, আমার স্ত্রী এবং ভগবান।”
সহাস্যে জিজ্ঞেস করি, “আর কিছুই কি নিজের সম্পর্কে জানা নেই আপনার?”

"আছে। যেমন আমার পিতার নাম স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ নন্দী, মাতার নাম স্বর্গীয়া উমাশশী নন্দী। আমরা মালদহ জেলার চাঁপাই-নবাবগঞ্জের অধিবাসী ছিলাম। দেশ-বিভাগের পরে আমার জন্মভূমি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা কলকাতায় চলে আসি—ভয়ে পালিয়ে নয়, সদর্পে পেছনে হটে।"

১৭

বাড়িতে ফিরে আবার চা ও জলখাবার খেতে হল। 'খিদে নেই' কথাটা কয়েকবার বলার পরেও দিদিভাই কানে তুললেন না। তাঁর একই কথা, "যাবার সময় বলে গেলেন না কেন, আমি যে কেক আর সিঙারা তৈরি করলাম!"

অতএব খেতে হল। আর খাবার পরেই আবার গাড়িতে উঠলাম। এবারে দক্ষিণাদা ও দিদিভাই সঙ্গী হলেন আমাদের।

প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে এলাম। দেওয়াল ঘেরা বেশ বড় এলাকা নিয়ে সমিতি। প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত তাঁর অমৃতময় বাণী 'জীবে সেবা' প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে শান্তিপাড়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমিতির কাজ শুরু হয়। তারপরে স্থানীয় চা ব্যবসায়ী ৺নন্দেশ্বর চক্রবর্তী এই জমি দান করেন। ১৯৫৪ সাল থেকে পূর্ণোদ্যমে সেবাকার্য শুরু হয়।

১৯৫৪ সাল থেকে স্বামী শমানন্দ মহারাজ স্থায়ীভাবে এখানে বাস করছেন। বর্তমানে তিনিই সেবা সমিতির প্রকৃত পরিচালক। তবে এই সমিতি এখনও বেলুড় মঠের অনুমোদন লাভ করে নি।

সমিতি কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁদের কাজ করে চলেছেন। তাঁরা এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছাত্রাবাস পরিচালনা করছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন ভগিনী নিবেদিতা কে. জি স্কুল। প্রতি সন্ধ্যায় ভজন গান এবং শনি ও রবিবারে কথামৃত পাঠের আসর বসে। সমিতি সমারোহের সঙ্গে ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করেন। এক কথায় এখন এই সমিতি এ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণী

প্রচারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি দেখে বেরিয়ে আসবার মুখেই দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে—শ্রীমান দীপঙ্করের সঙ্গে। ইউ. জি সি-র রেসিডেন্‌শিয়াল ফেলো দীপঙ্কর পুরকায়স্থের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারে। ওর গবেষণার বিষয় ইংরেজী, যা আমি জানি না। তবু কেন যেন সে আলাপ করেছিল আমার সঙ্গে। কাজ শেষে ফিরে আসার সময় এই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান যুবা বাড়ি গিয়ে দেখা করে এসেছে।

সে ডিব্রুগড়ের ছেলে, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তবু তার সঙ্গে এমন আচমকা দেখা হয়ে যাবে, আশা করতে পারি নি। খুবই ভালো লাগছে আমার।

দীপঙ্কর কিন্তু হাসতে হাসতে আমাকে বলে, "মোটেই আচমকা দেখা হয় নি। আপনি ডিব্রুগড় এসেছেন শোনার পর থেকেই তো আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষে নন্দীদার বাড়িতে গিয়ে খবর পেলাম, আপনি এখানে এসেছেন। ছুটে এসে আপনাদের ধরে ফেলেছি।" দীপঙ্করের কণ্ঠস্বরে পরিতৃপ্তি।

আমি দক্ষিণাদার সঙ্গে দীপঙ্করের পরিচয় করিয়ে দিই।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে, "এখন আপনারা কোথায় যাবেন?"

"ডঃ যোগীরাজ বসুর সঙ্গে দেখা করব।" দক্ষিণাদা উত্তর দেন।

দীপঙ্কর বলে, "উনি খুব খুশি হবেন! চলুন।"

আমরা একসঙ্গে হাঁটতে থাকি। ডঃ বসু ওঁ-বাবার আশ্রমে থাকেন। শুনেছি কাছেই সে আশ্রম।

পণ্ডিত, দার্শনিক ও ব্রহ্মচারী যোগীরাজ বসুর নাম আমার সুপরিচিত। সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থ 'অভিজ্ঞানে' প্রকাশিত তার লেখা 'সাহিত্যে ধনি' প্রবন্ধটিও আমি পড়েছি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে আমি কিছুই জানি না। মহাপুরুষ দর্শনের আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা প্রয়োজন। তাই দীপঙ্করকে বলি, "চুপচাপ পথ না চলে তুমি বরং যেতে যেতে ডঃ বসু সম্পর্কে সামান্য কিছু বলো।"

দীপঙ্কর নিখিলবাবুর দিকে তাকায়। তিনি সহাস্যে দীপঙ্করকে জিজ্ঞেস করেন, "কি ?"

"আপনি বলুন।"

"না। তুমিই বলো।"

দীপঙ্কর আর আপত্তি না করে বলতে থাকে, "প্রথমেই প্রণাম জানাতে হবে ডঃ বসুর অন্তর্যামী পিতা-মাতাকে। সন্তানের এমন যথার্থ নাম-করণ বড় একটা দেখা যায় না। তিনি সত্যই যোগীরাজ।

"তাঁদের আদিনিবাস ছিল যশোহর জেলার মেহেরপুরে। তাঁর পিতা ডাঃ কালীপ্রসন্ন বসু ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় ধার্মিক। যোগীরাজের মায়ের নাম সরোজিনীদেবী। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর এখানেই তাঁর জন্ম হয়।

"১৯২৮ সালে যোগীরাজ তিনটে লেটার ও স্টার সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দ্বাদশ স্থান লাভ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে কলকাতা থেকে বি. এ. পাশ করেন। তিনি সংস্কৃত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পান।

"১৯৩৪ ও '৩৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতের 'গ' (বেদান্ত) ও 'ঘ' (বেদ) শাখায় এম. এ. পাশ করেন। দু'বারেই তিনি কলা বিভাগে সর্ববিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে তিনটি করে স্বর্ণ-পদক ও আর্থিক পুরস্কার লাভ করেছেন। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। ১৯৩৯ সনে ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধি-কার করলেন।

"জ্ঞানতাপস ও শিক্ষাবিদ যোগীরাজের অধ্যাপক জীবন আরম্ভ হয় ১৯৩৪ সাল থেকে। তিনি গৌহাটি কটন কলেজ ও বিরাজ ছাত্রাবাস টোলে অধ্যাপনা করেছেন। শ্রীবসু ডিব্রুগড় হনুমান বক্স সুরজমল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ।

"তিনি শুধু পণ্ডিত ও শিক্ষক নন, একজন সুবক্তা ও সুলেখকও বটে। তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে (১) India of the Ages of the

Brahmans, (২) Studies in Vedic Culture, (৩) Ancient Indian Culture & Civilization of Vedic Age, (৪) Principles of Literary Criticism of the East & West, (৫) বেদের পরিচয় এবং (৬) উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

"এর মধ্যে প্রথম গবেষণা গ্রন্থটির জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি. এইচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত করেন।"

এববার থামে দীপঙ্কর। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে যাবার আগেই সে আবার শুরু করে, "ডঃ বসু ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। অক্সফোর্ড, প্যারিস, গোয়েটিংগেন (পঃজার্মেনী) এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অতিথি অধ্যাপক রূপে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন।

"ডঃ বসু ১৯৫৪ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি তার সমস্ত আয় গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিরাজ আশ্রমকে দান করেন। একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মতো তিনি বিরাজ আশ্রমে জ্ঞানের অন্বেষণ এবং ভগবৎ চিন্তায় দিন অতিবাহিত করছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির মূল-মন্ত্র 'সুদীর্ঘ ত্যাগ' বর্তমান যুগেও মনীষীর সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাঁর অক্লান্ত সাধনা তাঁকে বিশ্বে উপযুক্ত স্থান দিয়েছে। আমরা ভাগ্যবান যে তাঁর মতো একজন জ্ঞানযোগীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারছি।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি থেকে বেরিয়ে এসেই ডানদিকে ছোট একটি একতলা বাড়ি। দীপঙ্কর জানায়, "ডঃ বসু এই বাড়িতে থাকেন।"

আমরা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াই। নিখিলবাবু কড়া নাড়েন। একটি ফ্রক পরা কিশোরী দরজা খুলে দেয়। ঘরে একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার ও একখানি তক্তাপোষ। তারই ওপরে বসেছিলেন জ্ঞানতাপস। দীপঙ্কর তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

সাধারণ বাঙালীর চেহারা। মোটা না হলেও রোগা নন। প্রশান্ত মুখশ্রী। আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি চোখ। তাকিয়ে থাকা যায় না, আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে। আমি তাঁকে প্রণাম করি।

তিনি সহাস্যে বলেন—ভারী খুশি হলাম, আপনারা এসেছেন। আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি করব, ডাক্তারদের বারণ।

একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন—হয়তো ওরা ঠিকই বলছে। আমার বিশ্রাম নেওয়াই উচিত। নইলে একটানা কিছুক্ষণ লেখাপড়া করতেও কষ্ট হবে কেন? কিন্তু···

আবার থেমে যান তিনি। কি যেন একটু ভাবেন। তারপরে বলেন—কিন্তু আমি যে কখনও এমন বসে থাকি নি। বড্ড কষ্ট হয়।

—কিসের কষ্ট?

—হার্টের রোগী, কষ্টের কি আর শেষ আছে। ভালো করে ঘুমুতে পর্যন্ত পারি না। তাই তো ঠাকুরকে বলি, ঠাকুর আর কেন? অনেক তো হল, এবার আমাকে পায়ে ঠাঁই দাও। কিন্তু তার-পরেই ভাবি, কাকে কি বলছি? তিনিও তো যাবার সময় কত কষ্ট করে গিয়েছেন। তাছাড়া আমরা তো আর সেকালের ঋষি নই, একালের মানুষ। আমরা যে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে পারি না।

মনে মনে ভাবি—তুমি যেকালেই জন্ম নিয়ে থাকো, তুমি যে ঋষির অংশেই জন্মগ্রহণ করেছো। আমরা ভাগ্যবান বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও ঋষি দর্শন করতে পারলাম।

হঠাৎ ডঃ বসু দীপঙ্করকে বলেন—ভেতর থেকে ওদের কাউকে ডাকো তো।

ডাকবার আগেই একটি কিশোরী ঘরে আসে। যোগীরাজ বলেন—একটু চা বানাও।

আমরা সবাই একযোগে প্রতিবাদ করে উঠি।

তিনি কান দেন না। বলেন—তাও কি হয়? আপনারা আমার এখানে এসেছেন, এক কাপ চা-ও খাবেন না। তাছাড়া ওদের এতে কোনো

অসুবিধে হবে না।

বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকি। মেয়েটি ভেতরে চলে যায়।

যোগীরাজ বলেন—ওরা কখনও বিরক্ত হয় না। কেন হবে? ওরাও অনাথ, আমিও অনাথ। ওদেরও আমি ছাড়া কেউ নেই, আমারও ওরা ছাড়া কেউ নেই। ওরা যেমন সারাদিন শাসন করে আমাকে, তেমনি বিনা প্রতিবাদে আমার সব অত্যাচার মেনে নেয়। আর তাই হয়েছে মুশকিল। ঠাকুরকে পায়ে ঠাঁই দিতে বলার পরেই মনে পড়ে যায়, আমি চলে গেলে ওদের কি হবে? কে দেখবে ওদের? তবে ভরসা করি, ঠাকুর আমাকে কৃপা করলে, সেই সঙ্গে তিনি ওদেরও একটা উপায় করে দেবেন।

মঙ্গলময়ের প্রতি কি আশ্চর্য নির্ভরতা? আর এ বিশ্বাস কখনই ব্যর্থ হবার নয়। ঠাকুর গত ৯ই জুলাই (১৯৭৬) যোগীরাজকে তাঁর চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই ঐ অনাথ বালিকাদেরও একটা উপায় করে দিয়েছেন।

আমি সৌভাগ্যবান, এই জ্ঞানতাপস সর্বত্যাগী ঋষিকে দর্শন করতে পেরেছি। আমার জীবন ধন্য হয়েছে।

ডঃ যোগীরাজ বসুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার রতনবাবুর গাড়িতে উঠে বসি। সাড়ে ছটা বাজে, সাতটায় সভা। সুতরাং ডিব্রুগড় দর্শনের যতি পড়ল এখানে। কি করব? আমি যে সভা করতে আসামে এসেছি। তাই যেখানে যাচ্ছি, সভা সামনে এসে হাজির হচ্ছে। ঢেঁকি যে স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পরেই নিখিলবাবু বলেন, "আমরা এখন ইণ্ডিয়া ক্লাবে যাচ্ছি, পুরো নাম India Club & Theatrical Institution সেখানেই আজ আপনাদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। আমি বরং এই ফাঁকে আপনাদের ইণ্ডিয়া ক্লাব সম্পর্কে কয়েকটি

কথা বলে দিই।"

"সাধু প্রস্তাব।" দক্ষিণাদা মন্তব্য করেন।

নিখিলবাবু বলতে থাকেন, "চা ও তৈল শিল্পের প্রাণকেন্দ্র এই ডিব্রুগড় শহর। বৃটিশ যুগে এই স্বচ্ছল শহরে আমোদ-প্রমোদ সাহেবদের এক-চেটিয়া ব্যপার ছিল। সমস্ত ক্লাবই ছিল তাঁদের।

"১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় কয়েকজন নাট্যরসিক ভারতীয় ভাবধারা ও কৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ডিব্রুগড় এ্যামেচার থিয়েট্রিক্যাল ইনস্টিটিউশন নামে একটি ভারতীয় সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯১ সালে ঐ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ৺সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়া ক্লাব স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালের ২৩শে অগাস্ট দুটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে। সেই থেকে এই সংস্থা ডিব্রুগড়ের সমাজ জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি এখন বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশবাসীর মিলনক্ষেত্র। খেলাধূলা, গান-বাজনা, অভিনয় ও অন্যান্য সুকুমার কলার সাহায্যে নির্মল আনন্দদানই এই প্রতিষ্ঠানের মূল-মন্ত্র। ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক নাগরিকের সুকুমার বৃত্তি বিকাশের সুযোগ দেওয়াই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন। পাঠাগারে প্রায় সাড়ে তিনহাজার ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা ও অসমীয়া বই আছে।

সাতটার একটু আগেই আমরা ইণ্ডিয়া ক্লাবে পৌঁছে গেলাম।

এ কি ক্লাব না এগজিবিশন ? চারিদিক লোকে লোকারণ্য।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা পাঠভবনে আসি। ডঃ ফুকণ সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বসে রয়েছেন এখানে। রয়েছেন সভাপতি অনাদি-ভূষণ রায়, সম্পাদক সন্তোষ দাশ এবং যুগ্ম সম্পাদক সৌমিত্র সেন ও অমলেন্দু দত্ত। রয়েছেন ক্রীড়া সম্পাদক চিরঞ্জীলাল আগরওয়ালা, কলা ও কৃষ্টি সম্পাদিকা গৌরী সেন এবং গ্রন্থাগার সম্পাদক দীপক মজুমদার ও প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন ক্লাব কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

নিখিলবাবু সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় হল আসামের প্রখ্যাত পণ্ডিত, কবি, লেখক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও শ্রমিকনেতা ডঃ নীলমণি ফুকণের সঙ্গে। তিনি জোড়হাটের মানুষ কিন্তু সেখানে তাঁকে প্রণাম করতে পারি নি।

প্রণাম করতেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদের স্নেহস্পর্শে আমার দেহ ও মন পুলকিত হল।

আমি তাঁর পাশে বসি। ডঃ ফুকণ জিজ্ঞেস করেন—তোমরা নাকি যোগীরাজের কাছে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভালো করেছো, আমিও তার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। যোগীরাজ আমাদের গৌরব, কেবল বাংলা ও আসামের নয়, সারা ভারতের গৌরব। আমার দিক থেকে এ গৌরব আরও বেশি, কারণ সে আমার ছাত্র।

একবার থামেন ডঃ ফুকণ। তারপরে আবার বলেন—অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! আমি আজ সভা করতে জোড়হাট থেকে ডিব্রুগড় চলে এলাম আর সে শয্যাশায়ী।···

সেদিন জোড়হাটে রবীনবাবু আমাকে ডঃ ফুকণ সম্পর্কে কিছু কথা জানিয়েছেন। মনে মনে আমি তাই ভেবে চলি। ডঃ ফুকণের জন্ম আসামের বিখ্যাত দুয়রা বংশে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। পিতা ৺লম্বোদর ফুকণ, মাতা ৺চন্দ্রাবলীদেবী। তিনি ১৯০০ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তখন আসামে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর কয়েকটা বছর নষ্ট হয়ে যায়। ১৯০৭ সালে তিনি কোচবিহার থেকে বি.এ. পাশ করেন। কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন আইন পড়লেন। তারপরে ফিরে এলেন আসামে, শিক্ষকতা ও সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯২১ সালে তিনি আসাম কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান-

সভার সদস্য ছিলেন। তিনি আসাম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাক্তন সহসভাপতি এবং গৌহাটি, ঢাকা ও বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছেন। ওজস্বী বক্তা হিসেবে তিনি সর্বত্র সুপরিচিত—তাই তাঁর আরেক নাম বাগ্মীবর 'ককা' বা দাত্থ। ডঃ ফুকণ একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তিনি 'আলোচনী', 'বাতরি' ও 'দৈনিক বাতরি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'চিন্তামণি', 'সাহিত্যকণা', 'জ্যোতিকণা', 'মানসী' ও 'সন্ধানী' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর সাহিত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ অবদান। দেশজ ও সংস্কৃত শব্দের আশ্চর্য সমন্বয় রয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর ভাষা অলঙ্কারপূর্ণ। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনার উৎস স্বদেশ প্রেম। নীলমণি ফুকণ আসামের সাহিত্যাকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

চা খেতে খেতে ডঃ ফুকণও আমাকে অনেক কথা জানালেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—তুমি তোমার পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে দিও বাংলা ও বাংলাভাষার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হৃদয়ের। বাংলায় আমার লেখাপড়ার হাতে-খড়ি। ছাত্রজীবনে আমি যখন কলকাতায় থাকতাম, তখন নিয়মিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যেতাম, ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। বেলুড় ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান। ভাগ্যিস ল' পড়তে ভালো লাগে নি বলে, তাড়াতাড়ি কলকাতা থেকে চলে এসেছিলাম, নইলে আজ তোমরা এখানে নীলমণির জায়গায় হয়তো স্বামী নীলানন্দকে দেখতে পেতে।

তাঁর কথা শুনে সবাই হেসে উঠি। কিন্তু তিনি গম্ভীর স্বরে বলে যেতে থাকেন—তবে যেসব বাঙালী নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসামকে শোষণ করে, আমি তাদের ঘৃণা করি। যারা ভাষা নিয়ে রাজনীতি করে, তারা আমার পরমশত্রু।

—কিন্তু তোমাদের মতো লেখক, কবি এবং সাধারণ বাঙালীকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। কারণ বাংলাভাষা আজ বিশ্ববরেণ্য আর বাঙালী মায়েরা যেভাবে অতিথি ও বিদেশীদের ভালোবাসেন, বাঙালী শিশুরা

দাদু বলে যেমন করে কাছে ছুটে আসে, তেমনটি আমি খুব কমই দেখেছি।

থামলেন ডঃ ফুকণ। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি —আচ্ছা, জোড়হাটের সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে আপনার কি মতামত ?

—আমি খুব খুশি হয়েছি। তবে এ ধরণের আরও সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বুড়ো হয়েছি, তোমরা যুবক। তোমাদেরই চেষ্টা করতে হবে। হাওড়ার বেজবরুয়া ভবনকে তোমরা বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যের মিলন মন্দিরে রূপান্তরিত কর। কারণ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম শতবার্ষিকীকে অবলম্বন করে অসমীয়া ও বাঙালীর মতানৈক্যের অবসান হয়েছে। আসামের বাঙালারা ও বাংলার অসমায়ারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে একাসনে বসে সেই সুমহান সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ উৎসব পালন করেছে। আরেকটা কথা···

একবার থামলেন ডঃ ফুকণ। আমি তাঁর দিকে তাকাই। তিনি আবার বলেন —আরেকটা বিষয়ও তোমরা ভেবে দেখতে পারো।

—কি ?

—আসামবাসী বাঙালীদের উচিত অসমীয়াদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া।

ওঁরা প্রায় শোভাযাত্রা সহকারে আমাদের নিয়ে এলেন প্রেক্ষাগৃহে। ক্লাবের সদস্য ও দর্শকবৃন্দ সারি বেঁধে দুপাশে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। দেখা হল ডাঃ সিন্‌হা এবং সাহিত্য সম্মেলনের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে। ওদেরই একজন সেদিন জোড়হাটে বলেছিল—শিবসাগর গেলে কিন্তু আপনাকে দাদা ডিব্রুগড় যেতেই হবে।

আজ তাকে হাসতে হাসতে বলি, "এই তব মনে ছিল আশ ?"

সবিনয়ে ছেলেটি বলে, "কিছুই যে করতে পারলাম না দাদা! কাল বিকেলে এখানে ফিরে এসে তো সন্তোষদাকে আপনাদের আসার কথা জানালাম। একদিনে আর কি করা সম্ভব? সবাইকে খবর দেওয়া যায়

নি পর্যন্ত।”

“অর্থাৎ এই রাজসূয় যজ্ঞও তোমাদের মনের মতো নয়?”

পাশের ছেলেটি আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়। বলে, “আপনি যে মহারাজ, মহারাজসূয় হলে ঠিক হতো।”

“কিন্তু আমি যে রাজ্যহীন মহারাজ ভাই! যজ্ঞে যোগদানের যোগ্যতা নেই আমার।”

“সেটা আমাদের বিচার্য।”

উঠে এলাম মঞ্চে। প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করলাম। খারাপ লাগছে সুনীলবাবুদের জন্য। ওঁরা কাল না চলে গেলেই পারতেন। একটা দিনের জন্য এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন হারালেন।

প্রেক্ষাগৃহটি ভারী সুন্দর। আকারেও ছোট নয়। সবচেয়ে বড় কথা একদিনের নোটিশে সভা আয়োজিত হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় সব আসন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে জনৈক উদ্যোক্তা পরিচয় দেবার নাম করে আমাদের প্রশস্তি গাইলেন। তারপরে সভানেত্রী আমাদের প্রত্যেককে একটি করে বাঁশের তৈরি কারুকার্যময় অসমীয়া টোকা (টুপি) ও ফুলদানি এবং ফুলাম গামোছা উপহার দিলেন।

সভানেত্রী প্রথম ডঃ ফুকণকে ভাষণ দান করতে বললেন। কিন্তু তিনি জানালেন—আমি বলব সবার শেষে।

সুতরাং দক্ষিণাদাকে উঠতে হল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিন্নতা নিয়ে চমৎকার বক্তব্য রাখলেন দক্ষিণাদা। সর্বশেষে তিনি ডঃ নীলমণি ফুকণের উত্তম-আয়ু কামনা করলেন।

দক্ষিণাদার পরে মাইকের সামনে এসে দাঁড়াতে হল আমাকে।

আমি বললাম বাংলা ও অসমীয়া ভাষার কথা, দুই ভগ্নীভাষার মিলনের কথা। বললাম আমরা বাঙালী নই, অসমীয়া নই, আমি আটায়ে ভারতীয়।···

আমার বক্তব্যের পরে ডঃ ফুকণ তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। ছিয়ানব্বুই

বছরের প্রবীণ পণ্ডিতের সূক্ষ্ম রসবোধ এবং অসাধারণ স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলাম। তিনি রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার বরেণ্য মহাপুরুষদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করে দেখালেন। কেমন করে তাঁদের চিন্তাধারা যুগে যুগে আসাম সহ সমগ্র ভারতীয় জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অবশেষে ডঃ ফুকণ ঘোষণা করলেন—দক্ষিণাবাবু আমার 'উত্তম আয়ু' কামনা করেছেন। জানি না মঙ্গলময় তাঁর সে কামনা পূর্ণ করবেন কিনা? যদি করেন, আমি যদি সত্যই উত্তম আয়ু লাভ করি, তাহলে বাকি জীবনটা আমি অসমীয়া ও বাঙালী মৈত্রীর জন্য উৎসর্গ করব।

বক্তৃতার পরে শুরু হল বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রথমে গান গাইলেন শ্রীমতী ডলি ঘোষ। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইলেন। সেদিনের মতো আজও তার গান ভালো লাগল আমার।

তার পরে থিয়েট্রিক্যাল ইনস্টিটিউশন একটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করলেন। দেখে ভালো লাগল যে নবনাট্য আন্দোলনে ডিব্রুগড় মোটেই পিছিয়ে নেই।

নাটকের পরে মঞ্চে উঠল শ্রীমতী শাশ্বতী। খুবই ভালো লাগল তাঁর গান। অতুলপ্রসাদের দুটি গান গাইল সে। প্রথমে গাইল—

'আজি এ নিশি, সখী, সহিতে নারি,
কেবলই পড়িছে মনে যমুনা বারি।…'

তারপরে

'আমি তোমার ধর্‌ব না হাত,
নাথ! তুমি আমায় ধর।
যারা আমায় টানে পিছে,
তারা আমা হতেও বড়।
শক্ত ক'রে ধর হে নাথ!
শক্ত ক'রে আমায় ধর।…'

তারপরে প্রবীণ কুঁয়োর নামে জনৈক স্থানীয় শিল্পী চমৎকার 'পেপা'

(বাঁশি) বাজিয়ে শোনালেন। শুনলাম ডক্তারের নিষেধে তিনি নাকি বহুদিন আগেই বাজনা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি আমাদের সম্মানে আবার বাঁশি হাতে তুলে নিয়েছেন। মনে মনে ধন্যবাদ জানাই তাঁকে।

অবশেষে শুরু হল বিহু নাচ ও গান। ভারী সুন্দর সেজেছে মেয়েটি। ঢাক-ঢোল বাঁশি ও শিঙার শব্দের সঙ্গে তালে তালে নাচছে আর গাইছে—

'অতিকৈ চেনেহর মুগারে মহুরা
তাতোকৈ চেনেহর মাকো।
তাতোকৈ চেনেহর বহাগর বিহুটি,
নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ॥'

মুগার মহুরা আমাদের খুবই স্নেহের। মাকু তার চেয়েও স্নেহের। কিন্তু তার চাইতেও বেশি স্নেহের হল ব'হাগ বিহু। সেই শুভ উৎসব পালন না করে আমরা কেমন করে বসে থাকব ?

১৮

সকাল ঠিক আটটায় দিদিভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয় অথচ বড়ই বেদনা বোধ করছি। তাহলেও এ বিচ্ছেদ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? আমি যে পথিক। প্রতিনিয়ত ঘরের মায়া কাটিয়ে আমাকে নেমে আসতে হয় পথে।

নিখিলবাবু গাড়ি স্টার্ট দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করে। দিদিভাই দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। আমিও হাত নাড়ি। গাড়ি বাঁক ফেরে। দিদিভাই অদৃশ্য হয়ে যান।

জানি না তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে? আর কোনোদিন দেখা হবে কিনা তা-ও জানা নেই। কিন্তু জানি তাঁর এই স্নেহমধুর ব্যবহার ও সেবা-যত্নের কথা বহুদিন মনে থাকবে আমার। মনে মনে মঙ্গলময়ের কাছে তাঁর মঙ্গলকামনা করি।

দক্ষিণাদাকে শ্রীমতী গৌরী সেনের বাড়ি থেকে নিয়ে প্ল্যান্টারস্ ক্লাবে এলাম। রতনবাবু তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গাড়িবারান্দার নিচে। তাঁকে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলি বিমানবন্দরের দিকে।

সকাল ন'টার আগেই আমরা চাবুয়া বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। বিমানবন্দরের বাইরে গাড়ি রেখে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-য়ের গাড়িতে উঠলাম। টার্মিনাল বিল্ডিংস-য়ে এলাম। জোড়হাটের চেয়ে অনেক বড় বিমান-বন্দর।

মালপত্র জমা দিয়ে আমরা একখানি সোফায় এসে বসি। আর ঠিক তখুনি মাইক গর্জে ওঠে—গৌহাটির বিমান আসতে আধঘণ্টা দেরি হবে।

খুশি হলাম। আরও আধঘণ্টা থাকতে পারব রতনবাবু ও নিখিলবাবুর

কাছে। আজ ছ'দিন আসামে এসেছি। আসামের মাটিতে অবতরণ করার কয়েক মিনিট পরেই পরিচয় হয়েছে ওঁদের সঙ্গে। তারপর থেকে ওঁরা দু'জন আমার প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। ইতিমধ্যে অসংখ্য নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সবার কাছ থেকেই বিদায় নিয়েছি। কেবল এঁরা দুজন এখনও রয়েছেন আমার সঙ্গে। এবারে এঁদের কাছ থেকেও নিতে হবে বিদায়। সেই বিদায়লগ্নটি যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে পেছিয়ে যায়, তাহলে কে না খুশি হয়?

"নমস্কার।"

প্যাণ্ট-কোট পরা একজন ভদ্রলোক। চেহারাটি সুন্দর, বয়স চারের ঘরে। আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি।

ভদ্রলোক বলেন, "আমার নাম ভুবনমোহন দাস।..."

"ডঃ বি. এম দাস?" নিখিলবাবু বলে ওঠেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ভদ্রলোক সবিনয়ে উত্তর দেন।

নিখিলবাবু আবার প্রশ্ন করেন, "ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়েন।

আমরা তাঁকে বসতে বলি। তিনি আমার পাশে বসেন।

নিখিলবাবু বলেন, "আপনাদের কথা অনেক শুনেছি। আজ দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।"

রতনবাবু ডঃ দাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন, "আপনিও কি আমাদের সঙ্গে এবার গৌহাটি যাচ্ছেন"

"না।" ডাঃ দাস বলেন, "আমার এক বন্ধুকে রিসিভ করতে এসেছি। আপনারা যে বিমানে যাবেন, তিনি সেই বিমানেই এখানে আসছেন।" একটু থেমে তিনি আবার বলেন, "আমি অসমীয়া হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সময় পেলেই বাংলা বই পড়ি। আমি আপনাদের দু'জনেরই বই পড়েছি। তাই সুযোগ পেয়ে আলাপ করার লোভ

সামলাতে পারলাম না। কিন্তু একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখি—সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আমার একটা ভয় আছে।"

বলি, "আমাকে তাহলে ভয় করার কিছু নেই, কারণ আমি লেখক, সাহিত্যিক নই। আপনি বরং দক্ষিণাদাকে ভয় করুন, তিনি সাহিত্যিক।"

"কিন্তু তুমি যে মহারাজ?" দক্ষিণাদা আমাকে আক্রমণ করেন।

আত্মরক্ষা করি। বলি, "আপনি তো জানেন দাদা, আমি রাজ্যহীন ও শিষ্যহীন মহারাজ।"

ডঃ দাস কিন্তু আমাদের আত্মকলহ থেকে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন, "অথচ—'Irony of fate' কি জানেন?"

"কি?" আমরা কৌতূহলী।

"প্রখ্যাত অসমীয়া কবি ও নাট্যকার ৺শৈলধর রাজখোয়াদেবের ছোট মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি।"

আমরা সোচ্চার স্বরে হেসে উঠি।

ডঃ দাস বাধা দিয়ে বলেন, "এখুনি হাসবেন না, আরও আছে।"

আমরা হাসি থামিয়ে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন, "এবং আমার স্ত্রী নিয়মিত গল্প ও কবিতা লেখেন।"

আবার হাসি। আর ডঃ দাসও সে হাসিতে যোগ দেন।

হাসি থামার পরে নিখিলবাবু বলেন, "এবারে আমি আপনাদের একটি খবর দেবো।"

আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন, "ডঃ দাস বৈজ্ঞানিক, পি. এইচ. ডি., ডি. এস. সি.। দেশে এবং বিদেশে প্রকাশিত ওঁর তেরো-খানি বইয়ের অধিকাংশই বিজ্ঞান বিষয়ক। কিন্তু উনিও মাঝে মাঝে গল্প লেখেন এবং ওনার একখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।"

তুমুল হাস্যরোল। কিন্তু সে হাসি থামবার আগেই বিমানবন্দরের মাইক গর্জে ওঠে—আমাদের সিকিউরিটি কন্ট্রোলে যাবার নির্দেশ দেয়।

উঠে দাঁড়িয়ে ওঁদের সঙ্গে করমর্দন করি। ওঁরা তিনজনেই কথা দেন, কলকাতা গেলে দেখা করবেন।

আমি ও দক্ষিণাদা সিকিউরিটি কণ্ট্রোলের দোরগোড়ায় আসি। অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াই।

রতনবাবু ও নিখিলবাবুর মতো ডঃ দাসও আমাদের পাশেই রয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি এখানে থাকলেও আমার বাড়ি গৌহাটির পান-বাজারে। আমার স্ত্রী ও মেয়ে সেখানেই রয়েছে। সময় গেলে একদিন আমার বাড়িতে গিয়ে এককাপ চা খেয়ে আসবেন।"

আমি মাথা নাড়ি। ডঃ দাস দক্ষিণাদাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি বোধহয় বিজয়বাবুর বাড়িতে উঠবেন?"

"হ্যাঁ।" দক্ষিণাদা উত্তর দেন।

ডঃ দাস বলেন, "আমার স্ত্রী বিজয়বাবুর স্ত্রীর সহকর্মী। ওঁরা দু'জনেই সন্দিকৈ গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করেন।"

আজ আর ফকার ফ্রেণ্ডশিপ নয়, বোয়িং ৭০৭। শুধু গতিশীল নয়, আকারেও অনেক বড়। আসনগুলিও আরামদায়ক।

ঠিক এগারোটায় বিমানের ইঞ্জিন গর্জে উঠল, রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। রতনবাবু, নিখিলবাবু ও ডঃ দাস টার্মিনাল বিল্ডিংস-য়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন।

আমরা ওঁদের ছাড়িয়ে এলাম। আমাদের বিমান আকাশে উঠল। ওঁরা মাটিতে, আমরা আকাশে। ওঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমরা ভেসে চলেছি।

ডিব্রুগড় থেকে গৌহাটি রেলপথে সাড়ে তিনশ' মাইল। মোটরপথে কিছু কম। বিমনপথের দূরত্ব জানি না। শুধু জানি রেলে যেখানে সময় লাগে আঠারো ঘণ্টা, সেখানে বিমানে লাগবে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

আজ আমি আর দক্ষিণাদা পাশাপাশি বসেছি। এয়ার হোস্টেস্ চকো-

লেট ও মউরি পরিবেশন করলেন। দক্ষিণাদা একটি চকোলেট মুখে পুরে বললেন, "পঁয়ত্রিশ মিনিটের ফ্লাইট, মনে হচ্ছে না চা পাওয়া যাবে। যদি চা নিয়ে আসে, ডাক দিও। আমি একটু চোখ বুজে থাকি।"

"কেন, শ্রান্ত বোধ করছেন?"

"ঠিক শ্রান্ত নয়, তবে কথা বলতে ইচ্ছে না।

খুবই স্বাভাবিক। বিগত কয়েকদিন আমরা যেমন অসংখ্য লোকের অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছি, তেমনি আমাদের প্রায় সর্বক্ষণ কথা বলতে হয়েছে। আর আমার চেয়ে দক্ষিণাদা অনেক বেশি কথা বলেছেন। আবার হয়তো গৌহাটি নেমেই তাঁকে কথা বলা শুরু করতে হবে। তাই তাঁকে আর বিরক্ত করি না।

আমিও শ্রান্ত। কিন্তু আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারি না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই। অনেক উঁচু দিয়ে বিমান চলেছে। অমরাবতী-আসাম ধূসর ও অস্পষ্ট। এর চেয়ে রেলে কিংবা মোটরে গেলেই ভালো ছিল। বহুক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে যাওয়া যেতো।

এযুগে অবশ্য এ আপসোস অর্থহীন। আমরা সবাই যে সময় বাঁচাবার ব্যাধিতে ভুগছি। যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সময়ের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে।

তাই বলে অবশ্য অমরাবতী-আসামের কথা ভাবতে কোনো বাধা নেই আমার। আমি তার কথাই ভেবে চলি—আসামের মাটিতে পা দেবার আগে ভারতের অধিকাংশ মানুষের মতো আমারও ধারণা ছিল, আসাম শুধু পাহাড় জঙ্গল ম্যালেরিয়া বন্যা ও ভূমিকম্পের দেশ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আসাম প্রাচুর্য আর সৌন্দর্যের শান্তিনিকেতন। সে সারল্য আর আতিথেয়তার শ্রীভূমি। শ্রদ্ধেয় শ্রীহেম বরুয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও এখন বলতে পারি, 'Assam···is mentally a distant horizon like Bolivia or Peru, less known and more fancied.'

দশটি জেলা নিয়ে বর্তমান আসাম—কামরূপ, গোয়ালপাড়া, লখিমপুর শিবসাগর, দরং, কাছাড়, নগাঁও, কার্বী অ্যালন (মিকির পাহাড়), মিজো ও উত্তর কাছাড়। ২৩,৩৩১টি গ্রাম আছে এই রাজ্যে, তার মধ্যে ২২,২২৪টি গ্রামে মানুষ বাস করে। আর ছোট-বড় মিলিয়ে ৭৪টি শহর আছে। রাজ্যে বাড়ির সংখ্যা পঁচিশ লক্ষের মতো।

১৯৫৪ সালের জনগণনা অনুযায়ী বর্তমান আসামের জনসংখ্যা ১,৪৯,৫৭, ৫৪২ জন। গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৫০ জন মানুষ বাস করে। প্রতি হাজার পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা ৮৯৭ জন। শতকরা ৫৬·৮৫ জন কৃষিজীবী এবং ২৮·৭২ জন লেখাপড়া জানেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ৩৭ ১৯ আর নারীদের ১৯·২৭ জন।

পাটকাই পর্বতমালা আসামকে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে পৃথক করেছে। মিসমি পার্বত্য অঞ্চল থেকে নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বতশ্রেণী। এর গিরিপথগুলোকে পূর্ব-ভারতের খাইবার বলা যেতে পারে। কারণ এই গিরিপথ পেরিয়ে আহোমরা আসামে এসেছেন। তাঁরা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ছ'শ বছর ধরে রাজত্ব করেছেন। সেই সঙ্গে আসামের মাটিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মহামিলন হয়েছে।

আবার এই গিরিশ্রেণী পেরিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্মীরা আসাম আক্রমণ করেছে। তাদের আসুরিক অত্যাচারে অমরাবতী-আসাম নরকে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র পরিণত হয়েছে রক্তধারায়। আর তাই এসেছে ইংরেজ। আসামকে হারাতে হয়েছে স্বাধীনতা।

আসামের উত্তরে হিমালয়, ভুটান এবং তিব্বত। মহামান্য দালাই লামা দেশত্যাগী হয়ে আসাম দিয়েই ভারতে এসেছেন। আসাম-হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ নামচা বারোয়া। উচ্চতার বিচারে এই ২৫,৪৪৫ ফুট পর্বতশৃঙ্গটি বিশ্বের একচল্লিশতম এবং ভারতের পঞ্চম শিখর। ভারতের উচ্চতর শিখরগুলি হল—কাঞ্চনজংঘা (২৮,১৪৬´ ও ২৭,৮০৩´) নন্দাদেবী (২৫, ৬৪৫´) ও কামেট (২৫, ৪৪৭´)।

বৃটিশ ও নিউজিল্যাণ্ডের পর্বতারোহীরা একুশ বছর আগে কাঞ্চনজংঘায় আরোহণ করেন। ভারতীয় পর্বতারোহীরাও ১৯৫৫ সালে কামেট, ১৯৬৪ সালে নন্দাদেবী এবং ১৯৫৪ সালে এভারেস্ট (২৯,০০৮´) শিখরে আরোহণ করেছেন। কিন্তু নামচা বারোয়া আজও অপরাজিত। তার প্রতি এই উদাসীনতা বিস্ময়কর। আমি ভারতীয় পর্বতারোহীদের, বিশেষ করে আসাম মাউন্টেনীয়ারিং ক্লাবের সদস্যদের, নামচা বারোয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। শিবলিঙ্গের (২১,৪৬৬´) মতো দুর্গম শিখর যখন বিজিত হয়েছে, তখন নামচা বারোয়াও অপরাজিত থাকবে না। এই সঙ্গে ভাবীকালের সেই সফলকাম অভিযাত্রীদের উদ্দেশে জানিয়ে রাখি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

যাক্ গে, যেকথা ভাবছিলাম। প্রকৃতি আসামকে দু-হাত উজাড় করে দিয়েছেন। দিয়েছেন ব্রহ্মপুত্রের মতো নাব্য নদ- রাজ্যের প্রায় মধ্যাঞ্চল দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত। দিয়েছেন কোমল মাটি কঠিন পাহাড় আর গহন বন। দিয়েছেন কাঠ তেল কয়লা চা ও অজস্র কৃষি সম্পদ।

আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসামের মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। বছরে দু'বার ঝড় হয় আসামে -বসন্ত আর শরতে। বৃষ্টি বেশি হয় বলেই আসামে এত চা উৎপন্ন হয়, আবার বেশি বৃষ্টির জন্য বন্যা আসামের বাৎসরিক অভিশাপ।

বন্যার পরেই আসামে বড় প্রাকৃতিক অভিশাপ ভূমিকম্প। ভূতাত্ত্বিকদের মতে আসাম বিশ্বের পূর্ব-ভূমিকম্প বলয়ের ভেতরে অবস্থিত। আসামের ইতিহাসে প্রথম ভূমিকম্পের উল্লেখ রয়েছে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। তার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতে আসামে একাধিক বার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে আসছে। প্রবল ভূমিকম্প হয়েছে ১৬০৭, ১৮৩৭, ১৮৬৯, ১৮৭৫, ১৮৮২, ১৮৯৭ ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে আসামে ১৫৪০ জন মানুষ মারা গিয়েছেন।

ইদানিং কালে আসামে সবচেয়ে সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়েছে ১৯৫০

সালের ১৫ অগাস্ট। এই ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রসহ অন্যান্য নদীর প্রবাহ-পথ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।...

"You are requested to kindly fasten your seat-belt."

মাইকে এয়ার হোস্টেজ-য়ের কণ্ঠস্বর গর্জে ওঠে। আমার ভাবনা থেমে যায়। দক্ষিণাদার তন্দ্রাও ছুটে গিয়েছে। আমরা সোজা হয়ে বসি। তাকিয়ে দেখি একই অনুরোধ লেখা লাল আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। আমরা বেল্ট বাঁধি।

বিমানটা মাঝে মাঝেই দুলে উঠছে। বাইরে সব সাদা। দক্ষিণাদা বলেন, "ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়।"

কিন্তু বোয়িং তো মেঘের ওপর দিয়ে যায়। তবে সব সময় সব জায়গায় মেঘের উচ্চতা এক থাকে না। তাছাড়া এয়ার-পকেট-য়ে পড়ে গেলে বিমান এমনি বাম্প্ করে।

করুক গে, দক্ষিণাদা আবার চোখ বুজেছেন। অতএব আমিও আবার আমার ভাবনার তরী ভাসিয়ে দিই। কিন্তু কেন যেন এবারে ভূগোলের ভাবনার বদলে ইতিহাসের ভাবনা পেয়ে বসে আমাকে। আর সে ইতিহাস আজও আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকগীতি।

সেদিন জোড়হাটে পূর্ণদাস বাউলের গান শোনার সময় সুনন্দা আমাকে সংক্ষেপে অসমীয়া লোকগীতির কথা বলেছিল। বলেছিল—ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে আসামে রচিত হয়েছে একাধিক লোকগীতি। আপনি নিশ্চয়ই বরফুকণের গীতটি শুনেছেন।

সেই বরফুকণের গীতের কথাই মনে পড়ছে। আমি ভেবে চলি—

বরফুকণের গীত ইতিহাস আশ্রিত সর্বশ্রেষ্ঠ অসমীয়া লোকগীতি। ১৮১৫ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে আসামের জনজীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল, তাকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে এই লোকগীতি। সেই দুর্যোগ ডেকে এনেছিলেন তৎকালীন লোয়ার-আসামের রাজ্যপাল বদনচন্দ্র বরফুকণ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি বর্মীদের আসাম আক্রমণে প্ররোচিত করেছিলেন।

এই লোকগীতির প্রথম ছত্রিশ পঙক্তিতে সরস্বতী ও পার্বতীর বন্দনা রয়েছে। তারপরেই নাটকীয়ভাবে গল্প আরম্ভ হয়েছে। গীতিকার বলে-ছেন—সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর গত হয়ে যখন কলিযুগ শুরু হয়েছে, তখন আসামে কোনো মন্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন বুড়া গোঁহাই। তাঁকে অবতার বলে মনে করা হত। স্বর্গদেব চন্দ্রকান্ত সিংহ (১৮১০-১৮১৮ খ্রী:) যখন আসামের রাজা, পূর্ণানন্দ তখন বুড়া গোঁহাই।

বুড়া গোঁহাই ছোট-বড় সমস্ত সামন্ত রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য আহোম সাম্রাজের অন্তর্ভূর্ত করলেন। একসময় তিনি দেখলেন বদনচন্দ্র বরফুকণ ছাড়া আর তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বরফুকণ শুধু শক্তিশালী শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রজাপীড়ক। সেই সুযোগ নিয়ে বুড়া গোঁহাই তাঁকে বন্দী করতে চাইলেন। তিনি পরবতীয়াফুকণ নামে জনৈক সেনাপতিকে বললেন—তাড়াতাড়ি গৌহাটি চলে যাও। বরফুকণকে বন্দী করে একটা লোহার খাঁচায় পুরে নিয়ে এসো এখানে। দেখো, কথাটা যেন আবার জানাজানি না হয়। তুমি তো জানো আমার ছেলে বরফুকণের মেয়ে পিজৌ গাভরুকে বিয়ে করেছে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ জানতে পারলেন কথাটা। বুড়া গোঁহাইয়ের জনৈক প্রাসাদরক্ষী বলে দিলেন তাঁকে। স্বামী ঘরে আসার পরেই পিজৌ কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। বললেন—তুমি তো জানো, তোমার বাবা কোনোদিই আমার বাবাকে দেখতে পারেন না। তাই ক্ষমতা হাতে পেয়ে তাঁকে মেরে ফেলার মতলব করেছেন।

স্বামী বললেন—কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু আমার পক্ষে তোমার বাবাকে সাহায্য করা আর মৃত্যু বরণ করা যে একই কথা।

—তুমি যদি আমার বাবাকে না বাঁচাও তাহলে আমার মরামুখ দেখবে।

অতএব পুত্র পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য হলেন। তিনি সব জানিয়ে বদনচন্দ্রের কাছে একখানি চিঠি লিখলেন। তারপরে জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে বললেন—আস্তাবলের সবচেয়ে দ্রুতগামী

ঘোড়াটি নিয়ে গৌহাটি চলে যাও, এই চিঠিখানি বরফুকণের হাতে দাও। মনে রেখো, পরবতীয়া ফুকণ গৌহাটি পেঁাছবার আগেই তোমাকে সেখানে পেঁাছতে হবে।

পরবতীয়া ফুকণ কিন্তু তাঁর আগেই গৌহাটি পেঁাছে গিয়েছিলেন। তবে তখন রাত হয়ে গিয়েছে দেখে তিনি ভাবলেন—রাতে আর হাঙ্গামা করে কি হবে? কাল সকালেই বরফুকণকে বন্দী করা যাবে।

আর বরফুকণ রাতেই জামাইয়ের চিঠি পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর তিন ছেলে ও উদয়সিংহ বঙাল নামে জনৈক কর্মচারীকে নিয়ে সেই রাতেই গৌহাটি পরিত্যাগ করলেন।

পরদিন সকালে পরবতীয়া ফুকণ দেখলেন—পাখি পালিয়েছে। তিনি বৃথাই বরফুকণের অনুসরণ করলেন।

বরফুকণ নির্বিঘ্নে কলকাতা পেঁাছলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ বললেন—বুড়া গোঁহাই আমাদেব বন্ধু, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সম্ভব নয়।

বরফুকণ তখন আরাকান হয়ে ব্রহ্মদেশের তীরে গিয়ে নৌকো ভেড়ালেন। আর ঠিক তখুনি সেই ঘাটে হেমো আইদেও নামে ব্রহ্মদেশের জনৈকা রাণী স্নান করছিলেন। হেমোদেবী ছিলেন আসামের মেয়ে। ব্রহ্মের মান রাজাকে খুশি করার জন্য বুড়া গোঁহাই তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কাজেই বুড়া গোঁহাইয়ের ওপরে তাঁর খুবই রাগ ছিল। তিনি বরফুকণকে দাদা বলে সম্বোধন করলেন। তাঁকে সসম্মানে প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

সব কথা শুনে হেমো বরফুকণকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপরে তাঁকে নিয়ে গেলেন রাজার সামনে। তিনি বরফুকণকে দেখিয়ে রাজাকে বললেন—আমার দাদা। বড় বিপদে পড়ে এখন তোমার সাহায্যপ্রার্থী। তুমি আমার মুখ চেয়ে এঁকে সাহায্য করো।

রাজা বরফুকণকে বললেন—আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিন্তু প্রতিদানে আপনি আমাকে কি দেবেন?

বরফুকণ উত্তর দিলেন—আমি আপনাকে আসামের রাজধানী রংপুরের সমস্ত সোনা ও রূপা দেব। অসংখ্য হরিণ দেব আর দেব অনেক সুন্দরী যুবতী।

রাজা তখন কামিনী ফুকণ নামে জনৈক রাজকর্মচারীকে আসামে পাঠালেন। কামিনী গোপনে জোড়হাট ও রংপুর ঘুরে গিয়ে রাজাকে খবর দিলেন—বুড়া গোঁহাই রাজ্য চালাচ্ছেন বটে কিন্তু বিপদে পড়লে কেউ তাঁকে সাহায্য করবে না।

একদল শক্তিশালী বর্মী সৈন্য আসাম আক্রমণ করল। সেনাপতি সীমান্তে পৌঁছে বুড়া গোঁহাইয়ের কাছে এক চিঠি পাঠালো। চিঠি পড়ে বুড়া গোঁহাই বুঝতে পারলেন—বরফুকণ খাল কেটে কুমীর নিয়ে এসেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছে। এ আগুনে পুড়ে মরা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তাই তিনি তাঁর চার সেনাপতিকে দেশরক্ষার দায়িত্ব দিলেন। তারপরে নিজের সাত ছেলেকে ডেকে বললেন—আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা রইলে। সব সময় দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিও। সেই রাতেই হীরে চুষে বুড়া গোঁহাই আত্মহত্যা করলেন।

বর্মীরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে এলো। আসামের আঠারোটি সেনাবাহিনী একযোগে শিবসাগরের কাছে ফুলপানীছিগা নামক স্থানে তাদের বাধা দিলেন। সাতদিন সাতরাত ধরে যুদ্ধ চলল।

শেষ পর্যন্ত আহোমদের গোলাগুলি ফুরিয়ে এলো। অসংখ্য আহোম সৈন্য মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁরা পরাজিত হলেন।

আক্রমণকারীরা শিবসাগরে প্রবেশ করল। তারা লুঠতরাজ, হত্যা ও ধর্ষণের এক নতুন নজীর সৃষ্টি করল।···

ভাবনা থামাতে হয় একবার। কারণ এখানেই লোকগীতির প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব। আমি আবার ভেবে চলি—

বর্মীদের অত্যাচার একটু কমে যাবার পরে একদিন রাজমাতা বরফুকণকে নেমন্তন্ন করলেন। বরফুকণ রাজপ্রাসাদে এলেন। রাজমাতা

তাঁর ব্রহ্মদেশে যাবার গল্প শোনার অছিলায় জেনে নিলেন, বরফুক-ণের কোমরে সব সময় বর্ম বাঁধা থাকে, কেবল শৌচকার্যের সময় তিনি তা খুলে রাখেন।

রাজমাতা বুঝতে পারলেন শৌচাগারে যাওয়া কিংবা আসার সময় এই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করতে হবে। তিনি রূপসিংহ বঙাল নামে জনৈক প্রাসাদরক্ষীকে নির্দেশ দিলেন বরফুকণকে হত্যা করার।

পরদিন সকালে রূপসিংহ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। তার পরদিন সকালে বরফুকণ যখন শৌচাগার থেকে বেরিয়ে মাথায় জল ঢালছিলেন, যখন রূপসিংহ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলেন—হে চন্দ্র সূর্য, আমি তোমাদের প্রণাম করি। হে মাতা-ধরিত্রী, আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে মা-কালী তুমি আমার কোনো অপরাধ নিও না, আমি দেশদ্রোহীকে হত্যা করছি।

তিনি তরবারির আঘাতে বরফুকণের দেহ দ্বিখণ্ডিত করলেন।

যথাসময়ে এই হত্যার সংবাদ ব্রহ্মদেশে পৌছল। রাণী কেঁদে-কেটে রাজার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। বললেন—আমি দাদার সমাধি দেখতে যাবো।

রাজা বললেন তুমি নয়, যাবে আমার সবচেয়ে সুযোগ্য সেনাপতি সেগ ফুকণ, যাবে এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে। যেখানে বরফুকণকে হত্যা করা হয়েছে, তার সাতদিনের পথ পর্যন্ত চারিদিকের অঞ্চলে সমস্ত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। তারা যাকে পাবে, তাকেই হত্যা করবে। আহোমদের জোর করে গোমাংস খাওয়াবে।

সেগ ফুকণ সসৈন্যে জোড়হাটে এলেন। বরফুকণের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা শুনলেন। তারপরে রাজার আদেশ কার্যকরী করার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন। বর্মী সৈন্যরা অমরাবতী-আসামকে নরকে পরিণত করল। অসুররা ইন্দ্রপুরী ছারখার করল। রাজকোষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠিত হল। নির্বিচারে যুবকদের হত্যা করা হল, যুবতীরা ধর্ষিত হল। তারপর শুরু হল অগ্নি-

সংযোগ।

দীর্ঘ ছ'বছর ধরে অমরাবতী-আসামে চলল বর্মীদের এই আসুরিক অত্যাচার।

লোকগীতি হলেও বরফুকণের গীতে এই অত্যাচারের কাহিনী মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। এ কাহিনী কাল্পনিক নয়, বাস্তবের ইতিহাস। মেজর জে. বাট্‌লার তাঁর 'Travels and Adventures in the Province of Assam' (১৮৫৫ খ্রীঃ) বইতে এ সম্পর্কে বলেছেন—'all who were suspected of being inimical to the reign of terror were seized and bound by Burmese executioners, who cut off the lobes of the poor victim's ears and choice portions of the body, such as the points of the shoulders, and actually ate the raw flesh before the living sufferers : They then inhumanly inflicted with a sword, deep but not mortal gashes on the body, that the mutilated might die slowly, and finally closed the tragedy by disembowelling the wretched victims.'

অবশেষে আসামকে বর্মীমুক্ত করবার জন্য রাজা বৃটিশদের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা আসাম আক্রমণ করলেন। ভয় পেয়ে বর্মীরা পালিয়ে গেল। আর তাঁরই ফলে স্বাধীন আসাম পরাধীন হল। শুরু হল বৃটিশ শাসন।

১৯

অবশেষে প্রাগজ্যোতিষপুরের মাটি স্পর্শ করা গেল। আমাদের বিমান গৌহাটির বড়ঝাড় বিমানবন্দরে অবতরণ করল।

আমার ভাবনা থেমে গেল। দক্ষিণাদা চোখ মেললেন, সোজা হয়ে বসলেন। দু'জনেই কোমর থেকে সীট বেল্ট খুললাম।

দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কোথায় উঠবে?"

"হোটেলে।"

"কিন্তু ওরা কি তা শুনবে?"

"কারা?"

"ছেলেরা, যারা আমার জন্য গাড়ি নিয়ে আসবে।"

"কিন্তু দাদা, আমি আজ গৌহাটি থাকব না। শহরে যাবার পথেই মা-কামাখ্যাকে দর্শন করে নেবো। তারপরে হোটেলে গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে প্রগতির সঙ্গে দেখা করব। বিকেলেই শিলং রওনা হব।"

"দেখো, ওরা কি বলে?"

টার্মিন্যাল বিল্ডিংস-য়ের দোর গোড়াতেই দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, সোমেশ আসে নি। হয়তো হাইকোর্ট খোলা বলে আসতে পারে নি। সে এলে কিছুতেই আমাকে হোটেলে উঠতে দিত না।

এসেছেন শান্তি আইন ও সুশীল রায়। উভয়েরই বয়স তিনের ঘরে। শান্তিবাবু শিক্ষক সমাজসেবী সুসংগঠক ও সাহিত্যরসিক। এবার জোড়হাট অধিবেশনে তিনি সাহিত্য সম্মেলনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

সুশীলবাবু নীরব কর্মী। তিনি সোমেশ ও শান্তিবাবুর একজন শ্রেষ্ঠ

সহায়। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সর্বদা সাহায্য করে চলেছেন।

ওঁরা আমাদের মালপত্র খুঁজে বের করলেন। সামনেই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। শান্তিবাবু সবিনয়ে দক্ষিণাদাকে বললেন, "জরুরী মামলা থাকায়, বিজয়দাকে কোর্টে চলে যেতে হয়েছে, উনি আসতে পারেন নি। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চলতে শুরু করে। আমরা গৌহাটি চলেছি। বড়ঝাড় থেকে গৌহাটি শহর ১৪ মাইল।

শান্তিবাবুকে বলি, "আপনারা আমাকে নীলাচলের পাদদেশে নামিয়ে দিয়ে যান। আমি কামাখ্যা দর্শন করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে শহরে চলে যাবো।"

শান্তিবাবু আমার দিকে তাকান। কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারার, আগেই দক্ষিণাদা বলে ওঠেন, "তুমি বুঝি ভেবেছো, একাই পুণ্য করবে — আমরা পাপীরা বাদ যাবো?"

শান্তিবাবুরা হেসে ওঠেন। লজ্জা পেয়ে বলি, "না, মানে আপনি তো এর আগেও দর্শন করেছেন কিনা?"

"তাতে কি হয়েছে?" দক্ষিণাদা বলেন, "মাতৃ-দর্শনের কি শেষ আছে?"

"আপনিও কি আজ দর্শন করবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

ভাবি ভালোই হল, দর্শন শেষে এই গাড়িতে করেই শহরে পৌছন যাবে। ওঁরাই আমাকে একটা হোটেল ঠিক করে দেবেন।

না, হোটেলের কথা ভাবছি না আমি। এমন কি মা-কামাখ্যার কথাও ভাবছি না। আমি দুচোখ ভরে দেখছি অমরাবতী-আসামকে, তারই কথা ভেবে চলেছি।

ভেবেছিলাম গৌহাটি আসামের বৃহত্তম নগরী। এখানে এসে আর অত সবুজ চোখে পড়বে না। কিন্তু আজও আমার পথের পাশে সবুজের মেলা। তারই ফাঁকে ফাঁকে টিন ও কাঠের বাড়ি কিংবা খড় ও মাটির

ঘর। আর দূরে—যেখানে সমতলের ক্ষেত-খামার কিংবা বন-জঙ্গল শেষ হয়েছে, সেখানে নীলকান্ত মণির মতো নীল পাহাড়।

হিমালয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় পঁচিশ বছরের। এতকাল জেনে এসেছি ছোট-পাহাড়কে দূর থেকে ধূসর দেখায়, কাছে গেলে সবুজ কিংবা কালো। এবার আসামে এসে জানতে পারলাম পাহাড় হতে পারে নীল—নীলমণি নীলগিরি। তাই বোধ করি কামাখ্যা পাহাড়ের নাম নীলাচল। মসৃণ ও প্রশস্ত পথ দিয়ে আমরা এখন সেদিকেই চলেছি।

আজ আমার বড়ই সৌভাগ্যের দিন। মা-কামাখ্যা কৃপা করেছেন আমাকে, আমি আজ দর্শন করব তাঁকে। মন্দিরময় ভারতের বহু মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি পুরী থেকে বেট-দ্বারকা, কাশ্মীর থেকে কুমায়ুনের কিছু কিছু মন্দির দর্শন করেছি। কিন্তু এর আগে আমার আর আসা হয় নি আসামে, দেখা হয় নি কামাখ্যা। আজ আমি কামাখ্যা দর্শন করব।

তাহলেও আমি কিন্তু এখন কামাখ্যা মন্দিরের কথা ভাবছি না। ভেবে চলেছি আসামের কথা—অমরাবতী-আসাম।

২৮°১৫´ ও ২২°১৯´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৯°৪২´ ও ৯৭°১২´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই অপরূপা-আসাম। বর্তমান আসামকে তিনটি প্রাকৃতিক ভাগে করা যায়—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বরাক উপত্যকা এবং দুই উপত্যকা মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আসামের প্রধান অংশ আর আমার বর্তমান ভ্রমণও ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে। অদূর ভবিষ্যতে বরাক উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের বাসনা রয়েছে। তখন ভাবা যাবে সেই দুটি অঞ্চলের কথা। এখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথাই ভাবা যাক।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রায় পাঁচশ' মাইল লম্বা ও পঞ্চাশ মাইল চওড়া। উপত্যকার তিনদিকে পর্বতশ্রেণী, একদিকে বাংলার সমতল। এই পশ্চিমদিক দিয়েই আসাম কেবল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সঙ্গে যুক্ত।

শুধু অবস্থান নয়, আসামের ভৌগোলিক অবস্থাও অত্যন্ত
ছোট-বড় পাহাড়, বন-জঙ্গল ও জলাভূমি, নদী-নালা ও উপত্যকা নিয়ে এই রাজ্যের বিচিত্র ভূপ্রকৃতি। তাই শ্রদ্ধেয় ডঃ নির্মলকুমার বসু তাঁর 'Assam in Ahom age' বইতে বলেছেন, 'Assam is not only an integral and important part of India; she epitomises India in a very real sense, she being, a replica of India in a miniature…'

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আসামের সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। প্রখ্যাত মানবতাত্ত্বিক ডঃ বসুর ভাষায়—'Geographical factors have made Assam an "Anthropological Museum" by reducing contacts inter se amongst the diverse races and tribes living in the hills and the plains…'

এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও আসামের মানুষ কিন্তু আর্যসভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন নি। তাঁরা আর্য ভাষা ও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। চাতুর্বর্ণ্য সমাজ এবং চতুরাশ্রম প্রথা মেনে নিয়েছেন। অনার্য এবং উপজাতীয় সামাজিক প্রথা ধীরে ধীরে আর্যায়িত হয়েছে।

সেকালের মতো একালেও আসামের অর্থনীতি মোটামুটি ভাবে কৃষি-নির্ভর। পশুপালন এবং মৎস্যশিকার করেও বহু লোক জীবনধারণ করেন। সেকালে বন্যজন্তু শিকার যাঁদের পেশা ছিল, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য তাঁদের উত্তরপুরুষদের একালে বৃত্তি বদলাতে হয়েছে।

কুটিরশিল্প আসামের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। শিল্পচাতুর্য এবং সৌন্দর্যের জন্য আসামের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ভারতের গৌরব।

আসামের স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর, তবে গুপ্ত ও পালযুগের শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত।

অসমীয়া সাহিত্য শুধু সমৃদ্ধ নয়, সুপ্রাচীনও বটে। অসমীয়া সাহি-

ত্যের সমৃদ্ধি শুরু হয় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবাচার্য শঙ্করদেব আসামের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মজগতে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন। মনে মনে সেই সুমহান সংস্কারকের কথা ভেবে চলি।

গীতিকার, নাট্যকার, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব ভারতের একটি অবিস্মরণীয় নাম। এখনও আসামে প্রতিবছর শঙ্করদেব তিথি পালিত হয়। আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে মহাসমারোহে এই যুগাবতারের ৪০৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হবে।

প্রবল সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেব আসামের মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। স্বর্গদেব নরনারায়ণ সিংহ (সুসেনফা, ১৪৩৯-৮৮ খ্রীঃ) তখন আহোম রাজা। শঙ্কর ও তাঁর পিতা কুসুমবর কোচ-নৃপতি বিশ্ব সিংহের (১৫১৫-১৫৪০ খ্রীঃ) অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কামরূপ ছেড়ে আহোম রাজ্যে চলে যান। শেষ বয়সে অবশ্য শঙ্করদেব আবার কামরূপে ফিরে আসেন এবং এখানেই দেহরক্ষা করেন।

তৎকালীন দিশাহারা সমাজের কাছে শঙ্কর প্রথম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মতবাদের কথা বললেন। তাঁর উপদেশ ঘুণেধরা সমাজের সমস্ত সংকীর্ণতাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আপামর জনসাধারণ উপলব্ধি করলেন—শঙ্করদেবের বাণী মুক্তির বাণী, বেঁচে থাকার বীজমন্ত্র।

শঙ্কর বললেন—হত্যা নয়, প্রার্থনাই মানুষকে ঈশ্বরেন সন্নিধানে নিয়ে যেতে পারে। পুজো নয় ভক্তির ভেতরেই রয়েছে মুক্তির পথ।

এই ছিল শঙ্করদেবের বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কারের সারমর্ম। আর তারই ফলে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক আসামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রেনে-শাঁস বা নবযুগ রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে শঙ্করদেব যে সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে গিয়েছেন, মহাকাল একালেও তা মুছে ফেলতে পারে নি। আধুনিকতার বন্যায় সে ব্যবস্থা এখনও যায় নি ভেসে। আজও গ্রাম প্রধান আসামের গ্রামে গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত থান-সত্র ও নামঘর পল্লীসমাজের

সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

শঙ্করদেবের আবির্ভাব আসামের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। তখন শাক্তধর্মের দোহাই দিয়ে স্বার্থপর পুরোহিতরা আসামের সমাজ-জীবনে স্থায়ী দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা ধর্মের নামে নর-বলি পর্যন্ত দিতেন। এই সময় শঙ্কর উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণভক্তি মুক্তির একমাত্র পথ।

কথাকথিত তান্ত্রিকদের অত্যাচারে তখন বাংলার সামাজিক অবস্থাও ছিল একই রকম। ধর্মান্ধ শাসকদের জন্য সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অশেষ দুর্গতি। আর তাই বোধকরি আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

একই যুগে দুটি পাশাপাশি রাজ্যে এমন দু'জন যুগাবতারের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর। Dr. R. C. Muirhead-Thomson তাঁর 'Assam Valley' বইতে এ সম্পর্কে লিখেছেন —'A similar revival of Vaishnaism at this time was taking place in Bengal under the great reformer Chaitanya ; and it is probably from him that Sankardeb gained much of his inspiration and ideas.' তার মানে পাঁচশ' বছর আগের থেকেই আসাম এবং বাংলা একই চিন্তা ও আদর্শের অংশীদার।

যাক্ গে সেকথা, আবার শঙ্করদেবের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শকরদেব ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেব লোকশিক্ষাকে ধর্মপ্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় রূপে মেনে নিয়েছিলেন। অভিনয় ছিল সেই লোকশিক্ষার প্রধান বাহন। তাঁরা সাধারণত সংস্কৃত গীতিনাট্যের ভেতর দিয়ে ধর্মপ্রচার করতেন। কারণ শঙ্করদেব শুধু পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার, নাট্যকার, অভিনেতা, শিল্প-নির্দেশক ও পরিচালক। ফলে তাঁর ধর্মবিপ্লব আসামের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকেও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শঙ্করদেব একজন ক্লান্তিহীন পর্যটক ছিলেন। ১৪৮৩ থেকে ১৪৯৫

খ্রীষ্টাব্দ, দীর্ঘ বারো বছর ধরে তিনি সারা ভারতভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণ-কালে তিনি যেখানে যা কিছু গ্রহণযোগ্য পেয়েছেন, তা সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছেন আসামের মানুষের জন্য।
অবশেষে ১২০ বছর বয়সে ১৫৬৮/৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যুগাবতার শঙ্করদেব এই কামরূপের মাটিতে দেহরক্ষা করেন।

"এ জায়গাটাকে বলে কাটিং। এখান থেকেই নীলাচলে ওঠার মোটর-পথ শুরু হয়েছে।"
শান্তিবাবুর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। আমি বৈষ্ণবাচার্য শঙ্কর-দেবের জীবনপথ থেকে শক্তিপীঠ কামাখ্যার পথে ফিরে আসি। তাকিয়ে দেখি আঁকাবাঁকা মসৃণ চড়াই পথ বেয়ে গাড়ি ওপরে উঠছে। এক-পাশে ঝোপঝাড় ও গাছপালায় ছাওয়া পাথুরে পাহাড়। আরেকপাশে খানিকটা নিচে সবুজ সমতল। মাঝে মাঝেই গুলঞ্চ ফুলের মেলা।
সুশীলবাবু বলেন, "১৯৫৮ সালে ভারত সরকার এই মোটরপথ তৈরি করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তৎকালীন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ এই পথ উদ্বোধন করেন। তার আগে যাত্রীদের পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হত।"
কথাটা আমার অজানা নয়। মা ও বাবার কাছে আমি শুনেছি সেই পথের কথা। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে আমি সেপথের বর্ণনাও পড়েছি—'The path is steep, and the rocks have been worn to a slippery smoothness by the feet of generations of pilgrims······huge pepul and rubber trees cast their shadows over the path. At either end it passes through an archway of fine masonry, and here and there the rocks along the side have been hewn into the semblance of quaint Hindu gods.'

দুর্ভাগ্য আমার। মা-কামাখ্যা আমাকে বড্ড দেরিতে ডাক দিলেন। লক্ষ লক্ষ ভক্তের পদরেণু রঞ্জিত সেই ছায়াশীতল মসৃণ পথে পদচারণার সুযোগ পেলাম না আমি।

তাহলেও পথের কথাই জিজ্ঞেস করি শান্তিবাবুকে। বলি, "আজকাল কি পাহাড়ে ওঠবার এই একটাই পথ?"

"তাই বলা যেতে পারে।" শান্তিবাবু উত্তর দেন। বলেন, "কথিত আছে কামাখ্যা পাহাড়ে প্রথম পথ নির্মিত হয় মহাভারতের যুগে। নির্মাণ করেন অসুররাজ নরক। তিনি নাকি চারদিক থেকে চারটি পথ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তীর্থারোহণ বিধিতে বলা হয়েছে—পুব-দিকের পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠলে ধনলাভ হয়। উত্তরের পথ দিয়ে উঠলে মুক্তিলাভ, পশ্চিমের পথে রাজ্যলাভ এবং দক্ষিণের পথে মৃত্যুলাভ অর্থাৎ অকালমৃত্যু। কাজেই কেউ কোনোকালে দক্ষিণদিকের পথ দিয়ে নীলা-চলে উঠতেন না। তবে আগে যাত্রীরা সুবিধামতো অপর তিনটি পথ দিয়ে কামাখ্যা দর্শনে আসতেন। তুলনায় অবশ্য পশ্চিমের পথ মানে হনুমন্তদ্বার দিয়েই বেশি যাত্রী ওঠা-নামা করতেন। কারণ গোলকপুরের (ময়মনসিংহ) মহারাজা হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী সে পথটির সংস্কারসাধন করে দিয়েছিলেন। গাড়ির এই পথ তৈরি হয়ে যাবার পরে সবাই পুব-দিকের এই পথ দিয়েই পাহাড়ে উঠছেন।"

"আচ্ছা এ রাস্তাটি কি মন্দির পর্যন্ত গিয়েছে?"

"ঠিক মন্দির নয়, একটু আগে মোটর স্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে কয়েক পা হাঁটলেই মন্দির। তবে পথটা সেখানে শেষ হয় নি, নীলাচলের উচ্চতম শৃঙ্গ ভুবনেশ্বরী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। আপনারা মন্দিরের পথে কামা-খ্যার দ্বারপাল সিদ্ধগণেশ ও অগ্নিবেতালের মূর্তি দেখতে পাবেন।"

শান্তিবাবু চুপ করেন। কেন যেন সবাই নীরব রয়েছেন। আমিও কোনো কথা বলি না। চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। গাড়ি চড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠছে। আমি কামাখ্যা পাহাড়ে উঠছি। আরও অনেক-খানি উঠতে হবে। কামাখ্যা শহরের উচ্চতা ৯৬১ ফুট।

শহর! হ্যাঁ, কামাখ্যা এখন একটি শহর হিসেবে স্বীকৃত। অবস্থান ২৬°১০´ উত্তর অক্ষরেখা ও ৯১°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায়। আয়তন ২ ৫৯ বর্গ কিঃ মিঃ। ১৯৫৪ সালের আদমশুমার অনুযায়ী ১১৬৪টি বাড়িতে সেখানে ৬৬৯৭ জন মানুষ বাস করেন। তাঁদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ২৭৯৯ জন।

তবে সে শহর গড়ে উঠেছে মন্দিরকে অবলম্বন করে—কামাখ্যা মন্দির। কামদা, কামা, কামিনী কামাঙ্গদায়িনী, কামাঙ্গনাশিনী ও কান্তা কামাখ্যার মন্দির। কালিকাপুরাণে ভগবান বলেছেন -এই মহাদেবী নিজের অভিলাষ পূরণের জন্য আমার সঙ্গে নীলকূট পর্বতে এসেছেন, তাই তাঁর নাম কামাখ্যা।

আমরা এখন সেই নীলকূট পর্বত তথা নীলাচলে আরোহণ করছি, যেখানে মহেশ্বরের সঙ্গে মহেশ্বর চিরবিরাজমানা। কথিত আছে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীদেহের যোনিমণ্ডল এখানে পড়ে শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই পাথরই কামাখ্যা। ঐ শিলা স্পর্শ করলে মানুষ দেবত্ব লাভ করে আর দেবতারা লাভ করেন ব্রহ্মত্ব। কামাখ্যা কেবল মর্তের মানুষদের মহাতীর্থ নয়, স্বর্গের দেবতাদেরও পরমতীর্থ।

কালিকাপুরাণ, চূড়ামণিতন্ত্র ও শিবচরিত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে একান্নটি মহাপীঠ ও ছাব্বিশটি উপপীঠের কথা রয়েছে। বেলুচিস্তানের হিংলাজ থেকে আসামের নীলাচল—ভারত ও পাকিস্তানের বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে এই সাতাত্তরটি শক্তিপীঠ, যেখানে সতীদেহের বিভিন্ন অংশ পড়েছে। এখানে এই কামরূপে পড়েছে মহামুদ্রা অর্থাৎ যোনি-অঙ্গ। আমি সেই কাহিনী স্মরণ করতে থাকি—

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তখন জগৎ সৃষ্টি শুরু করেছেন। হঠাৎ একদিন তাঁদের নজর পড়ল মহাযোগী মহাদেব মহাযোগে তন্ময় হয়ে রয়েছেন। প্রলয়-কর্তা উদাসীন হয়ে থাকলে সৃষ্টি ও স্থিতি অচল হয়ে পড়বে। তাই ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র দক্ষকে ডেকে বললেন—এখুনি জগন্মাতার পূজা আরম্ভ কর। দেবী দর্শন দান করলে তাঁকে ব'লো, তিনি যেন তোমার কন্যা-

রূপেও জন্মগ্রহণ করে শিবের পত্নী হন।

কঠোর তপস্যার পরে জগজ্জননী দক্ষের সামনে আবির্ভূতা হলেন। দক্ষের নিবেদন শুনে তিনি বললেন—তথাস্তু। কিন্তু তুমি কখনও আমাকে অনাদর করলে আমি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করব।

প্রজাপতি দক্ষ সে শর্ত মেনে নিলেন।

যথাসময়ে মহামায়া দক্ষপত্নী বারিণীর গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যৌবন প্রাপ্তির পরে সতী শিবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করলেন। দক্ষ মহাসমারোহে শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ে দিলেন। নবদম্পতি কৈলাসে চলে গেলেন।

কিছুকাল পরে দেবরাজসভায় একদিন শিবের সঙ্গে দক্ষের দেখা হল। সতীনাথ দক্ষকে কোনো বিশেষ সম্মান দেখালেন না। শ্বশুর ক্ষেপে গেলেন। জামাইকে অপমান করার জন্য তিনি এক শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করলেন। দেবর্ষি নারদকে ডেকে বললেন শিব ও সতী ছাড়া সবাইকে নেমন্তন্ন কর।

নারদ দক্ষের নির্দেশ পালন করলেন বটে কিন্তু তিনি একদিন কৈলাসে গিয়ে কথাটা সতীকে বলে দিলেন।

সতী স্বামীর কাছে বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি চাইলেন। শিব সম্মত হলেন না। ক্ষুব্ধা মহাদেবী তখন দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে ভোলানাথের সম্মতি আদায় করে নিলেন।

তিনি পিত্রালয়ে এলেন, দক্ষযজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সুযোগ পেয়ে দক্ষ সতীর সামনেই শিবনিন্দা শুরু করে দিলেন।

পতিপরায়ণা সতী স্বামী নিন্দা সইতে পারলেন না। তিনি লজ্জা ও ঘৃণায় ম্রিয়মানা হয়ে পড়লেন, যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করলেন।

দুঃসংবাদ কৈলাসে পৌঁছল। প্রিয়তমার অপমৃত্যুতে সদাশিব হয়ে উঠলেন ক্ষুব্ধ। বীরভদ্র ও অন্যান্য অনুচরদের নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। দেখলেন সতীর প্রাণহীন দেহ পড়ে রয়েছে। শোকে ও দুঃখে বিচলিত নটরাজ অনুচরদের আদেশ দিলেন—

তোমাদের মাকে মেরে ফেলেছে। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও।

বীরভদ্র ও তাঁর সঙ্গিরা দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিল। তারা দক্ষের গলা কেটে ফেলল।

দক্ষপত্নী বারিণী ছুটে এলেন শিবের সামনে। তিনি নীলকণ্ঠের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেন।

শত হলেও বারিণী তাঁর প্রাণপ্রিয়া সতীর জন্মদাত্রী। সুতরাং আশুতোষ তাঁর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখতে পারলেন না। দক্ষরাজের গলায় একটি ছাগ-মুণ্ড লাগিয়ে তিনি তাঁকে প্রাণদান করলেন। তারপরে প্রিয়তমার প্রাণ-হীনা দেহ তুলে নিলেন কাঁধে।

সতীদেহ কাঁধে নিয়ে শিব পাগলের মতো ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে থাক-লেন। ব্রহ্মা প্রমাদ গনলেন। তাঁর সৃষ্টি যে রসাতলে যায়। দেবতাদের নিয়ে তিনি ছুটে এলেন বিষ্ণুর কাছে। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন---সতী-দেহ চিন্ময় বস্তু। শিবদেহের স্পর্শে সে দেহের অবিনশ্বরতা বেড়ে গিয়েছে। আপনি মহাদেবকে দেবীর দেহমুক্ত করুন, মহেশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হোক।

জগৎপালক বিষ্ণু তখন জগতের মঙ্গলের জন্য সুদর্শন চক্রের সাহায্যে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে ভারতের সাতাত্তর স্থানে স্থাপন করলেন। সৃষ্টি রক্ষা পেলো।

সংবাদ শুনে দেবতারা খুশি হলেন। তাঁরা তখন সংসারত্যাগী শিবকে আবার কি ভাবে বিয়ে দেওয়া যায়, তাই ভাবতে থাকলেন। ভাবনা-চিন্তার পরে দেবতারা নারদকে হিমালয়ের কাছে পাঠালেন। কারণ দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করে পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

খবর পেয়ে পার্বতীর মা মেনকাও ছুটে এলেন সেখানে। নারদ গিরি-রাজ ও মেনকাকে দেবতাদের মনোবাসনার কথা জানালেন। শিবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে, মা-বাপ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

নারদ হিমালয়কে বললেন—সতীর বিরহে কাতর মহাদেব এখন আপ-

নার রাজ্যে কোথাও ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। আপনারা তাঁকে খুঁজে বের করুন। তারপরে তাঁর সেবা-পূজা করবার জন্য পার্বতীকে সেখানে পাঠিয়ে দিন। একদিন না একদিন তার প্রতি মহাদেবের নজর পড়বেই। আর চন্দ্রশেখর একবার উমাকে দেখলে আবার সংসারী হতে চাইবেন।

দেবর্ষি নারদের নির্দেশমতো হিমালয় ধূর্জটীর ধ্যানস্থল খুঁজে বের করলেন। সখীদের সঙ্গে নিয়ে উমা সেখানে গেলেন। তিনি প্রতিদিন শিবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর আরাধনা করতেন কিন্তু যোগমগ্ন মহাদেব চোখ মেলতেন না। উমা অবশ্য বিরুপাক্ষের আচরণে মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি জানতেন একদিন না একদিন উমানাথ কৃপা করবেন তাঁকে। কিন্তু দেবতারা বিচলিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কামদেব মদনকে আদেশ দিলেন—হিমালয়ে গিয়ে গিরিশের ধ্যানভঙ্গ কর। তিনি যাতে পার্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার ব্যবস্থা করা চাই।

পত্নী রতিকে নিয়ে কামদেব কৃত্তিবাসের তপস্যাস্থলে উপস্থিত হলেন। দেখলেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটীর পাশে পার্বতী করজোড়ে রয়েছেন দাঁড়িয়ে। তিনি ত্রিলোচনের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপরে তাঁর দেহে ক্রমাগত কাম-কুসুম শর নিক্ষেপ করতে থাকলেন।

ত্রিলোচনের ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। দেখতে পেলেন কামদেবকে, তাঁর হাতে তখনও কাম-ধনু। শুধু তাই নয়, মহেশ দেখতে পেলেন তাঁর সামনে অসংখ্য কাম-কুসুম শর পড়ে রয়েছে।

শংকর বুঝতে পারলেন, কিভাবে কামদের তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করেছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে প্রলয়-শিখা বেরিয়ে এলো। রুদ্রনাথের কোপানলে মদন ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাদেব মুখ ফেরালেন। দেখতে পেলেন পার্বতীকে। তিনি উমার মুখে সতীর মুখশ্রী অবলোকন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিব শান্ত হলেন। তিনি পার্বতীর প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করলেন।

তারপরেই কিন্তু ভোলানাথ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি তপস্যা-

স্থল পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ করলেন। পার্বতী অনুসরণ করলেন তাঁকে। কিন্তু একটু বাদেই ব্যোমকেশ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পার্বতী তখন সেই বনে শিবের তপস্যায় বসলেন।

শেষ পর্যন্ত ভবনাথকে আবার আসতে হল পার্বতীর সামনে। উমানাথ ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে উমাকে দর্শন দিলেন। পার্বতীর কিন্তু চির-আরাধ্যকে চিনতে কোনো অসুবিধে হল না।

তুষ্ট শিব তখন পার্বতীকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৈলাসে রওনা হলেন। পথে নারদের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। সব শুনে নারদ ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে।

অবশেষে ত্রিযুগীনারায়ণের (কেদারনাথের পথে শোণ প্রয়াগের কাছে) পূণ্যভূমিতে প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে হিমালয় কৈলাসপতির হাতে উমাকে সম্প্রদান করলেন। হর-পার্বতী বিয়ের কুশণ্ডিকা যজ্ঞের অখণ্ড-ধুনি তিনযুগ ধরে সেখানে জ্বলছে বলে সেই পুণ্যতীর্থের নাম ত্রিযুগী-নারায়ণ। কিন্তু ত্রিযুগীনারায়ণের কথা থাক, কামরূপ-কামাখ্যার কথাই ভাবাযাক। ফিরে আসি মদন-ভস্মের প্রসঙ্গে। ত্রিলোচনের কোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হবার পরে মদনপত্নী রতি রুদ্রনাথের সামনে অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন, কিন্তু শিব তাঁকে কৃপা করেন নি। রতি তখন দেবতাদের দোষারোপ করলেন। বললেন—আপনাদের জন্যই আমি আজ স্বামীহারা। আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনেই তিনি ধূর্জটীর ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়েছিলেন, আর তাই আমাকে আজ বৈধব্যের দুঃসহ জ্বালা সইতে হচ্ছে।

দেবতারা রতিদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মা, তুমি ভয় পেয়ো না, নিরাশ হয়ো না। ভোলানাথ চিরকাল কারও প্রতি বিরূপ থাকতে পারেন না। অদূর ভবিষ্যতে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন তোমাকে। তুমি বরং এক কাজ করো।

—কি? চোখ মুছে রতি জিজ্ঞেস করলেন।

দেবতারা বললেন— তোমার স্বামীর একমুঠো চিতা ভস্ম নিয়ে ত্রিযুগী-

নারায়ণে চলে যাও। হর-পার্বতীর বিয়ের সময় সুযোগ বুঝে আমরা শিবকে দিয়ে তোমার স্বামীকে পুনর্জীবিত করব।

তাই করেছিলেন শিব। দেবতাদের অনুরোধ ও রতির প্রার্থনায় শূল-পাণি তাঁর সুধাময় দৃষ্টি দিয়ে ভস্মরাশি থেকে কামদেবকে পুনর্জীবিত করলেন। কিন্তু কামদেব তাঁর স্বরূপ ফিরে পেলেন না। রতি ও মদন আবার মহাদেবের করুণা ভিক্ষা করলেন।

করুণাময় কেদারনাথ তখন কামদেবকে বললেন—ভারতের ঈশান কোণে নীলাচল নামে এক পাহাড় আছে। সেখানে সতীদেহের যোনি-অঙ্গ পড়ে অপ্রকট হয়ে রয়েছে। তুমি নীলাচলে চলে যাও। দেবীর মহিমা প্রচার করে সেই শক্তিপীঠকে প্রকট করে তোলো।

মদন ও রতি তখন এলেন এখানে, ভক্তের চিরবাঞ্ছিত পুণ্যধামে। তাঁরা ভক্তিভরে জগন্মাতার মহামুদ্রার সেবা-পূজা করলেন। কামদেব কামাখ্যার কাছে প্রার্থনা করলেন করুণা।

করুণাময়ী কামাখ্যা মদনকে কৃপা করলেন। কামাখ্যার আশীর্বাদে কামদেব তাঁর রূপ ফিরে পেলেন। আর সেদিন থেকেই এই পুণ্যভূমির নাম হল কামরূপ।

২০

একফালি সমতলে এসে গাড়ি থামল। ডানদিকে এবং সামনে বহু বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাট। আমরা নীলাচলের শিখরে অর্থাৎ শহর কামাখ্যায় উপনীত।

গাড়িতে জুতো রেখে পথে নেমে আসি। শান্তিবাবুর পেছনে এগিয়ে চলি নাতি প্রশস্ত মসৃণ পথে। পথের পাশে সারি-সারি দোকান। কেদারনাথ থেকে কালীঘাট, ভারতের যেকোনো তীর্থের সঙ্গে মিল রয়েছে এই কামাখ্যা বাজারের।

কয়েক পা এগিয়েই দেখতে পাই মন্দির-শিখর। গম্বুজাকৃতি শিখর। আমার পরলোকগত পিতৃদেব যে মন্দিরের কথা আমাকে প্রথম বলে-ছেন, আসাম রওনা হবার সময় আমার মা যে মন্দির দর্শন করতে বলে দিয়েছেন, যে মন্দির অদর্শনের বেদনা বহুবছর ধরে আমাকে বিচ-লিত করে তুলেছিল —আমি মহামায়ার সেই মহামন্দিরের দ্বারপ্রান্তে। জগজ্জননী কামেশ্বরী কৃপা করেছেন। আজ আমার বহু বছরের বাসনা পূর্ণ হবে। আমি মা-কামাখ্যাকে প্রণাম করি।

সিদ্ধপীঠ কামাখ্যা মন্দির তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমে চৌচালা নামঘর—বেশ বড়। তারপরে ছ'টি ছোট-বড় গম্বুজ সুশোভিত মাঝারী আকারের নাট-মন্দির। শেষে সুবিশাল গম্বুজাকৃতি গর্ভমন্দির।

এই সেই কামরূপ-কামাখ্যা, যেখানে এসে দেবীর মহিমা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে কামদেব পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছিলেন। আমি পুনরায় প্রণাম করি।

শান্তিবাবু পাণ্ডাজীকে ডাকতে গিয়েছেন। দক্ষিণাদার পাশে দাঁড়িয়ে সুশীলবাবু কামরূপের কথা শুরু করেন। বলেন, "কামরূপের আগের

নাম ধর্মারণ্য। কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ। রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন তন্ত্র ও পুরাণে কামরূপের নাম পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম'-য়ে কামরূপের উল্লেখ করেছেন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই কামরূপ যোগী ও মুনি-ঋষিদের তপস্যাভূমি। যোগিনীতন্ত্রের মতে কামরূপ পুরাকালে কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও সৌমারপীঠে বিভক্ত ছিল।..."

"আপনি কামপীঠের কথা বলুন।" অনুরোধ করি।

সুশীলবাবু বলেন, "যেখানে কামাখ্যাদেবী অধিষ্ঠিতা, সেখানেই কামপীঠ।"

"তার মানে এই মন্দির?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এবার তাহলে মন্দিরের কথা বলুন।"

সুশীলবাবু শুরু করেন, "আপনারা জানেন, তবু বলছি, বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে ধরিত্রীগর্ভে অসুররাজ নরকের জন্ম হয়। তিনি রাজর্ষি জনকের গৃহে ধাত্রীরূপী ধরিত্রীর কাছে প্রতিপালিত হন। সুতরাং তাঁর মা অসুরবংশীয়া হলেও তিনি আর্যভাবাপন্ন ছিলেন।

"কালক্রমে নরক পিতার কাছ থেকে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য অর্থাৎ এই কামরূপ লাভ করেন। তিনি বিদর্ভরাজের কন্যা মায়াকে বিয়ে করেন। নারায়ণ তাঁকে বলেছিলেন—জগন্মাতা মহামায়া কামাখ্যা ছাড়া আর কোনো দেবীর উপাসনা করো না।

"নরক পিতার পরামর্শ মেনে চললেন। কামাখ্যায় তিনি মন্দির নির্মাণ করলেন। দেবী কামাখ্যার কৃপায় তিনি খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। শক্তিমদে মত্ত নরক দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল নিয়ে এলেন।

"কামাখ্যা কিন্তু এই কুকীর্তির জন্য নরকের প্রতি মোটেই অপ্রসন্না হন নি। বরং তিনি তাঁর বীরত্বে খুশি হয়ে একদিন ভগবতী রূপে দর্শন দিলেন তাঁকে। নরক মহামায়ার মোহিনীরূপে মোহিত হলেন। তিনি

দেবীকে বলে বসলেন—আমি তোমাকে বিয়ে করব।

"দেবী বুঝতে পারলেন, নরকের মৃত্যু আসন্ন। তাই তিনি তাঁকে বললেন—তুমি যদি একরাতের মধ্যে এই পাহাড়ে উঠবার জন্য চারদিক থেকে চারটি পথ এবং এই মন্দিরের কাছে একটি বিশ্রামগৃহ নির্মাণ করে দিতে পারো, তাহলে আমি তোমার গলায় মালা দেব। কিন্তু মনে রেখো সূর্য ওঠার আগেই কাজ শেষ করতে হবে, নইলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

"মহামায়ার মায়ায় মোহিত নরক সানন্দে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। কাজ আরম্ভ হল। দুপুর রাতের মধ্যে পথ চারটি নির্মিত হয়ে গেল। নরক বিশ্রামগৃহ নির্মাণের কাজে হাত লাগালেন।

"দেবী প্রমাদ গণলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে ছলনার আশ্রয় নিতে হল। তিনি মায়াবলে একটি মোরগ সৃষ্টি করলেন। মোরগ ডাকতে শুরু করে দিল।

"রাত শেষ হয়ে গিয়েছে ভেবে নরক বিশ্রামগৃহের কাজ বন্ধ করে দিলেন। কামাখ্যার কথা মনে পড়ল তাঁর। দেবী বলেছেন—মনে রেখো, সূর্য ওঠার আগেই তোমাকে কাজ শেষ করতে হবে, নইলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

"নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য নরক সেই মোরগটিকে দায়ী করলেন। ক্রুদ্ধ-রাজা ক্ষুব্ধ চিত্তে তার পেছনে ছুটলেন। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে গিয়ে তিনি মোরগটিকে বধ করলেন। মহারাজা নরকের সেই মোরগ তথা কুক্কুট-বধের স্থানটিকে আজও সবাই 'কুকুরাকাটাচকী' বলে থাকেন।"

অসুররাজ নরকের পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছিল। দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল উদ্ধার করতে এসে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করেছিলেন। কিন্তু সে-কাহিনী আমাদের আলোচ্য নয়। নীলাচলের পথ ও কামাখ্যামন্দিরের প্রথম নির্মাতা এবং মহাবীর ভগদত্তের বীরপিতা অসুররাজ নরকের নাম কামাখ্যার যাত্রীরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

"আচ্ছা, রাজা নরকের নামে কোনো স্মৃতিচিহ্ন এখানে আছে কি?"

দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।

সুশীলবাবু উত্তর দেন, "আছে।"

"কোথায়?"

"পাণ্ডুঘাট থেকে যে পথটি এই পাহাড়ের ওপর উঠে এসেছে, তারই ধারে নরকশিলা নামে একখানি পাথর আছে। আর পাণ্ডু-গৌহাটি রাজপথের পাশে রয়েছে নরকাসুর পর্বত।"

"এবারে তাহলে তুমি আবার কামাখ্যা মন্দিরের কথা বলো।"

দক্ষিণাদা সুশীলবাবুকে পুরনো প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেন।

সুশীলবাবু শুরু করেন, "কালক্রমে কামাখ্যা আবার অপ্রকট হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে আদিগুরু শঙ্করাচার্য ভারতবাসীর কাছে নতুন করে কামাখ্যাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করলেন। অনেকে বলেন আচার্য শঙ্কর কামাখ্যা দর্শনে এসেছিলেন। তিনি তৎকালীন কামরূপের প্রখ্যাত পণ্ডিত অভিনব গুপ্তের সঙ্গে সুদীর্ঘ সময় শাস্ত্রালোচনা করেছেন।

"সে যাই হোক্, এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে শঙ্করের দিগ্বিজয়ের পরে স্থানীয় জনসাধারণ আবার এই পুণ্যপীঠ খুঁজে বের করেন। এবং শিবাবতার শঙ্করাচার্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই ষোড়শ শতাব্দীতে কমতাপুরী অর্থাৎ কোচবিহারের রাজা বিশ্ব সিংহ কামরূপ অভিযানের সময় লুপ্ত কামাখ্যা উদ্ধার করেন। তিনি এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। কিন্তু সে মন্দির বেশিদিন মাথা উঁচু করে থাকতে পারে নি। কারণ তারপরেই কালাপাহাড় আসামে এসেছে।

"কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলার কয়েকবছর পরে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব সিংহের ছেলে কোচরাজ নরনারায়ণ (১৫৪০-১৫৮৪ খ্রীঃ) ও তাঁর ভাই চিল্লারায় এই মন্দিরের আমূল সংস্কারসাধন করেন। কথিত আছে প্রথমে নাকি পাথর দিয়ে সেই মন্দির তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পাথরের দেওয়াল বার বার ভেঙে পড়তে থাকে। তাই ঘিয়ে ভাজা ইট দিয়ে মন্দির তৈরি করা হয়। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে তাঁরা মন্দির তৈরি

শেষ করেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মন্দির তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ভিতের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আজও এখানে তাঁদের স্থাপিত শিলালিপি রয়েছে। অবশ্য এই মন্দিরে আরও কয়েকখানি শিলালিপি আছে।"

"কোন্ কোন্ রাজার ?" দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।

সুশীলবাবু উত্তর দেন, "আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহ (১৭৫১-১৭৬৯ খ্রীঃ) ও গৌরীনাথ সিংহের (১৭৮০-১৭৯৪খ্রীঃ) শিলালিপি রয়েছে এখানে।"

একবার থামেন শান্তিবাবু। তারপরে আবার বলেন, "নরনারায়ণ ও চিল্লারায় কেবল মন্দির নির্মাণ করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি। ভবিষ্যতের সেবাপূজার জন্য বাংলা থেকে ব্রাহ্মণ আনিয়ে তাঁদের ভূসম্পত্তি দান করেন। আজও সেই বংশের ব্রাহ্মণরা কামাখ্যার সেবাইত। মন্দিরে শিলালিপির পাশে নরনারায়ণ ও চিল্লারায়ের প্রস্তর-মূর্তি খোদিত রয়েছে। তাঁদের কামাখ্যামন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে দরঙ্গ রাজবংশাবলীতে লেখা রয়েছে—

'তিন লক্ষ হোম দিলা[১] এক লক্ষ বলি।
সাতকুড়ি পাইক[২] দিলা করি তাম্রফলি॥'

"১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে নরনারায়ণ নির্মিত মন্দিরটি ভেঙে যায়। তৎকালীন দ্বারভাঙার মহারাজা বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেন। কোচবিহারের মহারাজা অবশ্য তাঁকে সামান্য কিছু সাহায্য করে-ছিলেন।"

থামতে হয় সুশীলবাবুকে, কারণ শান্তিবাবু ফিরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে একজন প্রবীণ সুপুরুষ। ভদ্রলোক নমস্কার করেন আমাদের। বলেন, "আমার নাম গণেশচন্দ্র শর্মা পাণ্ডা অধিকারী। আপনাদের সঙ্গে পরি-চিত হয়ে ভারী খুশি হলাম। চলুন, দর্শন করিয়ে আনি।"

কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরচত্বরে নেমে আসি।

১ নিযুক্ত করা, ২ সেবাইত।

পাণ্ডাজী জিজ্ঞেস করেন, "পুজো দেবেন ?"
আমি মাথা নাড়ি।
পাণ্ডাজী বলেন, "তাহলে টাকাটা দিন, আমি ডালা নিয়ে আসি।"
ডালা নিয়ে ফিরে আসেন পাণ্ডাজী। আমরা আবার তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চলি। একটি কুণ্ডের সামনে এসে পৌঁছই। পাণ্ডাজী বলেন, "এটি হল কামখ্যাদেবীর ক্রীড়াপুষ্করিণী সৌভাগ্যকুণ্ড। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই কুণ্ড প্রথম খনন করেছিলেন। আপনারা ঘাটে নেমে পুণ্যবারি স্পর্শ করুন।"
আমি ও দক্ষিণাদা তাঁর নির্দেশ পালন করি।
পাণ্ডাজী বলেন, "কুণ্ডের মাঝে ঐ যে ইঁটের প্রাচীরটি দেখছেন, ওটিও ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পরে দ্বারভাঙার মহারাজা তৈরি করে দিয়েছেন।"
"দেওয়াল দেবার কারণ ?" দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।
পাণ্ডাজী উত্তর দেন, "ওপাশের জল কেবল মহামায়ার স্নান, ভোগ ও পূজার কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।" একটু থেমে পাণ্ডাজী সামনের গণেশ বিগ্রহটি দেখিয়ে বলেন, "গণপতিকে প্রণাম করুন, তারপরে চলুন মন্দিরে।"
আমরা পাণ্ডাজীর পেছনে মন্দিরদ্বারের দিকে এগিয়ে চলি। সুশীলবাবু বলেন, "ওনারা কিন্তু লাইনে দাঁড়াবেন না।"
পাণ্ডাজী সহাস্যে বলেন, "জানি।"
সুশীলবাবু বোধহয় একটু লজ্জা পান।
জিজ্ঞেস করি, "এখানে বুঝি লাইন দিয়ে দর্শন করতে হয় ?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ। কারণ কামাখ্যা মন্দিরে বারো মাস যাত্রী আসেন। 'কিউ' ছাড়া 'ম্যানেজ' করা সম্ভব নয়।"
ভাবি কেদারনাথ থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রায় সব মন্দিরই তো লাইনে দাঁড়িয়ে দর্শন করেছি। এখানেও লাইনে দাঁড়াতে আপত্তি করা উচিত হবে না।
কিন্তু আমার সম্মতিতে কি এসে যায় ? আমি যে আজও ভি. আই.

পি.। আমার লাইনে দাঁড়াবার অধিকার নেই।
শেষপর্যন্ত সেই শুভ-মুহূর্ত সমাগত হল। আমি কামাখ্যা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। আমার সারা শরীর পুলকিত, মন-প্রাণ এক পরম প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বার বার বলতে ইচ্ছে করছে—মা, তুমি আমায় আজ কাছে টেনে নিয়েছো। আমি ধন্য, আমার জীবন ধন্য। আসামে আসা সার্থক হল আমার। মা, তুমি আমায় আশীর্বাদ. কবো, আমি যেন তোমার কথা আর এই অমরাবতী-আসামের কথা বলে যেতে পারি সবাব কাছে। বলতে পারি—তুমি তো আসামের হয়েও সারা ভারতের। তাহলে আমরা তোমার সন্তান হয়ে কেন ভারত-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারব না?
সুশীলবাবু ঠিকই বলেছিলেন, ভেতরে সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, আমরা ভি আই পি.। আমাদের সারির সামিল হতে হল না। সুদীর্ঘ সারিব পাশ দিয়ে পাণ্ডাজীব সঙ্গে এগিয়ে এলাম।
সামনে একসারি পাথরের মূর্তি দেখিয়ে পাণ্ডাজী বলেন, "ঐ দ্বাদশ মূর্তির মাঝখানে দেবীর চলন্তা-মূর্তি দর্শন করুন এ মূর্তিব অপব নাম হরগৌরী কিংবা ভোগমূর্তি।"
কাছে এগিয়ে দর্শন করি। পাথরের সিংহাসনের ওপবে অষ্টধাতুর অপূর্ব সুন্দর মূর্তি।
পাণ্ডাজী বলেন, "বাঁয়ে দশভুজ কামেশ্বর মহাদেব আর ডাইনে দ্বাদশ-বাহুবিশিষ্টা মহামায়া কামেশ্বরী। তিনি অষ্টাদশলোচনা সিংহ-শব-পদ্মাসনা। বিষ্ণু সিংহের, মহেশ্বর শবের ও ব্রহ্মা পদ্মের রূপ নিয়ে জগজ্জননী কামেশ্বরীকে ধারণ কবে আছেন। উৎসবের সময় শোভাযাত্রা সহকারে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে এটি দেবীর চলন্তা মূর্তি।"
দর্শন শেষে এগিয়ে চলি। পাণ্ডাজীর পেছনে গর্ভমন্দিরের দ্বারে আসি। দর্শনার্থীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি চলেছে। কিন্তু আমাদের ধাক্কা খেতে হয় না। দ্বাররক্ষীদের সাহায্যে অক্লেশে ভেতরে প্রবেশ করি।

পাণ্ডাজী বললেন, "আলো কম, সামনে সিঁড়ি। সাবধানে নামবেন।"
বাংলার বাইরের অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও গর্ভ-মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো প্রবেশাধিকার পায় নি। প্রদীপের আলোয় আলোকিত মন্দির। সুতরাং পায়ের দিকে নজর রেখে সিঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে।
দশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি কামাখ্যার গুহা-মন্দিরে। পাণ্ডাজীর সঙ্গে শিলাপীঠের সামনে এসে দাঁড়াই।
পাণ্ডাজী বলেন. "এখানে দাঁড়িয়ে আপনি কায়মনোবাক্যে মহামায়ার কাছে যা কামনা করবেন, তা-ই পূর্ণ হবে।"
মনে মনে বলি—মা, আমার কামনার কথা তো আগেই জানিয়েছি তোমাকে। নতুন করে তোমার কাছে আর কিছু চাইবার নেই। তুমি আমার ভারত-ভাবনায় দীক্ষিত করে তোলো।
আমি দর্শন করি। শিলাপীঠ দর্শন করি, স্পর্শ করি। সেই সঙ্গে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবি -কত সহজে আমি আসতে পেরেছি এখানে। আর সেকালে কত কষ্ট করে ভক্তদের আসতে হত এই শক্তিপীঠে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে বিপদশঙ্কুল জলপথ কিংবা শ্বাপদশঙ্কুল বনপথ পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁরা আসতেন এখানে। অনেকেই এসে পৌঁছতে পারতেন না। তবু কোনোকালে কামাখ্যায় দর্শনার্থীর অভাব হয় নি, হবেও না। কামাখ্যা যে মাতৃপীঠ। সন্তান কি মায়ের কাছে না এসে পারে?
বর্গক্ষেত্রাকার শিলাপীঠের কেন্দ্রস্থল থেকে সর্বদা জল বেরিয়ে আসছে। পাণ্ডাজী বলেন, "এই হচ্ছে দেবীর যোনিমণ্ডল। মাতৃঅঙ্গ বলে অর্ধাংশ সোনার টোপর, কাপড় ও ফুলের মালা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। ভক্তদের জন্য বাকী অর্ধেক খুলে রাখা হয়েছে। এই যোনিমণ্ডল দৈর্ঘ্যে আঠারো ও প্রস্থে ছয় ইঞ্চির মতো। দেবী মহামায়া এখানে পঞ্চ-কামিনী অর্থাৎ কামাখ্যা, কামেশ্বরী, ত্রিপুরা, সারদা ও মহোৎসাহা মূর্তিতে চিরবিরাজমানা।
আবার দর্শন করি, স্পর্শ করি, প্রণাম করি।

পাণ্ডাজী বলেন, "এটি শুধু শক্তিপীঠ নয়, মহাপীঠ। চরম নাস্তিকও এখানে এলে পরম আস্তিকে রূপান্তরিত হয়। কামাখ্যা কেবল শাক্ত-দের মুক্তিতীর্থ নয়, প্রত্যেক ভক্তের মোক্ষক্ষেত্র। শিখ বৈষ্ণব বৌদ্ধ জৈন —যে কোনো ধর্মের যে কোনো মানুষ এখানে এসে দশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করলে লক্ষ জপের ফল পাবেন আর লক্ষ জপ করলে সিদ্ধিলাভ করবেন।"

অষ্ট ভৈরবকে দর্শন করে আমরা বেরিয়ে আসি গর্ভ-মন্দির থেকে। মাতঙ্গী বা সরস্বতী ও কমলা বা লক্ষ্মীমূর্তি দর্শন করি।

চলন্তা মন্দিরের চারিদিকে মন্দিরগাত্রে বহু মূর্তি রয়েছে। একে একে দর্শন করি। তারপরে নরনারায়ণ, রাজেশ্বর সিংহ ও গৌরীনাথ সিংহের শিলালিপি দেখে চামুণ্ডা মন্দিরে আসি।

দেবীমন্দিরের গায়ে, বাইরের দিকে, বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গিমায় চব্বিশ জন নর ও ছ'ত্রিশ জন নারীর মূর্তি রয়েছে। মন্দির প্রদক্ষিণের সময় মূর্তি-গুলি দেখতে পাই আমরা। পাণ্ডাজী জানান, "এরা হলেন—ছয় রাগ, আঠারো উপরাগ ও ছ'ত্রিশ রাগিণী।"

তীর্থে এলেও ভক্ত কিংবা সাধক নই আমি। মন্দির চত্বরে বসে দু-দণ্ড সাধন-ভজন করার সময়ও হাতে নেই আমার। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে আসি পথে। ফিরে চলি মোটর স্ট্যাণ্ডের দিকে। পাণ্ডাজীও আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে আমার। তাই তো, কুমারীরা কোথায় গেলেন? তাঁদের সঙ্গে তো দেখা হল না। গত শতাব্দীর শেষ দশকে প্রকাশিত বিশ্বকোষের তৃতীয় খণ্ডে পড়েছি—'কামাখ্যার কুমারীপূজা ভগবতী-পূজার একটি অঙ্গ বিশেষ। কামাখ্যায় অনেক ব্রাহ্মণকুমারীর পূজাগ্রহণ একটি ব্যবসায় স্বরূপ। পূজা হউক বা নাই হউক, কামাখ্যা দর্শনের জন্য যাত্রী গমন করিলেই কুমারীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিবে এবং দক্ষিণা চাহিবে। ন্যূনাধিক ৩০০ কুমারী সর্বদা কামাখ্যায় থাকে। অনেক সময় কুমারীরা যাত্রীদিগকে দক্ষিণার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তোলেন।'

কথাটা বলতেই পাণ্ডাজী অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। লজ্জা পাই।

হাসি থামলে পাণ্ডাজী বলেন, "ওসব সেকালের কথা. একালে আপনি তাদের দেখতে পাবেন না। সেসব নিয়ম বহু বছর আগে উঠে গিয়েছে। তবে এখানে কুমারীপূজার প্রচলন রয়েছে। কারণ মহামায়া এই মহা-তীর্থে কুমারী রূপে বিরাজিতা। কামাখ্যায় কুমারীপূজা করলে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করার ফল পাওয়া যায়। পুত্রলাভ, ধনলাভ, পৃথ্বীলাভ ও বিদ্যালাভ হয়।

ফিরে আসি মোটর স্ট্যাণ্ডে। পাণ্ডাজী অনুরোধ করেন, "একবার দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়িতে পায়ের ধূলো দিলে বড়ই বাধিত হতাম।"

দক্ষিণাদা সবিনয়ে বলেন, "আজ মাফ করতে হবে পাণ্ডাজী, একদম সময় নেই। পরে যখন আসব, নিশ্চয়ই যাবো আপনার বাড়িতে।"

পাণ্ডাজী জানেন, এ প্রতিশ্রুতি অর্থহীন। তবু তিনি দক্ষিণাদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন না। করজোড়ে বিদায় জানান আমাদের। আমরা গাড়িতে উঠি। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়। আমরা পাহাড়ী পথ বেয়ে নিচে নামতে শুরু করি।

হঠাৎ নিচের দিকে নজর পড়ে আমার। আসাম অপরূপা, সে অমরা-বতী। কিন্তু তার এমন মনোহারিণী মূর্তি তো আগে দেখি নি।

দেখব কেমন করে? মাটির জগৎ ছেড়ে ওপরে না উঠে এলে কি মাটির এমন রূপ দর্শন করা যায়? আমি বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

প্রথমেই নজর পড়ছে ব্রহ্মপুত্রের দিকে। নীলাচলের পা ধুয়ে কামাখ্যার করুণাবারি নিয়ে সে বয়ে চলেছে আপন মনে। এখানে ব্রহ্মপুত্রের দু-পারেই পাহাড়। এপারে নীলাচল, ওপারে মেঘালয়। এপারে সোনালী ক্ষেত, ওপারে সবুজ বন। আর বহুদূরে নীলাকাশের বুকে ভূটানের শ্বেত-শুভ্র শিখরমালা।

শ্রদ্ধেয় হেম বরুয়ার সেই বর্ণনা মনে পড়ছে—'It dominates the

landscape no less than the Eiffel Tower does Paris.'

গাড়ি নেমে চলেছে নিচে, কামাখ্যা দর্শন করে আমরা গৌহাটি চলেছি। কামাখ্যা থেকে গৌহাটি মাত্র ২ মাইল।

কিন্তু না, আমরা গৌহাটির কথা ভাবছি না, এখনও কামাখ্যার কথাই আলোচনা করছি। শান্তিবাবু বলছেন, "কামাখ্যায় প্রতিদিন শতশত যাত্রী আসেন, এখানে উৎসব লেগেই আছে। বছরের যেকোনো পুণ্য-তিথিতে পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়ে। তাহলেও বলব কামাখ্যার বড় উৎসব হল দুর্গাপূজা, পৌষ বিয়া, বাসন্তী ও অম্বুবাচী।"

"পৌষ বিয়া কি?" দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।

শান্তিবাবু উত্তর দেন, "কামাখ্যা দেবীর সঙ্গে কামেশ্বর শিবের বিবাহোৎসব।"

"শুনেছি এখানে নাকি খুব বড় মেলা হয়?"

"হ্যাঁ, অম্বুবাচীর মেলা। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীতে কামাখ্যায় সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। ভক্তদের বিশ্বাস এই সময় মাতা-বসুন্ধরা অশুদ্ধ হন। তাই তিনদিন মন্দির বন্ধ থাকে। চতুর্থ দিন মন্দির উন্মুক্ত হয়, হাজার হাজার যাত্রী সেদিন দর্শন করেন।...

শান্তিবাবু বলে চলেছেন কামাখ্যার উৎসবের কথা, আমি ভাবি অন্য কথা। মা-কামাখ্যার বর্তমান মন্দির হিন্দু মন্দির সন্দেহ নেই, কিন্তু কামাখ্যা প্রাক-আর্য যুগের দেবী। শ্রীহেম বরুয়া বলেছেন'—distinctly tribal in its traits and ideal...it is a relic of the pre-Aryan sex-worship that was a part of the ancient social organisation of the tribal people.'

পরবর্তীকালে আর্যরা কামাখ্যা মন্দিরকে মাতৃমন্দির রূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে এই মন্দিরকে অবলম্বন করে আর্য ও অনার্যের এক মহামিলন সূচিত হয়েছে। কামাখ্যা তাই মিলনের মহাদেবী, সে ভারত মাতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর আশীর্বাদে আমরা নিশ্চয়ই ভারত-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হব।

২১

"নামুন। আমরা এসে গিয়েছি।"

শান্তিবাবুর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি একখানি ঝক্‌ঝকে বাংলো টাইপের বাড়ির সামনে গাড়ি থেমেছে।

না, এতো কোনো হোটেল নয়! নিশ্চয় কারও বাড়ি। তাড়াতাড়ি বলি, "আমি তো হোটেল···"

"হ্যাঁ। এটাই গৌহাটিতে বাঙালী লেখকদের হোটেল।

শান্তিবাবুর কথায় দক্ষিণাদা হেসে ওঠেন। তিনি বসেছিলেন সামনে নেমে পড়েছেন গাড়ি থেকে।

দক্ষিণাদা বলেন, "আমি তো তখুনি বলেছিলাম, ওরা শুনবে না তোমার কথা। বিজয়বাবুর বাড়ি ছেড়ে তুমি হোটেলে উঠতে পারবে না।"

তার মানে এটাই এ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীবিজয়কুমার দাসের বাড়ি। বিজয়-বাবু সাহিত্য সম্মেলনের আসাম শাখার সভাপতি।

নেমে আসি গাড়ি থেকে। চারিদিকেই সুন্দর-সুন্দর বাড়ি-ঘর। অভি-জাত পল্লী।

ড্রাইভার জনক ইতিমধ্যে মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে। একজন ভদ্রমহিলা ও দুটি কিশোরী বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে।

আমি সবিনয়ে আবার বলি, "কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম একটা হোটেলে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে আজই শিলং চলে যাবো।"

"এখানেও স্নান-খাওয়া করা যাবে।" ভদ্রমহিলা বাগান পেরিয়ে গেটের সামনে পৌঁছে গিয়েছেন। লোহার গেট খুলতে খুলতে বললেন কথাটা। মেয়ে দুটি মৃদু হাসছে। একজনের বয়স হবে বছর চোদ্দ, আরেকজনের বারো।

আমি চট করে কোনো উত্তর দিতে পারি না। তিনি দু-হাত জড়ো করে নমস্কার করেন আমাকে। মেয়ে দুটি প্রণাম করে।
দক্ষিণাদা পরিচয় করিয়ে দেন, "বিজয়বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী এনানয়নী দাস, শিলচরের বিখ্যাত এ্যাড্ভোকেট্, সমাজসেবী, সাহিত্যিক ও সম্পাদক ৺নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের কন্যা। আসামের প্রাচীনতম মেয়েদের কলেজ, সন্দিকৈ গার্লস কলেজে বাংলার অধ্যাপিকা। এই দুটি মেয়ের মা। বড় সুমিতা এবারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। একাধিক লেটার নিয়ে নিশ্চয়ই পাশ করবে। ছোট উর্মিলাও লেখা-পড়ায় ভালো। সে স্কুলে পড়ে।"
আবার আমাদের মাঝে নমস্কার বিনিময় হয়। ভদ্রমহিলা এবারে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন, "আমরা এখানে থাকতে, আপনি হোটেলে উঠবেন ?"
"না। মানে···"
"এখানে আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না।"
"আমি ঠিক সেজন্য বলছি না।"
"তাহলে হোটেলে উঠতে চাইছেন কেন ?"
"আর চাইব না বৌদি !"
সুমি ও উর্মি সহ সবাই আমার কথায় হেসে ওঠে।
হাসি থামলে বৌদি সহাস্যে বলেন, "এবার তাহলে ভেতরে চলুন।"
গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি। বাড়ির সামনে এক টুকরো বাগান। পাথর কুচি বিছানো পথ পেরিয়ে আমরা বারান্দায় উঠে আসি। একেবারে নতুন বাড়ি। দক্ষিণাদার কাছে শুনেছি, ওঁরা নাকি মাত্র গতমাস থেকে বসবাস শুরু করেছেন।
কার্পেট মোড়া ড্রয়িং রুমে ঢুকি। একখানি সোফায় বসে বৌদিকে বলি, "আমি কিন্তু আজ বিকেলেই শিলং চলে যাবো।"
"আজ শিলং যাবেন !" বৌদি একবার শান্তিবাবুর দিকে তাকান। শান্তিবাবু মৃদু হেসে বলেন, "আমি এখনও বলি নি।"

আমি বিভ্রান্ত। বৌদি বলেন. "আজ যে সন্ধ্যা সাতটায় বেঙ্গলী স্কুলে আপনাদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।"

এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা। সবিস্ময়ে বলি, "সংবর্ধনা!" শান্তিবাবুর দিকে তাকাই।

তিনি অকম্পিত কণ্ঠে বলেন. "কাল সকালেই যাতে আপনি শিলং চলে যেতে পারেন, তাই আমরা আজই আয়োজন করেছি।"

"কিন্তু জোড়হাটে বসে তো এসব কথা বলেন নি?"

শান্তিবাবু কিছু বলতে যাবার আগেই বৌদি বলে ওঠেন, "এসব কথা কেউ কাউকে আগের থেকে বলে না।" তিনি উঠে দাঁড়ান। বলেন,"আমি চা নিয়ে আসছি। চা খেয়ে আপনাদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। বিছানা করাই আছে।"

বৌদি ভেতরে চলে যান। মেয়েরাও তাঁর সঙ্গী হয়।

চা-পান পর্ব শেষ হবার পরে বৌদি বলেন, "আপনারা ঘরে চলুন, একটু বিশ্রাম করে স্নান সেরে নিন। উনি আজ না-খেয়ে কোর্টে গিয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে খাবেন বলে লাঞ্চের সময় বাড়ি আসবেন।"

বিজয়দার চেম্বারের ভেতর দিয়ে আমাদের ঘরে আসি। চেম্বারের দেও-য়ালে বুক শেল্ফ। বইয়ে ঠাসা। গৃহস্বামীর পসারের প্রমাণ দিচ্ছে। আমাদের ঘরখানিও ভারী সুন্দর। পাশেই বাথরুম। মাথার ওপরে পাখা। দু-পাশে দু-খানা খাট। মাঝখানে ড্রেসিং টেবিল। বৌদি ঠিক বলেছেন—আমি আসবার আগেই আমার বিছানা করা হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় হোটেলে উঠলে সত্যই অন্যায় হোত।

বেলা দেড়টা নাগাদ বিজয়দা খেতে এলেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্যই বড় হবেন কিন্তু জীবন সংগ্রামে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর পিতা ৺ভবানীকান্ত দাস ধুবড়ীতে খ্যাতনামা সরকারী উকিল ছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে তাঁর পরিবার আসামে সুপরিচিত। বিজয়দা শৈশবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় তিনি কিশোর। কিন্তু তখুনি

তাঁর কারাবরণ শুরু হয়। তারপর থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত। তিনি বার বার জেলে গিয়েছেন। পড়াশুনায় প্রচুর ব্যাঘাত ঘটেছে। তা সত্ত্বেও তিনি পড়াশুনাকরেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জীবনসংগ্রামে সফল হয়েছেন। এখন তিনি গৌহাটি হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা এ্যাড্-ভোকেট্।

শান্তিবাবু বলেছেন—ব্যস্ত মানুষ হয়েও বিজয়দা বিভিন্ন জনকল্যাণ-মূলক এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তিনি পরহিত-ব্রতী, সুবক্তা ও সুসংগঠক। সুশ্রী, মিষ্টভাষী ও মধুর স্বভাব। ভদ্রলোককে ভালো লাগে আমার।

বৌদি ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজাচ্ছেন। সুমি ও ঊর্মি তাঁকে সাহায্য করছে। আমরা তৈরি হয়ে বসে কথাবার্তা বলছি।

হঠাৎ বিজয়দা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন। দক্ষিণাদাকে বলেন, "আরে তাই তো চিঠিটা যে দেওয়া হয় নি আপনাকে!"

"কিসের চিঠি?" দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন।

কিন্তু বিজয়দা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ফিরে এলেন একটু বাদে। একখানি চিঠি দিলেন দক্ষিণাদার হাতে। তিনি একবার চোখ বুলিয়ে কাগজখানি আমাকে দিলেন।

আসাম রাজ্য Integration Council-য়ের সম্পাদক শ্রীঈশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী দক্ষিণাদাকে লিখেছেন—'...We have noted with pleasure and gratitude your reference to the theme "We are all Indians," which the State Integration Council has been spreading'.

শ্রীচৌধুরী জোড়হাটের সাহিত্য সম্মেলনকে প্রশংসা করে অবশেষে লিখেছেন—'...It is such appreciation of our humble work that encourages us to go ahed with bold strides to achieve our mission of establishing unity, amity and solidarity among the various linguistic, ethnic, and

religious community living in Assam ; it is our sincere desire that we will be receiving your suggestions and good wishes……'

খেতে বসে প্রমাণ পেলাম এনা বৌদি শুধু বাংলা পড়াতে পারেন না, বাংলার রান্নায়ও সিদ্ধহস্তা। খাবার পরে ঘরে আসি। দক্ষিণাদা কাগজ হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। এতদিন কাগজ চালিয়েছেন। কাগজ হাতে পেলে কি আর ছাড়তে চান ?

আমাকে জামা-কাপড় পরতে দেখে দক্ষিণাদা জিজ্ঞেস করেন, "বের হচ্ছ নাকি ?"

"হ্যাঁ" উত্তর দিই, "বিজয়দার সঙ্গে হাইকোর্ট পর্যন্ত যাচ্ছি। তারপরে প্রগতির হস্টেলে যাবো একবার।"

"ফিরবে কখন ?"

"একেবারে রাতে।"

"ওরা যে সভার আয়োজন করেছে !" দক্ষিণাদা একটু চিন্তিত।

সহাস্যে বলি, "দাদা, সভাপতির সঙ্গে যখন এসেছি, তখন সভায় না গিয়ে উপায় কি ? আপনি নিশ্চিত থাকুন, যেখানেই থাকি, সন্ধ্যে সাত-টার আগে ঠিক হাজির হব বেঙ্গলী স্কুলে।"

প্রগতির জন্য আনা 'উত্তরস্যাং-দিশি' বইখানি হাতে নিয়ে দক্ষিণাদার কাছ থেকে বিদায় নিই। গাড়িতে উঠে বিজয়দার পাশে বসি। জনক গাড়ি ছাড়ে। আমি প্রগতির কাছে চলেছি।

আজ ছ'দিন হল আসামে এসেছি। ছ'দিন তো নয়, ছয় যুগ। কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল আসামের মাটিতে। কিন্তু যে অস-মীয়া মেয়েটি অপরিচিত বাঙালী লেখককে প্রথম আসামে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিল—সবার অনাদরে আসামের বুকে আত্ম-গোপন করে থাকা সৌন্দর্য আপনি চোখ মেলে দেখে যান ; তার সঙ্গে আমার এখনও দেখা হয় নি। আজ হবে কি ?

আচ্ছা সে দেখতে কেমন ? সে খাটো না লম্বা, কালো না ফর্সা ? সে-

দিন প্রাঞ্জল ও পাপড়িকে দেখে প্রগতির চেহারা অনুমান করার চেষ্টা করেছিলাম। আমার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের প্রগতি মিলবে কি ? তার বয়স কত ? সে বাংলা বলতে পারে কি ?

কিছুই জানা নেই আমার। তবু সেই অপরিচিতা পাঠিকার প্রতি একি আশ্চর্য আকর্ষণ আমার ! অসংখ্য নতুন মানুষের ভিড়েও সে যায় নি হারিয়ে। আসামে আসার পর থেকে প্রত্যেকদিন কোনো না কোনো সময়ে আমি তার কথা ভেবেছি। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার মন তেমনি উতলা হয়ে আছে। আজ দেখা হবে।

"এটা হচ্ছে ভরলু নদী।" বিজয়দার কথায় প্রগতির ভাবনা টুটে যায়। তাকিয়ে দেখি একটা পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। বিজয়দা বলতে থাকেন, "ভরলু নদীর উত্তরতীর থেকে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীর পর্যন্ত অংশটুকুই প্রাচীন গৌহাটি শহর। এখন অবশ্য ভরলুর দক্ষিণতীর এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরেও শহর বিস্তৃত হয়েছে। শহরের উত্তরদিক জুড়ে ব্রহ্মপুত্র আর তিনদিকেই ছোট-ছোট পাহাড়। তাদের মধ্যে পুবের খারঘুলি ও নবগ্রহ পাহাড় (চিত্রাচল) আর পশ্চিমের কামাখ্যা, ফাটাসিল ও কালা পাহাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

"আচ্ছা, মেডিক্যাল কলেজ কোন্ দিকে ?" বিজয়দা থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি।

তিনি বলেন, "আমাদের এদিকে অর্থাৎ শহরের দক্ষিণপুবে। শিলং যাবার পথে দেখতে পাবেন।

"আর দিসপুর, যেখানে নতুন রাজধানী করা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, অস্থায়ী রাজধানী। স্থায়ী রাজধানী হবে দিসপুর থেকে আরও ৬ মাইল অর্থাৎ গৌহাটি থেকে ১০ মাইল দূরে চন্দ্রপুরে। শিলং যাবার পথে আপনি দিসপুর দেখতে পাবেন।"

একবার থামেন বিজয়দা। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই আবার বলেন, "স্টেট জু গার্ডেনস্ আর অয়েল রিফাইন্যারীও শহরের পুবদিকে। এখানকার চিড়িয়াখানা অবশ্য দ্রষ্টব্য। কারণ এটি ন্যাচার‍্যাল্ জু—বন্য

পরিবেশে বন্যপ্রাণীদের দেখতে ভালো লাগবে আপনার।"
"কি কি প্রাণী আছে?"
"গণ্ডার, সিংহ, বাঘ ও চিতাবাঘ প্রভৃতি জন্তু আর অসংখ্য পাখি। সারাদিন খোলা থাকে।"
"শুনেছি এখানে নাকি একটা মিউজিয়াম আছে?"
"একটি নয়, তিনটি মিউজিয়াম আছে গৌহাটিতে—স্টেট মিউজিয়াম, ফরেস্ট মিউজিয়াম ও কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ মিউজিয়াম। ইতিহাসের ছাত্রদের স্টেট মিউজিয়াম ভালো লাগবে।
"এছাড়া দেখতে পারেন, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী ও স্টেডিয়াম।"
হাইকোর্টের সামনে গাড়ি থামে। আমি নেমে পড়ি।
বিজয়দা বলেন, "সভার সময়টা মনে আছে তো?"
আমি মাথা নাড়ি।
বিজয়দা আবার বলেন, "যেখানেই যান, সন্ধ্যে সাতটার আগে বেঙ্গলী স্কুলে আসবেন।"
গাড়ি চলে যায়, আমি পথ চলা শুরু করি। প্রাগজ্যোতিষপুরের পথে পদচারণা করছি আমি—মহাভারতের প্রাগজ্যোতিষপুর।
বাঁদিকে এক সুবিশাল সবুজ ময়দান—জজ ফিল্ড। এটি গৌহাটির গড়ের মাঠ। প্রধানমন্ত্রী আসছেন। সভার আয়োজন চলেছে, বাঁশের বেড়া দেওয়া হচ্ছে।
রিক্সা, ট্যাক্সি, স্কুটার ও বাস যাতায়াত করছে। কিন্তু আমি হেঁটেই এগোতে থাকি। গত কয়েকদিন গাড়ি ছাড়া বড় একটা কোথাও যাই নি। স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে। কলকাতায় ফিরে বিপদে পড়ব। আজ খানিকটা হাঁটাহাঁটি করা যাক্।
না, গার্লস হোস্টেল নয়, জনৈক পথচারীকে কটন কলেজের কথা জিজ্ঞেস করি। ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে দেন।
বুঝতে পারছি প্রগতির হস্টেল এখান থেকে মোটেই দূরে নয়। কিন্তু সবে যে দুটো বেজেছে। গার্লস হস্টেল, চারটের আগে ভিজিটার্সদের

ভেতরে ঢুকতে দেবে কি ?

তবু এগিয়ে চলি। আমি গৌহাটির পথে পদচারণা করছি—আসামের বৃহত্তম মহানগরী গৌহাটি। ২৬°১১´ উত্তর এবং ৯১°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই সমৃদ্ধ ও সুপ্রাচীন শহর। সমুদ্র সমতা থেকে মাত্র ১৮৫ ফুটের মতো উঁচু।

পথের পাশে বিভিন্ন দোকানের অসমীয়া সাইনবোর্ডে গৌহাটিকে লেখা হয়েছে গুৱাহাটী বা গুয়াহাটি। ওঁরা তাই বলেন। 'গুয়া' মানে সুপারী আর 'হাটী' মানে হাট কিংবা সারি। তার মানে গৌহাটি নামটি এসেছে সুপারীর বাজার কিংবা সুপারীর সারি থেকে।

গৌহাটির কথা ভাবতে ভাবতে গৌহাটির পথে পথ চলেছি। সুদূর অতীত থেকেই গৌহাটি আসামের প্রধান প্রবেশ-দ্বার।

ষোড়শ শতকে গৌহাটি কোচ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সপ্তদশ শতকে এই জনপদ আহোম এবং মোগলদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চাশ বছরে আটবার হাতবদল হয়েছে। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে আহোমরা মোগলদের কামরূপ থেকে তাড়িয়ে দেন। তারপরে গৌহাটি লোয়ার-আসামে আহোম রাজাদের সদর দপ্তর হয়। বরফুকণ এখানেই থাক-তেন।

১৭৮৬ সালে মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহীরা রাজধানী রংপুর দখল করে নেবার পরে আহোমরাজ গৌরীনাথ সিংহ রাজ্যরক্ষার ভার বুড়া গোঁহাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরিবার পরিজনদের নিয়ে গৌহাটি পালিয়ে আসেন। সেই থেকে ১৭৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত গৌহাটি আহোম সাম্রাজ্যের অস্থায়ী রাজধানী ছিল। জুলাই মাসে (১৭৯৪) গৌরীনাথ জোড়হাটে চলে যান।

বৃটিশ আমলে গৌহাটি আবার রাজধানীর মর্যাদা পায়। ১৮৬৫ সালে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সালে শহরের আয়তন ছিল মাত্র ২·৫৫ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ১৪,২৪৪ জন। সত্তর বছর পরে (১৯৫৪ সালে) সেই জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১, ২৩, ৭৮৩ জন। কিন্তু

সেকালেও গৌহাটি সুন্দর ছিল, হয়তোবা একালের চেয়ে বেশি সুন্দর। তাই ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'The situation of Gauhati is extremely picturesque. To the south it is surrounded by a semi circle of thickly wooded hills, while in front rolls the mighty Brahmaputra, which during the rains is more than a mile across. In the centre of the stream lies a rocky island, the further bank is fringed with graceful palms, and the view is again shut in by ranges of low hills.'

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে গৌহাটি এসেছিলেন। কামাখ্যা দর্শনের পরে অসুস্থতার জন্য তিনি কয়েকদিন বিশ্রাম করেছিলেন এখানে। অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজী এখানে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি শিলং যান এবং সেখানে গিয়ে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আসামের তৎকালীন চীফ কমিশনার ভারতহিতৈষী স্যার হেনরী কটন স্বামীজীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি দুবেলা স্বামীজীকে দেখতে যেতেন। সুস্থ হয়ে স্বামীজী ফিরে গিয়েছিলেন বেলুড়।

স্যার হেনরী কটনের নামেই এখানকার কটন কলেজ। আপাতত আমার গন্তব্যস্থল।

চৌমাথাব মোড়ে এসে থামতে হয়, থামাতে হয় গৌহাটির ভাবনা। চারটি পথ চারদিকে গিয়েছে। আমি কোন্‌দিকে যাবো?

জনৈক পথচারীকে জিজ্ঞেস করি কটন কলেজের কথা। তিনি বাঁদিকের রাস্তাটা দেখিয়ে বলেন, "সামান্য খানিকটা গেলেই কটন কলেজ দেখতে পাবেন।"

ঘড়ির দিকে তাকাই। সবে তিনটে বাজে। এত আগে প্রগতির হস্টেলে গিয়ে কি লাভ? বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া ডানদিকে ব্রহ্মপুত্রকে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং ডানদিকের রাস্তাটাই আকর্ষণ করছে

আমাকে।

পথচারী জানান, "সামনেই কাছাড়ী ঘাট।"

"তাহলে তো উমানন্দ এখানেই ?"

"হ্যাঁ। ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেই ব্রহ্মপুত্রের বুকে সেই পাথুরে দ্বীপ দেখতে পাবেন।"

অতএব এগিয়ে চলি। ঘাটে এসে দাঁড়াই। ব্রহ্মপুত্রকে দু-চোখ ভরে দেখি। আসামের প্রাণধারা ব্রহ্মপুত্র। আর দেখি ব্রহ্মপুত্রের বুকের মাঝে অপরূপ দ্বীপ উমানন্দকে। দেখতে অবিকল ময়ূরের মতো। তাই ইংরেজরা নাম দিয়েছিলেন—Peacock Island.

কামাখ্যার ভৈরব—সদাজাগ্রত প্রহরী উমানন্দ। তাই আগে উমানন্দ দর্শন করে, পরে পাণ্ডুর পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে যেতে হয় কামাখ্যা দর্শনে। আমি অনিয়ম করেছি। তবে আমি তো আর পুণ্যার্থী নই, আমি শুধুই দর্শনার্থী।

একটা পাথুরে টিলা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। অনেকে বলেন ভস্মকূট অথবা ভস্মাচল কিংবা ভস্মশৈল। তাঁদের মতে, মহাদেব ওখানেই কামদেবকে ভস্ম করেছিলেন।

শুনেছি ঐ পাহাড়ে উর্বশীকুণ্ড নামে একটি জলাশয় আছে। কামাখ্যাদেবীর জন্য উর্বশী স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে এসেছিলেন সেখানে। তাই যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে, মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ঐ কুণ্ডে অবগাহন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

টিলার ওপরে মন্দিরটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। শিব মন্দির। উমাকে আনন্দ দেবার জন্য উমানাথ উমানন্দ রূপে চিরবিদ্যমান ওখানে। দেবতার নামেই তীর্থের নাম হয়েছে।

আহোমরাজ গদাধর সিংহের নির্দেশে গঞা সন্দিকৈ বরফুকণ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছেন এই মন্দির। অনাদি শিবলিঙ্গ মন্দিরের প্রধান আরাধ্য। আর রয়েছে রুপোর তৈরি বৃষভবাহন দশভুজ-বিশিষ্ট উমানন্দের চলন্তা প্রতিমূর্তি। শিবরাত্রির সময় বেশ বড় উৎসব হয় এখানে।

মাঝিরা জিজ্ঞেস করে—বাবু, উমানন্দে যাবেন নাকি ?

পালটা প্রশ্ন করি—কতক্ষণ লাগবে ?

—বেশিক্ষণ নয়, যাতায়াতে ঘণ্টা খানেক।

মনে হচ্ছে, ওরা কমিয়ে বলছে। সব দেখেশুনে ছু-আড়াই ঘণ্টার আগে আসা যাবে না ফিরে। তখন আর প্রগতির সঙ্গে দেখা করার সময় থাকবে না হাতে।

না, না। সেদিন জোড়হাটে নেঘেরীটিঙ দর্শনে গিয়ে যে ভুল করেছি, আজ আর তা করব না। সেদিন বুঝতে পারি নি যে সীতাকুটিরের মূল্য শিব মন্দিরের চেয়ে বেশি। কিন্তু আজ বেশ বুঝতে পারছি, এখন আমার কাছে কটন কলেজ গার্লস হস্টেলের স্থান উমানন্দের চেয়ে অনেক ওপরে।

আমি তাই এখান থেকেই প্রণাম করি উমানন্দকে। মনে মনে তাঁকে বলি—ঠাকুর তুমি ক্ষমা করো আমাকে। পরে সুবিধামতো দর্শন করব তোমাকে। যাবো পাণ্ডুর পঞ্চ-পাণ্ডবের কাছে।

তাড়াতাড়ি উঠে আসি ঘাট থেকে। এগিয়ে চলি চৌমাথার দিকে।

আবার শুরু করেছি পথচলা। চলেছি প্রগতির হস্টেলে। কিছুক্ষণ পদ-চারণার পরে কটন কলেজের সামনে এসে দাঁড়াই। কলকাতার প্রেসি-ডেন্সী কলেজের মতো গৌহাটির এই কটন কলেজ। প্রগতি এই কলেজে পড়ে। তার মানে সে পড়াশুনায় ভালো। তা তো হবেই। নইলে অস-মীয়া মেয়ে বাংলা বই পড়ে লেখককে অমন সুন্দর চিঠি লিখবে কেন ? মনটা আমার খুশিতে ভরে ওঠে।

কলেজ বন্ধ। বিহুর ছুটি চলছে। মেয়েদের হস্টেল, মনে হচ্ছে কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতরেই হবে।

ভেতরে ঢুকে দ্বারোয়ানকে জিজ্ঞেস করি। সে সহাস্যে বলে, "আজ্ঞে না, এখানে নয়। মেয়েদের হস্টেল দীঘালী ট্যাঙ্কের কাছে। একটু দূর আছে।" সে আমাকে পথ দেখিয়ে দেয়।

বলি, "এখন গেলে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে।"

"কটা বাজে ?" দ্বারোয়ান পালটা প্রশ্ন করে।
ঘড়ি দেখে জবাব দিই, "পৌনে চারটে।"
"হ্যাঁ। চলে যান। তিনটে থেকে পাঁচটা দেখা করার সময়।"
"তিনটে থেকে ?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মনটা খারাপ হয়ে যায়। অযথা সময় নষ্ট করেছি। কাছারীঘাটে এখন না গেলেই হত। হাইকোর্ট থেকে সোজা হেঁটে এলে অনায়াসে তিনটের আগে পৌঁছতে পারতাম প্রগতির হস্টেলে। একঘণ্টা আগে দেখা হত তার সঙ্গে।

একটা রিক্সা নিই। তাড়াতাড়ি চালাতে বলি। এবারে সত্যি আমি প্রগতির সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। বসে বসে তার কথাই ভাবি।

সেদিন দমদমের আকাশে বসেই এ ভাবনা হয়েছে শুরু। তবে তখন প্রগতির ভাবনার সঙ্গে আসামের ভাবনাও হয়েছিল যুক্ত। সেদিন আসাম সম্পর্কে যে কৌতূহল আমার ছিল, আজ তার নিরসন হয়েছে। অমরাবতী-আসামের অপরূপ রূপ আর অতিথিপরায়ণ আসামবাসীদের অসীম ভালোবাসার স্বাদ আমি আস্বাদন করেছি আমার অন্তর দিয়ে। কেবল প্রগতির সঙ্গে দেখা হয় নি এখনও। তাকে দেখবার সেই অন্তহীন আকুলতা আজও আমাকে তেমনি উদ্বেল করে তুলছে। অথচ সে তো আমার কেউ নয়! তার সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্বন্ধ নেই। সে যে ভাষায় কথা বলে, আমি আজও সে ভাষা ঠিকমতো বুঝতে পারি না। বয়সে সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তাহলে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্কে রক্ত, ভাষা ও বয়সের কোনো প্রভাব নেই ?

২২

অবশেষে সব ভাবনার অবসান হয়। প্রগতির হস্টেলের সামনে রিক্সা থামে। ভাড়া মিটিয়ে এসে দাঁড়াই গেটের সামনে।

দরজা খোলাই রয়েছে। তবু মেয়েদের হস্টেল। দ্বারোয়ানকে জিজ্ঞেস করি প্রগতির কথা। সে উত্তর দেয়, "চিনি বৈকি। দু-নম্বর হস্টেলে থাকেন। চলে যান ভেতরে, উনি আছেন।"

আছে, প্রগতি আছে! আমি ভেতরে ঢুকি।

গেট থেকে পথ প্রসারিত হয়েছে সামনে। পথের ডানপাশে চারিদিকে কাচের জানলাযুক্ত ভিজিটার্স রুম। তারপরে বাঁদিকে ও সামনে দুটি বেশ বড় বাড়ি। ওরই একটিতে থাকে প্রগতি— আমার অপরিচিতা পাঠিকা। এখুনি তার সঙ্গে পরিচয় হবে আমার।

ভিজিটার্স রুমে কেউ নেই। চারিদিকে তাকাই। কোথাও কোনো পুরুষ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু মেয়েরা রয়েছে এখানে ওখানে। তাই তো হবে। এটা যে মেয়েদের হস্টেল। তাহলেও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হবে, একটু আগেও বুঝতে পারি নি।

সবচেয়ে বড় সমস্যা আমি তাকে চিনি না। সে দেখতে কেমন—কালো না ফর্সা, খাটো কি লম্বা, কিছুই জানি না।

তাহলেও আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি। হঠাৎ দেখতে পাই তাঁকে।

না, না প্রগতিকে নয়। আমি তাকে চিনব কেমন করে? আমি কি তাকে দেখেছি কখনও?

দেখতে পাই জনৈক ভদ্রলোককে। সামনের বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে চলতে থাকি।

পাশের বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি মেয়ে। তারা কি যেন বলাবলি করছে। ওরা নিশ্চয়ই নিজেদের বিষয়ে কিছু বলছে। আমি এগিয়ে চলি।

কাছে আসতেই ভদ্রলোক আমাকে অসমীয়াতে জিজ্ঞেস করেন. "কাকে চাইছেন?"

"প্রগতি শর্মা, হোস্টেল নাম্বার 'টু'!"

ভদ্রলোক পথের পাশের সেই বাড়িটি দেখিয়ে বলেন, "ঐ বাড়ির বারান্দায় উঠে কোনো মেয়েকে বলুন, ডেকে দেবে।"

আমি আবার ফিরে আসি সেই বাড়িটার সামনে। দোতলার মেয়েরা এখনও তেমনি এদিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি করছে? তাদের দল আরও ভারী হয়েছে। ওদের কাছেই জিজ্ঞেস করতে হবে প্রগতির কথা। আমি এগিয়ে চলি।

আচ্ছা, প্রগতি আমাকে দেখলে কেমন করবে? ছোট মেয়ে, বই পড়ে চিঠি লিখে ফেলেছিল। তখন ভাবতেই পারে নি, সত্যি সত্যি সেই লেখক এসে হাজির হবে তার সামনে। আজ হয়তো বেচারী লজ্জায় আমার সামনেই আসতে চাইবে না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সামনে তাকাই। আরে! মেয়েটা অমন ছুটে আসছে কেন? সরে দাঁড়াতে পারার আগেই সে একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হয়। সহসা নত হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

সে উঠে দাঁড়ায়।

আমি তার দিকে তাকাই।

সে বলে ওঠে, "শঙ্কুদা?"

"প্রগতি?"

প্রগতি ছোট মেয়ের মতো আমার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়। আনন্দে ও উত্তেজনায় সে বোধহয় কোনো কথা বলতে পারছে না।

আমারও একই অবস্থা। কোনো রকমে সামলে নিই নিজেকে। তারপরে জিজ্ঞেস করি, "তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে?"

"বাবা চিঠি লিখেছেন।" একবার থামে সে। তারপরে হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলে, "তাছাড়া আমি আমার দাদাকে চিনতে পারব না ?"
মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। উচ্চতা ও গড়ন সাধারণ বাঙালী মেয়েদেরই মতো। গায়ের রং কালো না হলেও খুব ফর্সা নয়। পরণে শাড়ি। কথাও বলছে পরিষ্কার বাংলায়।
কে বলবে প্রগতি বাঙালী নয় ? কে বলবে সে আমার সহোদরা নয় ? তার যদি আমার বয়সী কোনো দাদা থাকত, আর সে যদি আজ এই হোস্টেলে আসত, তা হলে কি ওর এর চেয়ে বেশি আনন্দ হত ?
প্রগতি আমাকে নিয়ে আসে ভিজিটার্স রুমে। আমি 'উত্তরস্যাং-দিশি' বইখানি তার হাতে দিই। খুলে নিজের নাম লেখা দেখে একেবারে উচ্ছল হয়ে ওঠে সে। বলে, "আমার জন্য বই নিয়ে এসেছেন, কি মজা !" একটু থেমে আবার বলে, "আমিও আপনার জন্য একটা জিনিস রেখে দিয়েছি। আপনি একটু বসুন শঙ্কুদা ! আমি শাড়িটা পালটে আসছি।"
"কেন কোথাও বেরুবে নাকি ?"
"বারে ! আপনি আসামে এসেছেন, আর আপনাকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুবো না ? বাবার চিঠি পাবার পরেই তো ঠিক করে রেখেছি, আপনাকে প্রথম নিয়ে যাবো শুক্রেশ্বর-জনার্দনের মন্দিরে, ব্রহ্মপুত্রের তীরে।
"কিন্তু তোমার যে কদিন পরে পরীক্ষা ?"
হঠাৎ সে যেন গম্ভীর হয়ে যায়। নীরবে একটুকাল তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। তারপরে তিরস্কারের স্বরে বলে, "আপনিও দেখছি ঠিক বাবার মতো। এত পড়াশুনা করেও মাঝে মাঝে বড্ড ভুল বলে ফেলেন। আজ দু-ঘণ্টা না পড়লেই কি আমি পরীক্ষায় ফেল করে যাবো ?"
"না, না, আমি ঠিক সেকথা বলি নি। তবে তোমার পরীক্ষা এসে গিয়েছে, তাই আর কি…"
"আসুকগে পরীক্ষা। আপনি এসেছেন, আজ আমি পড়তেই বসব না।"

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আমি একা বসে থাকি। বসে বসে তার কথা ভাবতে থাকি।

এই সেই প্রগতি। তাকে ঘিরে আমার কত কৌতূহল। সব কৌতূহলের অবসান হল। তবে এখন মনে হচ্ছে, আজ প্রথম দেখা হলেও সে আমার বহুকালের চেনা। সে যে আমারই সহোদরা।

কয়েক মিনিট বাদেই ফিরে আসে প্রগতি। এবারে সে আর একা নয়। তার সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে। বলাবাহুল্য তারা অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এসেছে।

হস্টেলবাসিনীদের অটোগ্রাফ দেওয়া হতেই প্রগতি প্রায় তাদের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসে পথে। হাঁফ ছেড়ে বলে, "বাপরে বাপ! মেয়েগুলো কি নাছোড়বান্দা। কত করে বল-লাম—আজ শঙ্কুদা টায়ার্ড। পরের দিন যখন আসবেন, তখন অটো-গ্রাফ নিস। "কিন্তু কেউ শুনল না সেকথা।"

আমি কোনো মন্তব্য করি না, শুধু একটু হাসি। আর মনে মনে আমার এই অষ্টাদশী অসমীয়া পাঠিকার কথা ভাবি। এইটুকু সময়ের মধ্যে সে কেবল আমাকে আপন করে নেয় নি, সেই সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, আমার ওপরে এখানে তার ছাড়া আর কারও কোনো অধি-কার নেই।

সে আবার বলে, "সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট-য়ের কাছে আপনার কথা বলে দু-ঘণ্টা ছুটি নিলাম, আর মেয়েগুলো তার পনেরো মিনিট নষ্ট করে দিলে! কার না রাগ হয় বলুন?"

কিন্তু সেকথা না বলে অন্য কথা বলি, "তোমাকে তাহলে সাতটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে?"

"হ্যাঁ।" প্রগতি মাথা নাড়ে।

"আমারও সাতটায় একটা সভা আছে।"

"কোথায়?"

"বেঙ্গলী স্কুলে।"

"ঠিক আছে, আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে হস্টেলে ফিরে আসব।"

"সন্ধ্যার পরে তুমি একা একা ফিরবে ?"

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে প্রগতি। আকস্মিক হাসির কারণ বুঝতে পারি না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

একটু বাদে হাসি থামিয়ে বলে, "তখুনি বলেছি, আপনি ঠিক বাবার মতো কথা বলেন। আমি কলেজে পড়ি, গৌহাটিতে থাকি, আর সন্ধ্যো সাতটার সময় হস্টেলে ফিরতে পারব না ?"

আবার আমার থতমত খাবার পালা। কোনোমতে উত্তর দিই, "পারবে না কেন, তাহলেও সন্ধ্যার পরে তুমি একা একা ফিরবে…"

"শঙ্কুদা, আপনার যে এমন কথা সাজে না। মেয়েদের যারা ঘরকুনো রাখতে চায়, আপনি তো তাদের দলে নয়। আপনার 'গিরিকান্তার'-য়ে পড়েছি অনিমাদির কথা, লীলাভূমি-লাহুলে সুজয়াদি ও কমলাদির কথা। পড়েছি জয়েস ডানশীথ ও জোসেফাইন স্কার-য়ের কথা। জোসেফাইন তার সঙ্গিনী বারবারা স্পার্ককে নিয়ে লণ্ডন থেকে মোটরে চড়ে মানালী এসেছিলেন পর্বতারোহণের জন্য।"

সাবাস ! মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারি না। প্রগতি এত মনোযোগ দিয়ে আমার বই পড়েছে। কিন্তু মুখে বলি, "তাহলেও আমি তোমাকে হস্টেলে রেখে তারপরে সভায় যাবো।"

"ভালই হবে।" দুষ্টুমি ভরা স্বরে প্রগতি বলে, "আপনার সঙ্গে আরেকটু বেশি গল্প করা যাবে।"

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলার পরে প্রগতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, "আপনি ক'দিন গৌহাটি থাকবেন ?"

"কাল সকালে চেরাপুঞ্জির পথে শিলং রওনা হচ্ছি। ২৩শে সন্ধ্যায় ফিরে আসব এখানে। ২৪শে সকালে উমানন্দ, পাণ্ডু, হাজো ও বশিষ্ঠা-দর্শন করব।"

"বিকেলে আমার হস্টেলে আসবেন ?"

"আসব।"

"কলকাতায় কবে ফিরবেন ?"

"২৫শে সকালে।"

"আপনি আবার কবে আসামে আসবেন শঙ্কুদা ?"

"ফেব্রুয়ারীর আগে আর হয়ে উঠবে না।"

"ফেব্রুয়ারী। তার মানে তো সামনের বছর।"

"হ্যাঁ।"

"না।" সে মাথা নাড়ে। বলে, "আগামী মাসের শেষদিকে জোড়হাট চলে আসুন। আমি তো পরীক্ষার পরেই বাড়ি চলে যাচ্ছি।" একবার থামে সে। তারপরে প্রশ্ন করে, "দমদম থেকে রোরিয়া আসতে কতক্ষণই বা লাগে ?"

"ত্ব-ঘন্টা।" সহাস্যে উত্তর দিই।

"তাহলে ?" প্রগতি আমার দিকে তাকায়।

সহাস্যে বলি, "ভাড়া ২৬০'০০ টাকা।"

"তাতে কি হয়েছে ?" সে যেন বিস্মিত। তীক্ষ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "এতগুলো বই লিখেছেন, আর পাঁচশ' টাকা জোগাড় করতে পারবেন না ?" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "বেশ, টাকাটা এখন আমাকে ধার দিন। পরে আমি চাকরি করে, আপনাকে শোধ দিয়ে দেব।"

কি বলব ? আমি নীরবে হাসতে থাকি।

সে আবার বলে, "সামনের মাসের শেষদিকে জোড়হাটে চলে আসুন শঙ্কুদা! আপনাকে নিয়ে আমার পিসীদের বাড়িতে যাবো। আমার পিসীরা থাকেন মরিয়ানী, নকছারী ও নাহারকাটীয়ায়। তাছাড়া আপনার বোধহয় কাজিরাঙা যাওয়া হয় নি।"

"না।"

"তাহলে তো খুব ভালো। ফরেস্ট অফিসে বাবার চেনা মানুষ আছে। আপনাকে নিয়ে আমি কাজিরাঙায় চলে যাবো।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পান বাজারে পৌঁছলাম। পান বাজার মানে

গৌহাটির লিগুসে স্ট্রীট। বেশ প্রশস্ত পথ। পথের দু-পাশে সাজানো-গোছানো দোকান। আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি-ঘর। সর্বদা যান-বাহন চলাচল করছে। পথচারীরা কর্মব্যস্ত।

আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না। ক'দিন বাদেই তো ফিরে যেতে হবে আরেক বৃহত্তম পান বাজারে—দিনগত পাপক্ষয়ের অভিশপ্ত জীবনে। আসামের মাটিতে আমি আর সে জীবনের কথা ভাবতে চাই না। তাই প্রগতিকে বলি, "একটু তাড়াতাড়ি চলো, ভিড় বেশ ভালো লাগছে না।"

"আমরা প্রায় এসে পড়েছি শঙ্কুদা। সামনের ঐ বাঁক ফিরলেই শুক্রেশ্বর মন্দির দেখা যাবে। কিন্তু তার আগে চলুন, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্।"

না, মেয়েটা দেখছি অন্তর্যামী। নইলে সে কেমন করে বুঝতে পারল, আমার চায়ের পিপাসা পেয়েছে। সানন্দে ওর সঙ্গে একটা রেস্তরাঁয় এসে ঢুকি।

প্রগতি কিন্তু আমাকে চা-বিস্কুটের দাম দিতে দিল না। তার সেই এক কথা, "আপনি আসামে এসেছেন, আপনি আমার অতিথি।"

প্রতিবাদ করে বলি, "কিন্তু আমি তো তোমাদের বাড়িতে চা ও বিহুর পিঠে খেয়েছি, ফুলাম গামোছা পেয়েছি।"

"ঠিক কথা।" প্রগতি হঠাৎ থেমে যায়। কোলের ওপরে রাখা হাত-ব্যাগ থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে। মোড়ক খোলার পরে দেখি, পাট দিয়ে বোনা ভারী সুন্দর একটা 'বুক হ্যাঙ্গার' আর এক-খানি ফুলাম গামোছা।

হ্যাঙ্গারটা হাতে দিয়ে সে সযত্নে গামোছাখানি আমার কাঁধে রাখে। বলে, "আপনার বোনের উপহার শঙ্কুদা!"

"কিন্তু এর তো কোনো দরকার ছিল না বোন! পাপড়ি আমাকে ফুলাম গামোছা দিয়েছে।"

"ভালোই তো হলো।" প্রগতি বলে, "দুই বোনের দুটি উপহার আপ-

নার কাছে থাকল।"
"থাক্ প্রগতি, তাই থাক্। আমি তোমাদের উপহার চিরকাল সযত্নে রেখে দেব আমার কাছে। এই উপহার প্রতিনিয়ত আমাকে তোমাদের কথা, অমরাবতী-আসামের কথা মনে করিয়ে দেবে।"
দোকানীর দাম মিটিয়ে প্রগতি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো পথে। আবার শুরু হল পথচলা। একটু বাদে সে বলে, "তখন বলছিলেন, আপনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলে আমার পরীক্ষার ক্ষতি হবে। আর বাবা আমাকে কি লিখেছে দেখবেন?"
প্রগতি ব্যাগ থেকে একখানি ইনল্যাণ্ড লেটার বের করে। চিঠিখানি খুলে আমার হাতে দেয়। আমি পড়ি। শ্রীশর্মা লিখেছেন—
'…আজিয়েই (আজ) এটা (একটা) খুব ভাল সম্বাদ দিব…লেখক ও পরিব্রাজক শ্রীশঙ্কু মহারাজ আচম্বিতে…আমাৰ ঘৰত (ঘরে) উপস্থিত।…এ ঘণ্টাতকৈও (একঘণ্টারও) অধিক সময় বহি (বসে) বিহুখাই বিহুৱান (বিহুর উপহার) লৈ গ'ল (নিয়ে গিয়েছেন)।… মহাৰাজ গুৱাহাটীত তোমাক লগ কৰিব হোষ্টেলত (তোমার সঙ্গে হোস্টেলে দেখা করবেন)।…বৰ ভাল লাগিল আজি। তেখেতে (তিনি) তোমাৰ বঙালিত (বাংলায়) লিখা চিঠিৰ প্রশংসা কৰিছে আৰু আনকো (অন্যদেরও) দেখুৱাইছে (দেখিয়েছেন)। মানুহজনৰ (মানুষটির) আগ্রহ আৰু প্রীতি বৰ প্রশংশনীয়।…শঙ্কু মহাৰাজৰ আগমন তোমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এক বিৰাট আশীর্বাদ। তেখেতৰ (তাঁর) ভৰিত ধৰি (পায়ে ধরে) প্রাণাম করিবা।'
আমরা শুক্রেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছি। জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকি। প্রকাণ্ড লিঙ্গ মূর্তি। দর্শন করি, প্রণাম করি। মঙ্গলময় দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে প্রগতির মঙ্গল কামনা করি। প্রার্থনা করি—ঠাকুর ওর পরীক্ষা যেন ভালো হয়। প্রগতি যেন বড় হয়, সে যেন সুখী হয়। তার জীবনকে তুমি নির্বিঘ্ন ও শান্তিময় করো।
শুক্রাচার্য এই লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেছিলেন বলে শিব শুক্রেশ্বর রূপে

অবস্থান করছেন এখানে। আহোমরাজ প্রমত্ত সিংহ (১৭৪৪-৫১ খ্রীঃ) এই মন্দির তৈরি করেন। মন্দিরের গায়ে রাজ রাজেশ্বর সিংহের (১৭৫১-১৭৬৯ খ্রীঃ) শিলালিপি আছে। প্রগতি আমাকে সব দেখায়।

তারপরে নেমে আসি মন্দির থেকে। মন্দিরটি ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটা টিলার ওপরে, অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হল আমাদের।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে আসি। ভারী সুন্দর ঘাট রয়েছে এখানে। আমরা ঘাটে বসি।

অস্তগামী সূর্যের সোনালী পরশ লেগেছে অস্থির ব্রহ্মপুত্রের প্রতি অঙ্গে। সে সত্যিই লোহিত। শ্রদ্ধেয় হেম বরুয়ার ভাষায়—'The Red River.'

এপারে আমরা আর ওপারে সারি সারি পাহাড়। তাদের গায়ে নীল আকাশের ছোঁয়া—'The Blue Hill. এই লাল নদী আর ঐ নীল পাহাড় নিয়েইতো আসাম—অমরাবতী-আসাম। ব্রহ্মপুত্র যদি হয় তার প্রাণধারা, ঐ পাহাড় তাহলে তার প্রাণভোমরা।

কিন্তু না, আমি পাহাড়ের কথা ভাবছি না, ভাবছি না আসামের কথাও। আমি শুধু দু-চোখ ভরে ব্রহ্মপুত্রকে দেখছি।

"ব্রহ্মপুত্র তো মানস-সরোবর থেকে এসেছে, তাই না শঙ্কুদা ?"

আবার চমকে উঠি ! প্রগতিও কি তাহলে ব্রহ্মপুত্রের কথাই ভাবছে ? কিন্তু ওর প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় নি। সে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। তাড়াতাড়ি বলি, "হ্যাঁ, মানস-সরোবরের কাছ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে ব্রহ্মপুত্র।"

"আপনি নিশ্চয়ই মানস-সরোবর গিয়েছেন ?"

"না।"

"যান নি ?"

সহাস্যে বলি, "না। সত্যি বলতে কি হিমালয়ের সামান্যই দেখা হয়েছে আমার। আর এক জীবনে ভালোভাবে হিমালয় দেখাও সম্ভব নয়। তাছাড়া চীন তীব্বত দখল করার কিছু পরে অর্থাৎ ১৯৬১ সাল থেকে

ভারতবাসীর কাছে শিবালয় কৈলাসের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

"চীনের সঙ্গে তো শুনছি শিগ্‌গিরই আমাদের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তখন নিশ্চয়ই কৈলাস ও মানস-সরোবরে যাওয়া যাবে ?"

"আশা করছি।"

"আপনি যাবেন ?"

"ইচ্ছে আছে।"

"আমি আপনার সঙ্গে যাবো শঙ্কুদা !"

আমি ওর দিকে তাকাই।

সে-ও তাকায় আমার দিকে। আবার বলে ওঠে, "আপনি দেখে নেবেন, আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি ঠিক আপনার সঙ্গে সমান তালে হেঁটে যাবো। আপনি আমাকে সঙ্গে নেবেন তো শঙ্কুদা ?"

কি উত্তর দেবো ? তাই বলি, "সে তখন দেখা যাবে। এখন বরং ব্রহ্মপুত্রের কথা আলোচনা করা যাক্।"

"তাই ভালো।" গল্পের গন্ধ পেয়ে প্রগতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে।

আমি শুরু করি, "ভারতের অধিকাংশ জলধারাই নদী, কেবল কয়েকটিকে নদ বলা হয়।..."

"কি, কি ?" প্রগতি প্রশ্ন করে। উত্তর দিই, "সিন্ধু, শোন, শতদ্রু, হিরণ্য, কোকা, ঘর্ঘরা, দামোদর ও শ্রীলৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র। এরাই ভারতের প্রধান মহানদ।

"মানস-সরোবরের প্রায় ৫০ মাইল পূর্বে অবস্থিত চারটি হিমবাহ থেকে সৃষ্ট চারটি নদী এবং মারিয়ুম চু নদীর মিলিত ধারাই আসামের ব্রহ্মপুত্র। তিব্বতে এই নদের প্রথম দিকের নাম তামচোক খাম্বার, তারপরে সাংপো (Tsangpo)। সাংপো শব্দের মানে যে ধারা সবাইকে শুদ্ধ করে অর্থাৎ পবিত্রধারা।

"উৎসের পর থেকে সাংপো তিব্বতে একটানা প্রায় ৮০০ মাইল দক্ষিণ-

পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে। সে সর্বদা মূল-হিমালয়ের অন্তত ১০০ মাইল উত্তরে রয়েছে। সাংপো তিব্বতে ৪০০ মাইলের মতো নাব্য। তিব্বতের সেই অংশের গড় উচ্চতা ১২,০০০ ফুট। পৃথিবীতে আর কোথাও এত উঁচুতে এত দীর্ঘ নাব্যনদী নেই।

"হিমালয়ের ওপারে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সোজাসুজি এসে সাংপো সহসা দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে। পূর্ব-প্রবাহ দক্ষিণ-প্রবাহ হয়ে পৌঁছেচে ভারত সীমান্তে। নামচা বারোয়া ও গ্যায়লা পেরী (২৩, ৪৫৮´) পাহাড় দুটির মাঝখান দিয়ে ভারতে এসেছে। এখানে দু'টি পাহাড়ের দূরত্ব মাত্র ৮ মাইল। তারপরে নদী সৃষ্টি করেছে কয়েকটি অনিন্দ্যসুন্দর জলপ্রপাত। মিলিত হয়েছে ডিহিং ও লুহিত নামে দুটি পাহাড়ী নদীর সঙ্গে। মিলিত ধারার নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। অবশেষে সদিয়ার পশ্চিমে এসে সে অবতরণ করেছে আসামের সমতলে। সেই সঙ্গে শেষ হয়েছে তার পার্বত্য গতি। শুরু হয়েছ মধ্য গতি।

"তিব্বতে যে নদী পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিতা, আসামে সেই নদ পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। আবার বাংলাদেশে গিয়ে সে দক্ষিণমুখী জলধারা।

"কিন্তু বাংলাদেশের কথা থাক্। সে দেশটা যে বাংলা হলেও আমার দেশ নয়। তার চেয়ে বরং আমাদের আসামের কথাই ভাবা যাক্। আসামে ব্রহ্মপুত্র প্রায় ৫০০ মাইল দীর্ঘ। এর মধ্যে সে ৪৫০ মাইলের ওপর নাব্য। শুধু আসামই বা বলি কেন, ডিব্রুগড় থেকে বঙ্গোপসাগর, এই ৮০০ মাইল জলপথই তো নাব্য। আর এই পথেই যুগাতীত কাল থেকে বাংলার সঙ্গে আসামের যোগাযোগ। এই পথে য়ুয়ান চোয়াঙ আসামে এসেছেন আবার মীরজুমলাও আসাম আক্রমণ করেছে।

"আসামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে। মিশর যদি হয় নীল নদের দান, আসাম তাহলে ব্রহ্মপুত্র নদের অবদান। ব্রহ্মপুত্রই আসামকে এমন সুজলা ও সুফলা করেছে। করেছে অপরূপা আর তাই আসাম আমার কাছে অমরাবতী। বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন

ইন্দ্রালয় আর ব্রহ্মপুত্র সৃষ্টি করেছে আসাম। ব্রহ্মপুত্রই অমরাবতী-আসামের অলকানন্দা।

"আসামের সমস্ত নদী মিলিত হয়েছে এই নদের সঙ্গে। দক্ষিণ থেকে এসেছে দিবং, লুহিত, দিখৌ, ডিহিং, ঝাংজি, ধনশ্রী, দিশং ও কুলসী আর উত্তর থেকে মিশেছে সুবনসিরি, ভরলু, মানস, সঙ্কোস ও ধরলা প্রভৃতি। ফলে সে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর, কোথাও বা ছ'মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত।

"গারো পাহাড়ের পশ্চিমে পৌঁছে ব্রহ্মপুত্র সাগরের ডাক শুনতে পেয়েছে। তার প্রবাহপথের দিক পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমী ধারা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে।

"বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের নাম যমুনা। ১৫০ মাইল প্রবাহিত হবার পরে গোয়ালন্দে যমুনা পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।..."

"তার মানে আসামের ব্রহ্মপুত্র বাংলার গঙ্গার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে?" মাঝখান থেকে প্রগতি বলে ওঠে।

আমি মাথা নাড়ি।

প্রগতি প্রশ্ন করে, "তারপরে?"

"তারপরে মিলিত ধারা মিলিত হয়েছে মেঘনার সঙ্গে এবং অবশেষে মেঘনা মিশেছে সাগরে। শেষ হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের পথ-পরিক্রমা।

"দৈর্ঘ্য এবং দাক্ষিণ্যের দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নদীসমূহের অন্যতম।"

"আচ্ছা, ব্রহ্মপুত্র কি গঙ্গার চেয়ে বড় নদী?" আবার প্রশ্ন করে প্রগতি।

আমি উত্তর দিই, "সাংপোকে ধরলে বড় বৈকি! কারণ গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর ১৫৪০ মাইল এবং মেঘনা-সঙ্গম ১৬৮০ মাইল। আর তিব্বত ভারত এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইলের মতো। তবে গঙ্গা যে স্থান অধিকার করে আছে তার আয়তন বেশি—৩,৯১,০০০ বর্গমাইল আর ব্রহ্মপুত্র ৩,৬১,০০০ বর্গ মাইল।

"আচ্ছা, কে এই নদীর উৎস আবিষ্কার করেছেন?"
"প্রখ্যাত পর্যটক ও সুলেখক সোয়েন হেডিন। তুমি তাঁর 'ট্রান্স হিমা-লয়া' বইখানি পড়লে সেই আবিষ্কারের কাহিনী জানতে পারবে। অবশ্য সোয়েন হেডিন-য়ের আবিষ্কারে সামান্য কিছু ত্রুটি ছিল, তা সংশোধন করেছেন স্বামী প্রণবানন্দ।'
"স্বামী প্রণবানন্দ?"
"হ্যাঁ, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও যিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হিমালয় সমীক্ষক, যাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তুমি তাঁর 'কৈলাস-মান-সরোবর' বইখানি পড়লে ঐ অঞ্চলের সমস্ত কথা জানতে পারবে।"একবার থামি। কিন্তু প্রগতি কোনো কথা বলছে না দেখে আবার বলি, "সোয়েন হেডিন প্রায় সত্তর বছর আগে ব্রহ্ম-পুত্রের উৎস আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তীব্বতের সাংপো নদীই যে আসামের ব্রহ্মপুত্র একথা প্রমাণিত হয়েছে আরও বিশ বছর বাদে, ১৯২৫ সালে।"
"কে প্রমাণ করেছেন?" প্রগতি প্রশ্ন করে।
উত্তর দিই, "আর. এফ. কিংডম্ ওয়ার্ড নামে জনৈক হিমালয়-সমীক্ষক ও তাঁর সহযোগী কাউডার।"
"যাক্ গে, আপনি ব্রহ্মপুত্রের কথা বলুন।" প্রগতি বলে।
আবার আরম্ভ করি, "কেবল দৈর্ঘ্য কিংবা তার অবদানের জন্য নয়, পবিত্রতার দিক থেকেও ব্রহ্মপুত্র ভারতের একটি পুণ্যতম প্রবাহ। যোগি-নীতন্ত্রে বলা হয়েছে, এই পবিত্রধারায় একটিমাত্র ডুব দিলে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। তাই ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম তীর্থরাজ। ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে ঘাটে নারায়ণ চিরবিরাজমান।
"মহাভারতে বলা হয়েছে, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তীর্থরাজ ব্রহ্ম-পুত্রের স্রষ্টা। আমার বিশ্বাস এই উক্তিটি ঐতিহাসিক সত্য।"
"কেন বলুন তো?"
"তিব্বতের পূর্ব-প্রবাহিণী সাংপো যেভাবে হঠাৎ দক্ষিণমুখী হয়েছে এবং

সে যে জায়গা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে, তা দেখে মনে হয় এর মধ্যে মানুষের হাত রয়েছে। অর্থাৎ কেউ প্রথমে খাল কেটে সাংপোর গতি-পথ পালটে দিয়েছিলেন—যেমন করেছিলেন ভগীরথ, গঙ্গা আনয়নের জন্য।"

"পরশুরামই তাহলে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্রকে ভারতে নিয়ে এসেছেন ?"

আমি মাথা নাড়ি। বলি, "তাই প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস মহাভারতে বলা হয়েছে পরশুরাম ব্রহ্মপুত্রের স্রষ্টা।"

প্রগতি চুপ করে রয়েছে। আমি আবার বলি, "যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত কালিকাপুরাণে ব্রহ্মপুত্রের পুণ্য-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।..."

"আমি বলব শঙ্কুদা ?" হঠাৎ প্রগতি প্রশ্ন করে।

কাহিনীটি তাহলে জানা আছে ওর। থাকবেই তো। আসামের মেয়ে প্রগতি, আসামের প্রাণধারার পুণ্যকাহিনী কি ওর কাছে অজানা থাকতে পারে ?

সে কাহিনী আমারও অজানা নয়। তবু উত্তর দিই, "বেশ বল, ব্রহ্ম-পুত্রের তীরে বসে ব্রহ্মার পুত্রের জন্মকাহিনী আলোচনা করা যাক্।"

একটু ভেবে প্রগতি বলতে শুরু করে। আমিও ভেবে চলি—

রাজা সগর একদিন ঔর্বঋষির কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের জন্মকথা জানতে চেয়েছিলেন। তখন মহর্ষি ঔর্ব তাকে বলেছিলেন—হরিবর্ষে, শান্তনু নামে এক তপঃপরায়ণ মুনি ছিলেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা অমো-ঘাকে বিয়ে করেন। অমোঘা ছিলেন অসামান্যা রূপবতী। তিনি স্বামীর সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশে মর্যাদা আশ্রমে বাস করতেন।

একদিন শান্তনু যখন ফল ও ফুল আনতে বনে গিয়েছেন, তখন হঠাৎ হংসযানে করে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন আশ্রমের সামনে। স্বয়ম্ভূকে দেখতে পেয়ে অমোঘা বেরিয়ে এলেন কুটির থেকে। তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন, তাঁকে বসতে বললেন।

অমোঘার রূপ ও যৌবন দেখে প্রজাপতি মুগ্ধ হলেন। তাঁর সঙ্গলাভের

বাসনা হল ব্রহ্মার। তিনি অমোঘাকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন পারলেন না। সতীসাধ্বী নারী প্রজাপতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি পালিয়ে গেলেন ঘরে, দোর বন্ধ করে দিলেন। বললেন—আমি তপঃপরায়ণ মুনির পত্নী। আমি সতীসাধ্বী। আপনি যদি আমার সতীত্ব-নাশের চেষ্টা করেন, তাহলে আমি আপনাকে অভিশাপ দেব। আপনি এই মূহূর্তে আমার আশ্রম থেকে চলে যান।

কামোন্মত্ত ব্রহ্মার তখন সেখানেই বীর্যপাত হয়ে গেল। তিনি হংসযানে চড়ে আশ্রম ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন শান্তনু। তিনি হংসকুলের পদচিহ্ন ও ব্রহ্ম-বীর্য দেখতে পেলেন। মুনি তখন অমোঘাকে জিজ্ঞেস করলেন—কে এসেছিলেন আশ্রমে।

অমোঘা ক্রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন—একজন কমণ্ডলুধারী চতুর্মুখ। হংস-বিমানে চড়ে এসেছিল। সে আমার সম্ভোগ প্রার্থনা করেছিল। আমার অভিশাপের ভয়ে স্খলিতবীর্য হয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

চিন্তিত শান্তনু তখন ধ্যানে বসলেন। তিনি জানতে পারলেন, জগতের মঙ্গলে তীর্থ উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মা বীর্যপাত করে গিয়েছেন।

মুনি অমোঘাকে বললেন—ব্রহ্মা তোমাকে বীর্যদান করতে এসেছিলেন। তুমি সম্মত না হওয়ায় তিনি আমাদের জন্য বীর্য রেখে গিয়েছেন। জগ-তের হিতের জন্য তুমি প্রজাপতিব পরিত্যক্ত ব্রহ্মবীর্য পান কর।

অমোঘা স্বামীকে প্রণাম করে বললেন—আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পরপুরুষের বীর্য ধারণ করতে পারব না। তার চেয়ে বরং আপনি ঐ বীর্য পান করে আমাতে সেচন করুন।

তাই করলেন শান্তনু। আর তারই ফলে অমোঘা হলেন গর্ভবতী। যথা সময়ে অমোঘার গর্ভ থেকে জলরাশি ক্ষরিত হল।...

আমার ভাবনা থেমে যায়। প্রগতির কথা কানে আসে। সে একই কাহিনী বলে চলেছে। আমি শুনি প্রগতি বলছে, "সেই জলরাশির

মধ্যে রত্নমালা-বিভূষিত নীলাম্বর পরিহিত কিরীটধারী এক পুত্র আবির্ভূত হলেন। তাঁর গায়ের রং ব্রহ্মার মতো গৌরবর্ণ। তিনি চতুর্ভূজ—পদ্ম, বিদ্যা, ধ্বজ ও শক্তিধারী।

"মানুষের মঙ্গলের জন্য শান্তনু ব্রহ্মার পুত্রকে কৈলাস, গন্ধমাদন, জারুধি ও সম্বক পর্বতের মাঝখানে রেখে দিলেন। জায়গাটার নাম হল ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মপুত্র বড় হতে লাগল, ব্রহ্মকুণ্ডের জল বাড়তে থাকল।

"এদিকে পিতা জমদগ্নির আদেশে মাতা রেণুকাকে বধ করার পরে পরশুরাম পড়লেন মহাবিপদে। মাতৃহত্যার পাপে তাঁর হাতের কুঠার হাতেই লেগে রইল। বহু তীর্থে স্নান করেও তিনি হাত থেকে কুঠার ছাড়াতে পারলেন না।

"অবশেষে পিতার পরামর্শে পরশুরাম এলেন ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কুঠার খসে পড়ল জলে।

"কুঠার হারিয়ে যাওয়ায় পরশুরাম রেগে গেলেন। ব্রহ্মপুত্র তখন স্বরূপ ধারণ করে পরশুরামকে কুঠার ফিরিয়ে দিলেন।

"খুশি হলেন পরশুরাম। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি কুঠারের সাহায্যে পথ তৈরি করে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র ধারাকে ব্রহ্মকুণ্ড থেকে নিয়ে এলেন কামরূপে। তারপরে তাঁকে বরদান করলেন—প্রতিবছর চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে তোমার মাঝে গঙ্গাদেবী স্থিতা হবেন। সেদিন যারা তোমার পবিত্রধারায় অবগাহন করবে, তারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হবে।

"সেদিন থেকে অশোকাষ্টমীতে স্নানের প্রচলন হয়েছে আসামে। প্রতিবছর ঐ পুণ্যতিথিতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ব্রহ্মপুত্রের পবিত্রধারায় অবগাহন করেন। তাঁরা কায়মনোবাক্যে কামনা করেন—

'ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥'

প্রগতি চুপ করে। আমি জিজ্ঞেস করি, "তুমি কখনও অশোকাষ্টমীর স্নান করেছো?"

“না।”

“কেন?”

“মা থাকতে ঐ স্নান করতে নেই।”

“যাক্ গে, আমারও তাহলে আর কোনো আপসোস রইল না।”

“আপনারও মা আছেন, তাই না?”

“হ্যাঁ।”

“বাড়ি ফিরে গিয়ে, তাঁকে তাঁর এই অসমীয়া মেয়ের প্রণাম জানাবেন।”

২৩

হাজো থেকে ফিরে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল। সইতে হল এনাবৌদির মৃদু তিরস্কার। তাঁর বক্তব্য, সময়মতো আহার্য গ্রহণ না করার চেয়ে গর্হিত অপরাধ সংসারে খুব কমই আছে। অথচ সকালে ব্রেক্‌ফাস্ট্‌-য়ের নাম করে তিনি যে আমাকে 'লাঞ্চ' খাইয়ে দিয়েছেন, সেকথাটা মনে করিয়ে দেবার কোনো সুযোগ দিলেন না।

যাই হোক, দ্বিতীয়বার মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বৌদির আদেশ হোল, "অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে, এবার গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। তিনটের সময় বের হব। আপনার কয়েকটা চায়ের নেমন্তন্ন আছে।"

"কয়েকটা।"

"হ্যাঁ। তিনটে তো বটেই। আর তারপরে বোধহয় সোমেশ আপনাকে নিয়ে কয়েক জায়গায় যাবে।"

কথাটা গাড়িতে বসে সোমেশও বলেছে আমাকে। সে যে সেই সকাল থেকে এতক্ষণ ছিল আমার সঙ্গে। বিজয়দার গাড়িতে করে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল নবগ্রহ, উমানন্দ, পাণ্ডু, বশিষ্ঠাশ্রম ও হাজো।

গৌহাটি শহরের পূর্বপ্রান্তে চিত্রাচল পাহাড়ের ওপর অবস্থিত নবগ্রহ মন্দির। প্রাচীনকালে নাকি মন্দিরটি জ্যোতির্বিদ্যা তথা মহাকাশ গবেষণার একটি প্রধানকেন্দ্র ছিল। আর তাই তখন গৌহাটিকে বলা হত প্রাগজ্যোতিষপুর—জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার পূর্ব-প্রান্তিক নগরী।

এই মন্দিরে আদিত্যের সঙ্গে নয়টি গ্রহের শিলাচিহ্ন রয়েছে। কালিকা-পুরাণে বলা হয়েছে—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এখানে বসে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে-ছিলেন। তাই এ দেশের নাম প্রাগজ্যোতিষ। এখনো নবগ্রহ মন্দির জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার একটি কেন্দ্র। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে প্রাচীন মন্দির

ভেঙে গিয়েছে। ভগ্ন মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহ। মন্দিরের গায়ে তাঁর শিলালিপি (১৭৫২ খ্রীঃ) আছে।
মন্দিরের দক্ষিণদিকে রয়েছে ন'কোণা জলাশয়। নাম শিলাপুখুরী। পুকুরপাড়ে রাজেশ্বর সিংহের আরেকখানি শিলালিপি আছে।
উমানন্দ দর্শন করে আমরা গিয়েছি বশিষ্ঠাশ্রমে। গৌহাটির ৭ মাইল দক্ষিণে সন্ধ্যাচল পাহাড়ে অবস্থিত এই রমণীয় স্থান। পাহাড়ী নদী সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তার সঙ্গমে চড়ুইভাতির আদর্শস্থল।
কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে—নিমি রাজার অভিশাপে ব্রহ্মার মানসপুত্র ও ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠমুনি দেহহীন হয়ে যান। বাধ্য হয়ে বশিষ্ঠ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে এই সন্ধ্যাচলে এসে বিষ্ণুর তপস্যা করার পরামর্শ দিলেন।
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বশিষ্ঠকে বর দান করলেন। মহর্ষি তপোবনে সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তার ত্রিধারার ভেতর দিয়ে গঙ্গাকে নিয়ে এলেন এখানে। সেদিন থেকে এই পুণ্যসঙ্গমের নাম হল বশিষ্ঠগঙ্গা। এই গঙ্গায় স্নান করে ও গঙ্গাবারি পান করে বশিষ্ঠ দেহ ফিরে পেলেন। তারপরেও তিনি বহুকাল এই গঙ্গাতীরে বসে ত্রিসন্ধ্যা জপ করেছেন।
বশিষ্ঠগঙ্গার পুণ্যধারায় স্নান করলে নাকি সন্ধ্যা পতিত হবার পাপমুক্ত হওয়া যায়। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় সংখ্যাতীত পুণ্যার্থী এখানে পুণ্যস্নান করেন। বশিষ্ঠগঙ্গাই উত্তরবাহিনী ভরলু নদী—গৌহাটিকে সিক্ত করে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে।
আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহপ্রতিষ্ঠিত বশিষ্ঠদেবের মন্দির রয়েছে বশিষ্ঠাশ্রমে। মন্দিরে আছে বশিষ্ঠমুনির চরণচিহ্ন আর রাজেশ্বর সিংহের শিলালিপি।
বশিষ্ঠাশ্রম থেকে আমরা পাণ্ডুতে গিয়েছি। পাণ্ডুনাথ দেবালয়ে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি দর্শন করেছি। তারপরে শরাইঘাট পুল পেরিয়েছি—উত্তর ও দক্ষিণ আসামের একমাত্র সেতুবন্ধন।
অবশেষে আমরা পৌঁচেছি হাজো। গৌহাটি থেকে ১৪ মাইল।

প্রথমেই দর্শন করেছি মণিপর্বতের ওপরে স্থাপিত হয়গ্রীবমাধবের মন্দির। কালিকাপুরাণের মতে ঔর্বঋষি হলেন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। জ্বরাসুর ও হয়াসুর প্রভৃতি পাঁচজন অসুর ঔর্বঋষির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিল বলে বিষ্ণু তাদের বধ করেন। তিনি হয়গ্রীবমাধব রূপে অবস্থান করছেন এখানে। মন্দিরে হয়গ্রীবমাধব, দ্বিতীয়মাধব গোবিন্দ-মাধব, গরুড় ও বাসুদেবের মূর্তি রয়েছে।

কালাপাহাড় এই মন্দির ভেঙে ফেলেন। কোচরাজ রঘুদেব ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। রঘুদেব এবং প্রমত্ত সিংহ ও কম-লেশ্বর সিংহের শিলালিপি রয়েছে মন্দিরে। প্রমত্ত সিংহ এখানে আরেকটি মন্দির নির্মাণ করেছেন। সেখানে দোল উৎসব হয়।

হাজো শুধু হিন্দুতীর্থ নয়, বৌদ্ধ এবং মুসলমানদেরও পবিত্রভূমি। একদল বৌদ্ধ বিশ্বাস করেন এখানেই বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেছেন। তাই তাঁরা, বিশেষ করে বহু ভুটিয়া, শীতকালে হাজোতে আসেন।

প্রাতঃস্মরণীয় পীর গিয়াসুদ্দিন আউলিয়া নির্মিত প্রাচীন মসজিদ আছে হাজোতে। ভক্ত মুসলমানদের ধারণা এই মসজিদ দর্শন করলে হজের এক-চতুর্থাংশ পুণ্যলাভ করা যায়। তাই তারা ঐ মসজিদকে বলেন 'পোয়া-মক্কা।'

হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের মিলনভূমি হাজো থেকে আমরা ফিরে এসেছি। যাই নি শঙ্করদেবের সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বর-পেটার বৈষ্ণব মন্দিরে। এমন কি সময়াভাবে অশ্বক্লান্তের মন্দির দুটির ভেতরে যেতে পারি নি।

এযাত্রায় আমার যাওয়া হল না মানস। মানস নদী থেকে ভুটান পাহা-ড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আসামের সবচেয়েসুন্দর সংরক্ষিত বনভূমি উত্তর কামরূপ অথবা মানস-অভয়ারণ্য। শুনেছি হাতি, বুনোমোষ, বুনোষাঁড়, বিভিন্ন জাতের হরিণ, শুয়োর, সম্বর বাঘ ও গণ্ডার প্রভৃতি সবই আছে নাকি সেখানে। দূরও খুব একটা বেশি নয়, গৌহাটি থেকে ১১০ মাইল। ট্যুরিস্ট বাংলো আছে। বরপেটার ডিভিশ্যন্যাল ফরেস্ট

অফিসার বাসস্থান ও হাতির ব্যবস্থা করে দেন।··

"না ঘুমিয়ে কি ভাবছেন শুয়ে শুয়ে ?

ভাবনা থেমে যায়। এনা বৌদি কখন এসেছেন টের পাই নি। তিনি আমাকেএকটু ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলেন। আমি শুয়ে শুয়ে অমরাবতী-আসামের কথা ভাবছিলাম—কি দেখেছি আর কি দেখি নি, তার হিসেব মেলাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। সহাস্যে বলি, "বৌদি, লেখক মানেই Whole time clerk. তাদের দিবানিদ্রা নিষেধ।"

"লেখা-পড়া না থাকলেও ঘুমানো নিষেধ ?"

"হ্যাঁ। নইলে বদভ্যাস হয়ে যাবে যে।"

"যাক্ গে আড়াইটে বেজেছে। এবারে তৈরি হয়ে নিন।" বৌদি চলে যান।

আজ এঘরে আমি একা। দক্ষিণাদা গতকাল সকালে কলকাতা চলে গিয়েছেন। সেদিন দমদম থেকে যাদের সঙ্গে আসাম রওনা হয়েছিলাম, তাঁরা কেউ আর আসামে নেই। কেবল আমি আজও রয়ে গিয়েছি। কিন্তু আগামীকাল সকালে আমাকেও নিতে হবে বিদায়। হ্যাঁ, বিদায় নিতে হবে অমরাবতী-আসামের কাছ থেকে।

যাবার সময় দক্ষিণাদার সঙ্গে দেখা হয় নি। চেরাপুঞ্জি দেখে গতকাল সন্ধ্যায় আমি শিলং থেকে ফিরে এসেছি এখানে।

কিন্তু না, শিলং কিংবা চেরাপুঞ্জির কথা এখন নয়। তার চেয়ে বরং গৌহাটির কথাই ভাবা যাক।

সেদিন প্রগতিকে হস্টেলে রেখে সাতটার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম বেঙ্গলী স্কুলে। আর গিয়েই চিৎকার করে উঠতে হয়েছিল—কি ব্যাপার ! তুমি আবার এখানে !

সলজ্জ স্বরে প্রমথ উত্তর দিয়েছে—আগেই জানতাম আজ আপনাদের এখানে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। মরিয়ানী থেকে গাড়িটা গৌহাটি এসেও গেল সময়মতো। ভাবলাম একটা দিন বৈ তো নয়। তাই নেমে পড়লাম।

না। আমি ওকে কিছুই বলতে পারি নি। কি বলব? প্রমথ তো নাবালক নয়, সে ওকালতি করে। তাছাড়া বটেই তো, গৌহাটি যখন জোড়হাট থেকে কোকরাঝাড় যাবার পথে, সেই গৌহাটিতে যখন আমাদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে এবং ওর ট্রেনটা সময়মতো পৌঁচেছে, তখন না নেমে পড়ার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া সেদিন শিবসাগরে বিদায় নেবার সময় সে তো বলেই রেখেছে—'আপনার স্নেহে আমার জীবন ধন্য হল।'

গৌহাটি ও পাণ্ডু থেকে যাঁরা জোড়হাটে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে সেদিন। দেখা হয়েছে পাণ্ডু কলেজের বাংলার অধ্যাপক ডঃ শ্রীমন্ত জানার সঙ্গে। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জোড়হাটেই আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

আলাপ হয়েছে ডঃ গৌরী করের সঙ্গে। অভিজ্ঞানে প্রকাশিত 'মানব-দরদী শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি তাঁকে।

যথারীতি সেদিন দক্ষিণাদা চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন। সভায় পৌর-হিত্য করেছেন বিজয়দা।

সেদিন প্রমথকে আমি মুখে কিছুই বলি নি। শুধু মনে মনে ভেবেছি —প্রমথ, আমার কাছ থেকে তোমরা কতটুকু পেয়েছো, জানি না। তবে আসামে এসে তোমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সঞ্চয় করে নিয়ে গেলাম, তা আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

তাই সেদিন সভায় দাঁড়িয়ে বলেছি—আপনারা মহৎ বলেই আজ আমাকে এই সংবর্ধনা জানালেন। কিন্তু আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে আপনারা নিজেদেরই অভিনন্দিত করলেন। কারণ কবিগুরুর মতো আমিও আপনাদের বলে যেতে চাই—

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক মোর শেষ পরিচয়।'

সোমেশ কথা রাখল। তিনটের আগেই ফিরে এলো বাড়ি থেকে। আমরা গাড়িতে উঠি। আমরা মানে বিজয়দা, বৌদি, ঊর্মি, সোমেশ ও আমি। শুমি বাড়িতেই রইল।

বিজয়দা বিবেচক মানুষ, তার ওপরে আমার কাছে সবকথা শুনে তাঁরও হয়তো প্রগতিকে দেখার একটা কৌতূহল হয়ে থাকবে। তিনি প্রথমেই আমাকে প্রগতির হস্টেলে নিয়ে এলেন।

সে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো গাড়ির কাছে। নিজেই দরজা খুলল।

গাড়ি থেকে নামতেই প্রগতি অভিমান ভরা স্বরে বলে, "এত দেরি করলেন কেন? আমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি।"

"কিন্তু তোমার হস্টেলের ভিজিটিং আওয়ারস তো তিনটে থেকে?"

"আপনারা আগে এলেও কোনো অসুবিধে হত না।"

বিজয়দা বৌদি ও সোমেশের সঙ্গে প্রগতির পরিচয় করিয়ে দিই। সে তাঁদের প্রণাম করে। তারপরে ঊর্মির হাত ধরে বলে, "চলুন, ভেতরে গিয়ে বসবেন।"

ভিজিটার্স রুমে এসে বসি। হস্টেলের বারান্দা থেকে মেয়েরা দেখতে পায় আমাদের। কয়েক মিনিট বাদেই তারা এসে ভিড় করে। বলাবাহুল্য তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতে অটোগ্রাফের খাতা। এবং তারা সবাই ছাত্রী নয়, কয়েকজন অধ্যাপিকাও রয়েছেন।

বিজয়দা বিচক্ষণ মানুষ। আমার ছুটি পেতে দেরি হবে বুঝতে পেরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনারা বসুন, আমি একটা কাজ সেরে ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি।"

আমি আজ এখানে আসছি, সংবাদটি প্রগতির মারফতেই হস্টেলে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে, আমার ওপরে তার সতীর্থ ও শিক্ষিয়ত্রীদের এই হামলা সে মোটেই বরদাস্ত করতে পারছে না। কিন্তু সে নিরুপায়। তাই গম্ভীরমুখে পাশে বসে আমার অটোগ্রাফ দেওয়া দেখছে।

বৌদি আর সোমেশ আমার অসহায় অবস্থাটা বেশ রসিয়ে উপভোগ করছে। এমনকি উর্মিও মুচকি হাসছে। হয়তো ভাবছে—লেখক হওয়া তো ভারী মুশকিল !

এক সময় অটোগ্রাফ দেওয়া শেষ হল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পাঠিকাদের প্রশ্নবাণ। বলাবাহুল্য অধিকাংশ তাদের প্রশ্নই আমার নায়িকাদের প্রসঙ্গে।

এই কলেজ হস্টেলটি যদি কলকাতায় হোত, বলার কিছু ছিল না। কিন্তু এ যে আসামের গৌহাটি। যারা আমার লেখা নিয়ে আলোচনা করছে, তারা কেউ বাঙালী নয় অথচ আমি বাংলায় লিখি। বাংলার পাঠিকাদের চাইতে এরা কেউ আমাকে কম ভালোবাসে না। আশ্চর্য! এর পরেও আমরা ভাষা নিয়ে ঝগড়া করি !

বিজয়দা ফিরে এলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। উঠে দাঁড়াই।

প্রগতিও উঠে দাঁড়ায়। আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। মুহূর্তে ওর মুখখানি কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

আমার মনটাও খারাপ হয়ে যায়। সত্যই তো, এসেছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে, বিদায় নিতে। অথচ সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হল অন্য মেয়েদের নিয়ে।

বলি, "মন দিয়ে পড়াশুনা ক'রো, পরীক্ষার সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখো ; ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা চাই।"

প্রগতি শুধু মাথা নাড়ে। সে কি কথা বলতে পারছে না ? কান্না কি ওর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছে ?

তাই হবে। নইলে ওর চোখের পাতা এমন জলে ভিজে উঠবে কেন ?

না, না, আমি কাঁদব না। কেন কাঁদব ? আমি তো আবার আসামে আসব। আবার দেখা হবে প্রগতির সঙ্গে।

কিন্তু কান্না যে বড়ই অবাধ্য। কখনো কারও কথা শোনে না। তাই ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চুপ করে থাকি।

আঁচলে চোখ মুছে প্রগতি জিজ্ঞেস করে, "কাল কখন ফ্লাইট্ ?"

যথাসম্ভব অবিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিই, "পৌনে এগারোটায়, দশটা দশের মধ্যে এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করতে হবে।"

"তার মানে সাড়ে এগারোটায় দমদম পৌঁছচ্ছেন ?"

আমি মাথা নাড়ি।

প্রগতি বলে, "দমদমে নেমেই একখানা 'পোস্টকার্ড ড্রপ' করে দেবেন। পোস্টকার্ড দিয়ে দেব ?"

"না, না। আমার কাছে রয়েছে।"

আমরা গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে আসি। বিজয়দার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। জনক দরজা খুলে রেখেছে।

প্রগতি ও অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একে একে বিজয়দা, বৌদি, উর্মি ও সোমেশ গাড়িতে ওঠে।

এবারে আমার পালা—প্রগতির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সমাগত। যে প্রগতি আমাকে প্রথম আসামে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, লিখেছিল—সবার অনাদরে আসামের বুকে আত্মগোপন করে থাকা সৌন্দর্য আপনি চোখ মেলে দেখে যান ; আমার সেই অসমীয়া পাঠিকা প্রগতির কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে আমাকে।

প্রগতি প্রণাম করে আমাকে। তার মাথায় একখানি হাত রাখি।

চোখ মুছে বলি, "কেঁদো না বোন, আমি তো আবার আসব আসামে।"

"কবে ?" উঠে দাঁড়ায় সে। কান্না মেশানো স্বরে আবার জিজ্ঞেস করে, "কবে আসবেন ?"

"সময় পেলেই চলে আসব।"

"না।"

"তাহলে ?"

"আগামী মাসে আসতে হবে।"

কি উত্তর দেব। কেমন করে ওকে বলি, তা সম্ভব নয়।

কিন্তু নীরব থাকলে চলবে না। তাই বলি, "আচ্ছা, কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাজকর্মের অবস্থা দেখে, আমি জানাবো তোমাকে। কিন্তু তার

আগে তোমাকে জানাতে হবে, তোমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে।"

সে কি বোঝে কে জানে? সে মাথা নাড়ে।

আমি গাড়িতে উঠি। প্রগতি নিজেই দরজা বন্ধ করে দেয়। অন্যান্য মেয়েদের মতো সে-ও হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার করে।

জনক গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়ি নড়ে ওঠে, চলতে শুরু করে।

সবার সঙ্গে প্রগতিও হাত নাড়ে। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি চলতে শুরু করেছি।

প্রগতি আঁচলে চোখ মুছচে।

আমিও রুমাল বের করি।

২৪

পান বাজারে একখানি আধুনিক ডিজাইনের বাড়ির সামনে গাড়ি থামায় জনক।

বৌদি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বেল টিপলেন। একটি কিশোরী দরজা খুলে দেয়। বৌদি তার সঙ্গে একটু কথা বলে ইশারায় আমাদের ডাকেন। নিজে ভেতরে চলে যান।

আমরা ভেতরে আসি। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। সর্বত্র মার্জিত রুচির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে।

একটু বাদে জনৈকা দীর্ঘাঙ্গী ও সুশ্রী মহিলা ঘরে আসেন। আমাদের নমস্কার করেন। তাঁর কিশোরী কন্যাও ফিরে এসেছে মায়ের সঙ্গে। সে উর্মির পাশে বসে। ওরা একই বয়সী।

বৌদি পরিচয় করিয়ে দেন, "আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা মঞ্জুমালা দাস। ভালো ছাত্রী ছিল। দুটি লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বি. এ পরীক্ষায় অসমীয়াতে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে সোনার মেডেল পেয়েছে। ১৯৬২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ. পাশ করেছে।

"ওর বাবা ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার। মঞ্জু নিজেও নিয়মিত গল্প, কবিতা ও নাটক লেখে। গৌহাটি বেতারকেন্দ্র থেকে অভিনয় ও আবৃত্তি করে। ওর স্বামী ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। ওদের এই একটি মেয়ে—শ্রুতিমালা। শ্রুতিও লেখাপড়ায় ভালো।"

শ্রুতির অবশ্য আমাদের কথা শোনার ফুরসত নেই। সে উর্মির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

আমি সহাস্যে বলি, “আপনার এখানে এসে এক কাপ চা খাবার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম চারদিন আগে। কিন্তু কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। অথচ কি বিচিত্র যোগাযোগ দেখুন ! বৌদি আজ অজান্তে আপনার বাড়িতেই নিয়ে এলেন আমাকে।”

শ্রীমতী দাস বিস্মিতা। শুধু তিনি কেন, সবাই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

মঞ্জুমালা বলেন, “কিন্তু এনাদি তো গতকাল আমাকে বললেন, আপনি এখানে এসেছেন। আমি আপনাকে চায়ের নেমন্তন্ন করলাম !”

আবার একটু হাসতে হয় আমাকে। সহাস্যে বলি, “ডিব্রুগড় থেকে গৌহাটি আসার সময় চাবুয়া বিমানবন্দরে ডঃ দাসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি তখুনি বলেছেন, আপনি এনাবৌদির সহকর্মী। এ বাড়িতে এসে এককাপ চা খাবার নেমন্তন্নও করেছিলেন, কিন্তু কথাটা আমি বৌদিকে বলতে ভুলে গিয়েছি।”

“অথচ আমি আপনাকে ঠিক নিয়ে এসেছি ডঃ দাসের বাড়িতে।”

“আরেকটা কথা,” বৌদি থামতেই মঞ্জুমালা বলেন, “গৃহকর্তার নেমন্তন্নের সংবাদ জানার আগেই কিন্তু গৃহকর্ত্রী নেমন্তন্ন করেছে।”

“কেমন করে বলি ?” উত্তর দিই, “ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় থেকে কোনো চিঠি এসেছে কিনা জানা নেই আমার।”

“আসে নি।” মঞ্জুমালা উত্তর দেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।”

“মেয়েকে আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সমীচীন হবে না, তার চেয়ে বরং মায়ের কথাই বিশ্বাস করা যাক।”

নির্মল হাস্য-পরিহাসে আমরা মুখর হয়ে উঠি। গম্ভীর বিজয়দাও মাঝে মাঝে অংশ নিচ্ছেন।

হঠাৎ সোমেশ মঞ্জুমালাকে জিজ্ঞেস করে বসল, “আচ্ছা, আমাকে কি আপনার চেনা মনে হচ্ছে না ?”

একটুকাল তাকিয়ে থেকে মঞ্জুমালা বলেন, “ঠিক, মনে করতে পারছি

না।”

“খুবই স্বাভাবিক।” এ্যাডভোকেট মন্তব্য করে, “ভালো ছাত্রীদের কি আর সাধারণ ছাত্রদের কথা মনে থাকে?”

মনে পড়ে মঞ্জুমালার। তিনি সানন্দে বলে ওঠেন, “তাই বলুন। আমারও মুখখানি চেনা-চেনা লাগছিল। আমরা একই সময়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি।”

আবার হাস্যরোল।

শ্রীমতী মঞ্জুমালা ও শ্রুতিমালার কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। বিদায় বেলায় মঞ্জুমালা বলেন, “আবার গৌহাটি এলে, নিশ্চয়ই একবার আসবেন এখানে।”

আমি মাথা নাড়ি।

মঞ্জুমালা আবার বলেন, “তখন হয়তো শ্রুতির বাবাও এখানে থাকবেন।”

“কেন উনি কি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলী হয়ে আসছেন নাকি?”

“হ্যাঁ”।

“তাহলে তো আসতেই হবে। ভদ্রলোককে বড় ভালো লেগেছে আমার।”

“আমাদের কি খারাপ লাগল?”

“না। তবে তাঁকে আরও ভালো লেগেছে। আর আমার এই মন্তব্যের জন্য আপনার তাঁকে একেবারেই ঈর্ষা করা উচিত হবে না।”

আমার মন্তব্যে সবাই হেসে ওঠেন এবং মঞ্জুমালাও সঙ্গে যোগ দেন।

পানবাজার থেকে আমরা চাঁদমারী কলোনীতে এলাম। একটি সরকারী কোয়ার্টার্সের সামনে জনক গাড়ি থামায়। একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন বাইরে।

গাড়ি থেকে নামি। ওঁরা নমস্কার করেন। প্রতিনমস্কার করি।

বিজয়দা পরিচয় করিয়ে দেন, “শ্রী আর. কে. শর্মা, এখানকার ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট। আর তাঁর স্ত্রী দেবাবালা, এ্যাডভোকেট।”

"আমি বিজয়দার জুনিয়ার এবং সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।" পরিষ্কার বাংলায় দেবাবালা বলেন।

আমি অসমীয়া জানি না কিন্তু আসামে আসার পর থেকে আমার ইংরেজী কিংবা হিন্দী বলার প্রয়োজন পড়ে নি। বাংলাতেই কথাবার্তা বলছি। সবাই বুঝতে পারছেন এবং অধিকাংশই আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলেছেন। ভাষা-বিরোধের সামান্যতম নজিরও আমি পাই নি আসামের মাটিতে। আর আসামের মানুষদের কাছ থেকে যে অসামান্য ভালোবাসা পেয়েছি, তা প্রকাশ করবার মতো ভাষা জানা নেই আমার।

শর্মা দম্পতির সঙ্গে ভেতরে আসি। দেবাবালা একবার বাড়ির ভেতর থেকে ঘুরে আসেন। তারপরে কথায় কথায় আমাকে বলেন, "আমি আপনার অনেকগুলো বই পড়েছি। তাই বিজয়দাকে বলেছিলাম, আপনাকে নিয়ে আসতে। আপনি এসেছেন, ভারী খুশি হলাম।"

আমিও খুশি হলাম ওর কথা শুনে। তাই জিজ্ঞেস করি, "ইদানিং কি বই পড়েছেন?"

"গঙ্গাসাগর' ও 'তমসার তীরে তীরে'। গঙ্গাসাগরের শ্যামা ও দি'মাকে আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার ইচ্ছে বইখানির অসমীয়া অনুবাদ করি।"

"ইচ্ছে যখন হয়েছে, পূরণ করে ফেলুন।"

"না, মানে আপনার অনুমতি···"

"দিলাম।"

দোকানের মিষ্টির সঙ্গে বাগানের কলা এলো। কলা খেয়ে খুব খুশি হলেন বিজয়দা। বললেন, "বেশি আছে নাকি?"

"থাকবে না কেন?" শ্রীশর্মা বলেন, "সবে তো পরশু কাটা হয়েছে। নিয়ে যাবেন নাকি কয়েকটা?"

"সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করলাম কথাটা।"

বৌদি-চুপ করে আছেন। কিন্তু বাবার আচরণ মেয়ে বোধহয় বরদাস্ত

করতে পারে না। সে বলে ওঠে, "বাবা যেন কি? আমরা সব নিয়ে গেলে, পিসীরা কি খাবেন?"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ঊর্মি, নিজেদের জন্য না রেখে তোমার পিসী তার দাদাকে কলা দেবে না।"

শ্রীশর্মার কথা শুনে ঊর্মি হেসে দেয়। আমরাও তার সঙ্গে যোগ দিই। হাসি থামলে দেববালা বলেন, "তোমার পিসী কলা মোটেই পছন্দ করে না ঊর্মি। সে যে-কটা কলা রাখবে, সবই তোমার পিসেমশায়ের পেটে যাবে।"

আবার হাস্যরোল। হাসি থামলে শ্রীশর্মাকে বলি, "আপনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন, যে ঊর্মির পিসী একজন এ্যাডভোকেট?"

কিন্তু এ্যাডভোকেটরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই আরেকজন এ্যাডভোকেট ঘরে ঢোকেন। সোমেশ পরিচয় করিয়ে দেয়, "শ্রী বি. পি. শইকীয়া। আমাদের হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রারার-কাম-অফিসিয়াল লিকুইডেটর। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

নমস্কার বিনিময় হয়। বিজয়দা বলেন, "ওঁর আরেকটা পরিচয় আছে, খুব ভালো ক্রিকেট খেলেন। প্রতিবার খেলা দেখতে কলকাতায় যান।"

"আগামী বছর এম সি. সি. আসছে। যাচ্ছেন নাকি?" জিজ্ঞেস করি।

শ্রী শইকীয়া উত্তর দেন, "ইচ্ছে আছে।"

"তাহলে আমার অফিসে আসবেন একদিন, ইডেন গার্ডেনস্-য়ের কাছেই।" আমি ঠিকানাটা দিই। শ্রী শইকীয়া ডায়েরী বের করে লিখে নেন।

আরও কিছুক্ষণ গল্প চলে। তারপরে বৌদি বিজয়দাকে বলেন, "তোমরা বরং বসো এখানে, আমরা ঘুরে আসি ওখান থেকে।" তিনি উঠে দাঁড়ান।

আমি দেবাবালাকে বলি, "আমার আসাম ভ্রমণের সামান্য অভিজ্ঞতা আর আপনাদের অসামান্য ভালোবাসার কথা নিয়ে একখানি বই লিখব

ঠিক করেছি। কিন্তু এবারে আমি ডায়েরী লিখি নি। তাই সময় ও সুযোগমত গৌহাটির দর্শনীয় স্থানগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে পাঠাবেন।"

কি যেন একটু ভাবেন দেবাবালা। তারপরে বলেন, "আপনারা গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।"

একটু বাদে ফিরে আসেন দেবাবালা, তাঁর হাতে শ্রীমহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত একখানি 'পবিত্র অসম'।

বইখানি আমার হাতে দিয়ে বলেন, "এ বইটা আপনি নিয়ে যান। আমার মনে হয় এতে আপনার কাজ হয়ে যাবে।"

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। বলি, "জাতীয় গ্রন্থাগারে আমি বইখানি পেয়ে যাবো। আপনি এটা রেখে দিন।" আমি ওঁর দিকে হাত বাড়াই।

কিন্তু দেবাবালা হাত বাড়ান না। তিনি বলেন, "বইটা আপনার কাছে থাকলে, আরও বেশি কাজে লাগবে। তাছাড়া আমি ওটা আপনার নামে লিখে দিয়েছি, এখন ফেরত নেওয়া বে-আইনী হবে।" দেবাবালা এ্যাডভোকেট।

জনককে গাড়ির আলোটা জ্বালাতে বলি। বইখানি খুলি। দেখি লেখা রয়েছে—

শ্রীশর্মার কোয়ার্টার্স থেকে আমরা এলাম ডঃ নির্মলপ্রভা বরদলৈ-য়ের বাড়িতে। শ্রীমতী নির্মলপ্রভার নাম আমি শুনেছি জাতীয় গ্রন্থাগারে, শ্রীকুলনাথ গগৈ-য়ের কাছে। তাঁর দু-একখানি বইও আমি দেখেছি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা ছিল না আমার। আসার পথে গাড়িতে বসে বৌদি বলেছেন—শ্রীমতী বরদলৈ শিবসাগরে জন্মগ্রহণ

করেছেন। তিনি শিবসাগর ও গৌহাটিতে শিক্ষালাভ করেন। 'অসমীয়া কবিতায় প্রকৃতির প্রভাব' বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। নির্মলপ্রভা একালের অসমীয়া সাহিত্যের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু বিভিন্ন জটিল বিষয়ের ওপরে তিনি নিয়মিত সরল প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

শ্রীমতী বরদলৈ ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, আসাম আকাদেমী ও সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

বৌদি ও দেবাবালার সঙ্গে বসবার ঘরে আসি। একটু বাদে শ্রীমতী বরদলৈ এলেন। নমস্কার বিনিময়ের পরে আসন গ্রহণ করলেন। তারপরে বললেন—ভারী খুশি হলাম, আপনি এসেছেন। আসাম আপনার কেমন লাগল বলুন?

—ভালো, খুব ভালো। উত্তর দিই,—এত ভালো যে আসাম নিয়ে একখানি বই লিখব ভাবছি।

—আনন্দের কথা। কারণ একালে বাংলায় আসাম সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য বই লেখা হচ্ছে না।

মৃদু হেসে বলি—আমার বই যে উল্লেখযোগ্য হবে, তাই বা বুঝলেন কেমন করে?

—হবে। আমি আপনার বই পড়েছি। আচ্ছা, আপনি ক'খানা বই লিখেছেন?

—তেইশখানা।

—শুনলাম আপনি চাকরি করেন। এত সময় পান কেমন করে?

সহাস্যে বলি—কাজ করার ইচ্ছে থাকলে যে সময় এবং সুযোগের অভাব হয় না, তা তো আপনার অজানা নয়। তাছাড়া আঠারো বছরে তেইশখানি বই তো মোটেই বেশি নয়। বাংলায় এমন লেখকও আছেন, যাঁরা দশ-পনেরো দিনে একখানি করে বই লিখে ফেলছেন।

—তাঁদের কথা ছেড়ে দিন। আমি আপনার বই পড়েছি। আমি জানি আপনাকে প্রত্যেকটি বইয়ের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়। এই

তো কদিন আগে আপনার একসেট 'মধু-বৃন্দাবনে' একজনকে উপহার দিলাম। প্রচুর খেটেছেন আপনি।

কিছুক্ষণ বাদে চা এলো। কিন্তু কথাবার্তা একই খাতে বইতে থাকল। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি। শ্রীমতী বরদলৈ সাধারণ পাঠিকা নন। তিনি অসমীয়া সাহিত্যের একজন সর্বশ্রেষ্ঠা সাহিত্যিক। আর তিনি কিনা তাঁর বাড়িতে বসে আমার সঙ্গে আমার লেখা নিয়ে আলোচনা করছেন!

যাক্ গে, দুজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছেন। এবারে আশাকরি আলোচনার প্রসঙ্গ পালটাবে।

হ্যাঁ। শ্রীমতী বরদলৈ ভদ্রলোকদের সঙ্গে অসমীয়াতে কথা বলতে শুরু করলেন। সব কথা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তাঁদের কথাবার্তার বিষয়-বস্তু অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—আগামীকাল ব'হাগ বিহুর সমাপ্তি উৎসব। তাই সন্ধ্যের সময় এক প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা শ্রীমতী বরদলৈকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তিনি। তারপরে উদ্যোক্তাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করতে বললেন।

সবিনয়ে বলি—আমি কাল সকালেই কলকাতা চলে যাবো। বিকেলে একটা জরুরী কাজ রয়েছে।

—থাকলে কিন্তু ভালো করতেন। নির্মলপ্রভা বললেন—আসাম নিয়ে বই লিখবেন, বিহুর কথা লিখতেই হবে।

—জানি। কিন্তু আমাকে কাল কলকাতায় পৌছতেই হবে।

ওঁরা আর জোরাজুরি করেন না।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা বিদায় নিই শ্রীমতী নির্মলপ্রভার কাছ থেকে। মুখে বলি, 'বিদ্যা দদাতি বিণয়ং' কথাটা যে কতখানি সত্য, আজ আপনাকে দেখে তা জেনে গেলাম।

আর মনে মনে ভাবি—আমি ধন্য। চাষী জাহাঙ্গীর থেকে কবি নির্মল-

প্রভা, আসামের সবাই ভালোবাসেন আমাকে। মানুষের জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে ?

রাত আটটা নাগাদ জনক আমাদের সোমেশের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিল। বিজয়দারা বাড়ি চলে গেলেন। সোমেশ আমাকে পৌঁছে দেবে। এখন সে আমাকে নিয়ে চলেছে বাঙালী পাড়ায়। তাঁরা নাকি আমাকে দেখতে চেয়েছেন। পাঠক-পাঠিকার দাবী, মানতেই হবে।

সোমেশের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এক বাড়ির মানুষ অন্য বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছেন। এ যেন ৺বিজয়া দশমীর দেখা করতে বেরিয়েছি। সবার কাছ থেকেই পেলাম অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অনেকেই প্রশ্ন করলেন—আবার কবে আসামে আসছেন। তখন কিন্তু আমাদের এখানে উঠতে হবে।

জানি না কবে আবার আসামে আসতে পারব ? কিন্তু জোড়হাট থেকে যে নিমন্ত্রণ শুরু হয়েছে, গৌহাটি এসেও তা শেষ হচ্ছে না। আসামের স্নেহপ্রবণ ও অতিথিপরায়ণ মানুষগুলো একি আশ্চর্য আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করল আমাকে! আমি যে বহুদিন ভুলতে পারব না এদের কথা! ভুলতে পারব না সোমেশকেও। সেই সকাল থেকে সে সমানে আমাকে নিয়ে ঘুরছে। না, মোটেই শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি। সে তো শুধু সাহিত্য-রসিক এ্যাডভোকেট নয়, একজন সমাজসেবী। তার এমন পরিশ্রম করার অভ্যেস আছে।

ফেরার পথে রিক্সায় সোমেশের পাশে বসে সোমেশের কথাই ভাবছিলাম মনে মনে।

সোমেশ কাছাড়ের ছেলে। ওর জন্ম করিমগঞ্জের এক চা-বাগানে। বাবা চা-বাগানের ডাক্তার। সেখানেই স্কুল জীবন। তারপরে হস্টেলে থেকে করিমগঞ্জ কলেজে পড়েছে।

বাবার আশা ছিল সোমেশ ডাক্তার হবে। তাই ভর্তি করে দিয়েছিলেন আই. এস. সি. ক্লাশে। পাশ করার পরে বাবা বুঝতে পারলেন, বিজ্ঞান

তাঁর ছেলের জন্য নয়। তিনি তাঁকে বি. এ. পড়ার অনুমতি দান করলেন। এদিক থেকে সোমেশের আশ্চর্য মিল রয়েছে আমার সঙ্গে। রাজনীতি নিয়ে সোমেশ গৌহাটি থেকে এম. এ. পাশ করে ১৯৫৪ সালে। তারপরে দু'বছর অধ্যাপনা করার পরে আইন পড়তে শুরু করে। ১৯৫৪ সাল থেকে সে গৌহাটি হাইকোর্টে ওকালতি করছে।

কথায় কথায় সোমেশ বলছে, "সাহিত্য সম্মেলনের আসাম শাখার সম্পাদক ছিলাম বলেই ভাগলপুরে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু দাদা, আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যের আসরে চেয়ার-টেবিল সাজানোই আমার কাজ।"

সহাস্যে বলি. "তোমরা সাজাও বলেই তো আমরা বসতে পাই।"

সোমেশ কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "আমি মনে-প্রাণে বাঙালী। আমি বাঙালীর প্রতিষ্ঠা চাই, বাংলা ভাষার প্রসার চাই। কিন্তু কোনো ভাষাকে ঘৃণা করি না। আমি অসমীয়াদের ভালোবাসি, তাঁদের ভাষা ও সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করি। আমি চাই দুই ভাষা-ভাষী মানুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করুক।"

রিক্সা যখন বিজয়দার বাড়ির সামনে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় দশটা। সোমেশকে বাড়ি ফিরতে হবে। কাল সকালে সে তো আবার আসছে এখানে। তাই বলি, "তোমার আর ভেতরে যাবার দরকার নেই। এই রিক্সা নিয়েই বাড়ি চলে যাও।"

সোমেশ চলে যায়। আমি গেট খুলে ভেতরে আসি। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। এবারের মতো আসাম পরিক্রমা পূর্ণ হল আমার। দিনগুলো যে কিভাবে কেটে গেল, টেরই পেলাম না। এতগুলো আনন্দময় দিন এক-সঙ্গে আমার জীবনে খুব কম এসেছে। আর এই আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়ে ডায়েরী পর্যন্ত লেখা হয় নি। অথচ আমি এই পরিক্রমা নিয়ে বই লিখতে চাইছি।

না, কোনো অসুবিধে হবে না। আসাম-ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত যে আমার মনের ডায়েরীতে লেখা হয়ে গিয়েছে। প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও সুলেখক

ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ বহুদিন বাদে বই লিখতে বসে তাঁর নীলগিরিপর্বতা-রোহণ সম্পর্কে যে উক্তি করে গিয়েছেন, আমিও তেমনি বলতে পারব '……I can picture it as though it were yesterday.…'

বেল টিপি। বৌদি দরজা খোলেন। বলেন, "জনসংযোগ শেষ হল ?"

মৃদু হেসে ভেতরে ঢুকি।

"ঠিক কথা।" বৌদি আবার বলেন, "বাড়ি এসে শুনলাম প্রগতিনাকি সন্ধ্যার সময় এখানে এসেছিল। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গিয়েছে।"

অবাক হই। বিকেলেই তো দেখা হল তার সঙ্গে। অশ্রুসিক্ত হয়ে বিদায় নিল, বিদায় দিল। তারপরে এমন কি হল যে তাকে আবার ছুটে আসতে হল এখানে ? কিছু বলতে কিংবা সে শুধুই আরেকবার দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে ?

এসে দেখা না পেয়ে ফিরে গেল!

"কিছুই বলে যায় নি।" বৌদি যোগ করেন, "তুমি তখন পাশের বাড়িতে গিয়েছিল। চলে যাবার সময় আমার কাজের লোকটিকে শুধু তার নাম বলে গিয়েছে।"

কি বলতে এসেছিল সে ? আর কিছু না বলেই বা চলে গেল কেন ?

আচ্ছা, একটা কাজ করা যেতে পারে। কাল বিমানবন্দরে যাবার সময় তো আমরা ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। ফেরার সময় বৌদি ওকে হস্টেলে পৌঁছে দেবেন। ঘণ্টাদুয়েক পড়াশোনা করতে পারবে না। কি আর একটা ক্ষতি হবে ?

কথাটা তাই বলে ফেলি বৌদিকে।

বৌদি জিজ্ঞেস করেন, "মেয়েটার জন্য মন কেমন করছে, তাই না ?"

আমি চুপ করে থাকি।

বৌদি আবার বলেন, "……স্নেহ অতি বিষম বস্তু।"

২৫

বিজয়দার ভাইপো শ্রীতৃপ্তিকুমার দাস কয়েকদিন আগে অফিসের কাজে এখানে এসেছেন। তিনিও আজ আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। দুটো মানুষ খেয়ে যাবে তাই বৌদি সকাল থেকে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসং পান নি। তাহলেও তিনি আমাদের আগেই তৈরি হয়ে নিলেন।

ঠিক ন'টার সময় সোমেশ এলো। বিজয়দা স্নমি ও উর্মির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। এত আগে রওনা দেবার দরকার ছিল না। কিন্তু পথে পরিবহন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীস্নুরঞ্জন নন্দীর বাড়িতে নামতে হবে একবার। তিনি জানতেন আমি আজ গৌহাটি থাকব। তাই সকালে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছিলেন।

শ্রীনন্দী বাইরের ঘরে বসেছিলেন। তাঁকেও এখুনি বিমানবন্দরে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আজ দিল্লী ফিরে যাচ্ছেন।

খুশি হলেন শ্রীনন্দী। বললেন—আজকের দিনটা থেকে যান না এখানে, কাল ফার্স্ট ফ্লাইটে চলে যাবেন। বিকেলে কাজ কম, একটু গল্প করা যেতো।

—আমার সিট বুক করা হয়ে গিয়েছে।

—টিকেটটা আমাকে দিয়ে দিন। আমি আজকের সিট ক্যান্সেল করিয়ে কালকের ফার্স্ট ফ্লাইট করিয়ে নেবো। আমি তো এয়ারপোর্টেই যাচ্ছি।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করি। প্রতিশ্রুতি দিই—অদূর ভবিষ্যতে আবার আসব আসামে। তখন নিশ্চয়ই একদিন আপনার বাড়িতে এসে গল্প করে যাবো।

জনক গাড়ি ছাড়ে। গাড়ি এগিয়ে চলে বিমানবন্দরের পথে। আমি আজ বিদায় নিচ্ছি অমরাবতী-আসামের কাছে থেকে।

কথাটা কিন্তু ঠিক মনে আছে বৌদির। জিজ্ঞেস করেন, "আমরা তো এখন প্রগতির হস্টেলে যাবো?"

"না।" আমি উত্তর দিই।

বৌদি বিস্মিতা, "কেন? আমরা কি ওকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাচ্ছি না?"

"না"। আমি বলি, "ভেবে দেখলাম, আর মায়া বাড়নো উচিত হবে না।"

বৌদি কোনো প্রশ্ন করেন না। একটু হাসেন।

সোমেশ নীরব থাকে।

গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই। গৌহাটির জনবহুল পথ পেরিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

গৌহাটি আসামের প্রবেশ তোরণ, আবার প্রস্থানদ্বারও বটে। সেদিন জোড়হাট থেকে আমার যে আসাম-পরিক্রমা শুরু হয়েছিল, আজ গৌহাটিতে তা শেষ হতে চলেছে। কিন্তু সেই শুরু আর এই শেষের মাঝে আমার মনের পাতায় লেখা হয়ে রইল এক অভূতপূর্ব মধুর-কাহিনী। এ কাহিনী উপন্যাস নয়, আত্মজীবনী নয় হয়তো বা ভ্রমণ কাহিনীও নয়, অথচ আমার জীবনের অবিস্মরণীয় স্মৃতিকথা।

আমি আজ আসামের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কিন্তু আমার মন বিয়োগ ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে না। আসামের মধুর স্মৃতি আমার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বিচ্ছেদের জ্বালা দূর করে দিয়েছে।

তাই বিচ্ছেদের বেদনায় বিচলিত না হয়ে আমি শেষবারের মতো অপরূপা আসামকে দেখে নিচ্ছি। সেদিন যে গাড়িতে চড়ে যে পথ দিয়ে বড়ঝাড় থেকে গৌহাটি এসেছিলাম, আজ সেই গাড়িতে সেই একই পথ দিয়ে গৌহাটি থেকে বড়ঝাড় চলেছি।

ইতিমধ্যে শহরের জনবহুল অংশ ছাড়িয়ে এসেছি। আমরা শহরতলীর

পথ চলেছি। সেই ভরলু নদীর পুল পেরিয়ে এলাম। সেদিন এই নদীর আরেক পুল পেরিয়ে প্রগতির হস্টেলে গিয়েছিলাম। কিন্তু না, প্রগতির কথা নয়। আর মায়া বাড়ানো উচিত হবে না।

সেই আসাম ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে। সেদিন মা-কামাখ্যাকে দর্শন করে এই পথে আমরা গৌহাটি এসেছিলাম। আজও কামাখ্যা পাহাড়ের দিকেই চলেছি। ঐ তো, সামনে নীলাচলকে দেখা যাচ্ছে।

প্রণাম করি। প্রার্থনা করি—মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। আমি যেন আবার আসতে পারি আসামে, দর্শন করতে পারি তোমাকে।

সেই কাটিং। এখান থেকে সেদিন আমার কামাখ্যার ভাবনা শুরু হয়েছিল। কতটুকুই বা পথ—মাত্র ছ'মাইল। গাড়িতে কতক্ষণই বা লাগে? কিন্তু না, আজ আমি আর যাবো না মায়ের কাছে. মা যে রয়েছেন আমার বুকের মাঝে। আজ শুধু নীলাচলকে বলি—আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

নীলাচল পড়ে রইল পেছনে, আমি এগিয়ে চললাম সামনে। বাঁদিকে মালিগাঁও রেলস্টেশনের সেই পথ। মালিগাঁও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সদর দপ্তর।

সেই লেভেল ক্রসিং। সেদিন দাঁড়াতে হয়েছিল এখানে, আজ পথ খোলাই আছে। গাড়ি রেল লাইন পেরিয়ে এলো। লাইনটা এসেছে তিনসুকিয়া অর্থাৎ পুবদিক থেকে, মোটরপথের বাঁদিক দিয়ে। এইখানে এসে ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে। পাণ্ডু হয়ে শরাইঘাট পুলের ওপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে চলে গিয়েছে। তারপরে রঙ্গিয়া জংশন হয়ে পুবে নর্থ-লখিমপুর আর পশ্চিমে নিউ জলপাইগুড়ি। অর্থাৎ আসাম থেকে বাংলার রেলপথ।

শুধু রেলপথই বা বলি কেন, মোটরপথও তো শরাইঘাটের ওপর দিয়ে। এখানেই আসাম ট্রাঙ্ক রোডে এসে মিশেছে সাঁইত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে—এন. এইচ. থার্টিসেভেন। আমার পরিচিত পথ। সেদিন এই

পথ দিয়েই রতনবাবু আমাদের জোড়হাট থেকে ডিব্রুগড় নিয়ে গিয়েছিলেন।

এন. এইচ. থার্টিসেভেন আপার-আসাম থেকে নেমে এসে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়ে গৌহাটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করেছে, মিলেছে আসাম ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে। তারপরে হয়েছে দ্বিধা-বিভক্ত। একভাগ রেললাইনের সঙ্গী হয়ে গিয়ে উঠেছে সরাইঘাট পুলে, আরেক ভাগ চলে গিয়েছে পশ্চিমে—গোয়ালপাড়ায়। আমি অবশ্য বলব বড়ঝাড়ের দিকে। আমরা যে এখন সেই পথেই এগিয়ে চলেছি।

পথের বাঁদিকে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরে ফরেস্ট স্কুল—পেছনে বিখ্যাত দীপার বিল।

খঞ্জন নদীর পুল পেরিয়ে এলাম। নদীটি বাঁদিকের দীপার বিল থেকে সৃষ্ট হয়ে ডানদিকের ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশেছে।

ডানদিকে পলাশবাড়ির সেই পথ চলে গেল। আমরা এখন দক্ষিণ-পশ্চিমে চলেছি। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে জনক 'এ-ক্সিলারেটর'-য়ে জোর চাপ দিয়েছে। গাড়ি ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে।

সেই বড়ঝাড় বিমান বন্দরের মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। সেদিন এখানে এসে যার ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েছিলাম, আজ সেই অমরাবতী-আসামের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে আমাকে। সেদিন এখানে এসে ভাবনাযুক্ত হয়েছিলাম। আজ ভাবনামুক্ত হবার চেষ্টা করছি।

পারি না। আসামের ভাবনা যে আজও আমাকে তেমনি উদ্বেল করে তুলছে। তবে তখন মনে ছিল অদর্শনের বেদনা, আর এখন দর্শনের আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ। যা দেখা হল না, তার জন্য আফসোস করব না। তা জমা রইল আগামীবারের জন্য। হ্যাঁ, আমি আসব বৈকি! আবার আমি ফিরে আসব অমরাবতী-আসামের স্নেহচ্ছায়াতলে।

সেই বড়ঝাড় বিমান বন্দর। গাড়ি থেকে নেমে দেখি, সারা বিমান বন্দর লোকে লোকারণ্য। সোমেশ বলে, "প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানাতে এসেছেন সবাই।"

"আর আপনিও বিদায় নিচ্ছেন আজই।" বৌদি ঠাট্টা করেন।

জনকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ভিড় ঠেলে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-য়ে উঠে আসি। তৃপ্তিবাবু খবর নিয়ে আসেন—প্লেন ছাড়তে দেরি হবে। আগের 'ফ্লাইট' পর্যন্ত যায় নি এখনও।

ভালোই হল, বৌদি ও সোমেশের সঙ্গে গল্প করা যাবে খানিকক্ষণ—আরও কিছুক্ষণ থাকা যাবে আসামের মাটিতে।

মালপত্র জমা দিয়ে আমরা বড় 'হল'-ঘরে এসে বসি। সামনের দেয়ালটা কাচের। বিমানবন্দরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে সমবেত। অনেকে ফুল এবং মালা নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শ্রীশইকীয়া এবং শ্রীনন্দীকেও দেখতে পাচ্ছি। সোমেশ মুখ্যমন্ত্রীকে চিনিয়ে দিল।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রধানমন্ত্রীর বিমান 'রাজদূত'। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। কোনো দরজা জানলা নেই কাচের দেয়ালে, মনে হচ্ছে নির্বাক চলচ্চিত্র দেখছি।

একখানা 'হেলিকপ্‌ট্যার' এলো। উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মাঝে নেমে এলেন শ্রীমতী গান্ধী। তিনি সারিবদ্ধ জনতার সামনে আসেন। হাসি-মুখে সকলের শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যামেরাম্যানরা ক্রমাগত ছবি তুলছেন।

ইতিমধ্যে রাজদূতে সিঁড়ি লাগানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আজ আর গৌহাটি যাবেন না। এমন কি তিনি টার্মিন্যাল বিল্ডিংস-য়ে পর্যন্ত এলেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিদায় সংবর্ধনা শেষ হল। তিনি এগিয়ে চললেন রাজদূতের দিকে।

হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল বিমানবাহিনীর হেলিকপ্‌ট্যারটির দিকে, যে আকাশযান তাঁকে বিগত কয়েকটি দিনে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়েছে। দেখলেন তার চালক এবং কর্মীরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেখানে।

প্রধানমন্ত্রী ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপরে কেউ কিছু বোঝার আগেই

তিনি দৌড়ে গেলেন তাঁদের দিকে। ওঁদের সঙ্গে সারি বেঁধে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাম্যানরা ছুটে গেলেন। তাঁরা কর্মচারীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ছবি তুললেন।

স্মিতহাস্যে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন ইন্দিরাজী। তিনি গিয়ে বিমানে উঠলেন।

আমরা কফি-কর্ণারে আসি। গরম কফি সামনে নিয়ে শুরু হয় গল্প। সময় চলে বয়ে।

সহসা একজন ভদ্রলোক এসে সোমেশকে নমস্কার করে।

"আপনি এখানে!" সোমেশ ইংরেজীতে বলে ওঠে। কিন্তু তারপরে নিজেই উত্তর দেয়, "ও! আজ তো সাংবাদিকদের আসতেই হবে এখানে।"

ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করেন। সোমেশ তাঁর জন্য কফি আনতে বলে। তারপরে পরিচয় করে দেয় ভদ্রলোকের সঙ্গে।—স্থানীয় একটি ইংরেজী কাগজের রিপোর্টার।

আমার পরিচয় পেয়ে খুশি হন ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি সাংবাদিক, সুতরাং পকেট থেকে নোট বই বের করে ফেললেন। কলম খুলে অনুরোধ করেন, "আসাম দেখে ফিরে যাবার সময় আসাম সম্পর্কে কিছু বলে যান।"

কি বিপদ! এ যে প্রায় সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে যাচ্ছে! আমি কি এখনও ভি আই. পি.?

সবিনয়ে ভদ্রলোকের কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করি।

কিন্তু তিনি সাংবাদিক। সুতরাং সুবিধে হয় না অবশেষে নিরুপায় হয়ে বলি, "আমি যে অসমীয়া জানি না।"

"বেশ তো, ইংরেজীতেই বলুন।"

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এসে যায়। বলি, "ইংরেজীতেই যদি বলতে হয়, তাহলে আর নিজের বিদ্যার বহর দেখাবো না। আসাম সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি ভাষণ থেকে খানিকটা

অংশ উদ্ধৃত করছি। ভাষাচার্যের বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।"
"বেশ বলুন।" ভদ্রলোক প্রস্তুত।
আমি বলি, 'Assam, with its chequred history, has taken her share in the evolution of the civilization of India ···And Assam statesmen and scholars are now more than ever before contributing their share and doing thir bit in building up a strong and prosperous and happy India, and in helping to shape her history and in developing, her civilisation in the present world.'*
"শঙ্কুদা!"
কে! চমকে উঠি। পেছনে তাকাই।
না। ভুল করি নি। সে-ই এসেছে।
উঠে দাঁড়াই। বৌদি আর সোমেশও উঠে পড়েছে। আমরা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছি।
সে আসছে। অনেক দূর থেকেই আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে। এখন ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে এদিকে।
সে কাছে আসে। এসেই আমার পাশে বসে পড়ে প্রগতি। সে রীতি-মতো হাঁপাচ্ছে।
একটু দম নিয়ে অভিমানে ভেঙে পড়ে প্রগতি। বলে, "আসার পথে আমাকে নিয়ে এলেন না কেন?"
এমন অভিযোগের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু বলি, "তোমার যে কাল পরীক্ষা। তাছাড়া ভাবলাম, আবার তো আসবই কয়েক মাস পরেই।"
"না, কয়েক মাস পরে নয়, আগামী মাসে।"
সেই এক আবদার। চুপ করে থাকি।

প্রগতি আবার বলে, "কাল তো কথাই বলতে পারলাম না আপনার সঙ্গে। আপনারা আসার পরে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তাই ছুটে গেলাম বৌদির বাড়িতে, দেখা পেলাম না। বলে এলাম, আজ আসার পথে দেখা করতে। ঠিক করলাম, এয়ারপোর্টে আসব।"

"কিন্তু কাল কি তুমি বলে এসেছিলে, আজ আসার পথে আমাদের তোমার ওখানে যেতে!" বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ। আমি তো তা-ই বলে এলাম আপনার লোককে।" প্রগতি উত্তর দেয়।

"অসমীয়াতে বলেছিলে?"

"না। বাংলায় বলেছি।"

বৌদি হেসে ওঠেন। বলেন, "তা-ই গোলমাল হয়েছে। লোকটি সবে গ্রাম থেকে এসেছে, একেবারেই বাংলা বোঝে না।"

"হ্যাঁ, লোকটা আমার সঙ্গে অসমীয়াতে কথা বলছিল। কিন্তু আমি ভাবলাম, বাঙালী বাড়ির চাকর, বাংলা বললে ভালো বুঝতে পারবে।"

আমরা ওর কথা শুনে হেসে উঠি। হাসতে হাসতে বলি, "আসামে আসার পরে এই প্রথম ভাষা-বিভ্রাটের শিকার হলাম।"

"আপনি কোথায় হলেন?" প্রগতি প্রতিবাদ করে, "হলাম তো আমি। আসামের মেয়ে হয়ে অসমীয়া না বলার শাস্তি পেলাম।"

সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। নিশ্চিন্ত হই।

"তুমি কি বাসে এলে?" বৌদি প্রগতিকে প্রশ্ন করে।

সে মাথা নাড়ে। বলে, "আপনাদের আশায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত হস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে একটা রিক্সা নিয়ে চলে-এলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। আজকাল ট্যাক্সির যা ভাড়া!"

"কিন্তু আজ তো এখানকার বাসে বড্ড ভিড়!"

"হ্যাঁ। প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন, বহুলোক এয়ারপোর্টে এসেছেন। বাসে খুব ভিড় ছিল। আগাগোড়া দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছে।"

সত্যই ওকে আজ বড্ড কষ্ট দিয়েছি। ১৪ মাইল পথ, ভিড়ের বাসে

দাঁড়িয়ে এসেছে।

সোমেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। চুপচাপ বসে প্রগতিকে দেখছিল। এবারে কথা বলে সে। প্রগতিকে প্রশ্ন করে, "এখন যে এগারোটা বাজে! তুমি কি জানতে না, শঙ্কুদার ফ্লাইট পৌনে এগারোটায়?"

"জানতাম।"

"দেরি হয়ে যাবার পরেও চলে এলে! প্রধানমন্ত্রী এলেন বলে, নইলে এতক্ষণে শঙ্কুদা তো আকাশে থাকতেন!"

"কি জানি? কেন যেন আমার মনে হয়েছে, আমার সঙ্গে দেখা না করে শঙ্কুদা আসাম থেকে চলে যাবেন না—আমি যে তাঁকে প্রথম আসামে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।"

কি বিস্ময়কর বিশ্বাস। আর সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত সত্যে পর্যবসিত। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই প্রগতি বলে ওঠে, "তাহলে আগামী মাসের শেষদিকে আবার জোড়হাটে আসছেন? দু-ঘন্টা তো সময় লাগে!"

সেই এক কথা। বৌদি ও সোমেশ মৃদু হাসে। আমি চুপ করে থাকি। কি বলব এই অবুঝ মেয়েকে?

আমার মৌনতাকে বোধহয় সম্মতি বলে ধরে নেয় প্রগতি। সোচ্চার স্বরে বলতে থাকে, "আপনাকে নিয়ে আমি আমার পিসীদের বাড়িতে বেড়াতে যাবো—মরিয়ানী, নকছারী আর নাহারকাটীয়ায়, তারপরে কাজিরাঙা। বাবা সব ব্যবস্থা করে···'

'Passengers travelling by I. A. C., Flight number 210 are requested to report at the Security Counter···'

বিমানবন্দরের মাইক গর্জে ওঠে, প্রগতির কথা যায় হারিয়ে।

আমি ওর দিকে তাকাই। চোখের পলকে প্রগতির হাসিভরা মুখখানি ছেয়ে গিয়েছে বিষাদের কালো মেঘে। ওর ঠোঁটদুটি থেকে থেকে থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। নীরব কান্না হতে চাইছে মুখর। অবাধ্য

অশ্রু কালকেরই মতো ওর দু-চোখের কোল বেয়ে কপোল স্পর্শ করেছে।

অবাধ্য কান্না কালকের মতো আমারও বুকের ভেতর থেকে জেগে উঠতে চাইছে। গতকাল জানতাম না আজ আবার দেখা হবে ওর সঙ্গে—আমি থাকব বহুদূরে।

আমাকে উঠে দাঁড়াতে হয়। সবার সঙ্গে সে-ও উঠে দাঁড়ায়। সেই প্রথম দিনের মতো আমার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়।

বৌদি আর সোমেশের চোখেও জল। বৌদি আমাকে বলেন, "কাল বলেছি—স্নেহ অতি বিষম বস্তু। আজ বলছি—স্নেহের ভাষায় সারা দুনিয়া একসূত্রে গাঁথা।"

আমার হাত ছেড়ে দেয় সে। আঁচলে চোখ মোছে। প্রগতিপ্রণাম করে আমাকে।

আমি একখানি হাত দিয়ে একবার ওর মাথা স্পর্শ করি। বলি, "মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিকমতো পরীক্ষা দিও বোন! খুব ভালোভাবে পাশ করা চাই।"

সে মাথা নাড়ে।

মনে মনে জীবন-দেবতাকে বলি—ঠাকুর! প্রগতি যেন ভালোভাবে পাশ করে। সে যেন বড় হয়, সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে।

আমি ওর একখানি হাত ধরে এগিয়ে চলি। সে কোনো কথা বলছে না, আমিও বলার মতো কোনো কথা পাচ্ছি না খুঁজে। আমরা নীরবে পথ চলেছি।

সিকিউরিটি কাউন্টারের সামনে আসি। ওর হাত থেকে হাতখানি নিই। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলি দরজার দিকে।

প্রগতি সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—নিশ্চল ও নির্বাক, নিথর ও নিস্পন্দ, যেন পাথরের মূর্তি।

আমি ভেতরে ঢুকি।

থমকে দাঁড়াই।

প্রগতি ছুটে আসছে। সে দরজার কাছে আসে। সেপাই হাত বাড়িয়ে তার পথরোধ করে।

প্রগতি ঝুঁকে পড়ে। গলা বাড়িয়ে বলে, "শঙ্কুদা, সেই কথাটা মনে আছে তো?"

কোন্ কথা? আমি তার দিকে তাকাই।

সে আমাকে মনে করে দেয়, "দমদমে ল্যাণ্ড করেই একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দেবেন।"

"হ্যাঁ।" আমি ওকে আশ্বস্ত করি। মনে পড়ছে, বাংলা থেকে আসাম রওনা হবার সময় মা আমাকে এই একই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

বিমানে ওঠার সময় আরেকবার দেখতে পেলাম ওদের সেদিন শান্তি-বাবু ও সুশীলবাবু যেখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলেন, ওরাও আজ সেই খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

সেদিন এসেছি, আজ চলে যাচ্ছি। আসা আর যাওয়া নিয়েই জগৎ। তবু মানুষ আসার সময় হাসে, যাবার সময় কাঁদে। সেদিন শান্তিবাবুরা হাঁসছিলেন, আজ প্রগতিরা কাঁদছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে আসি। পেছন ফিরি। একবার ওদের দেখি ভালো করে। আমি হাত নাড়ি। ওরাও হাত নেড়ে সাড়া দেয়।

আমি বিমানের ভেতরে ঢুকি। বড় বিমান, যাত্রী কম। বহু সীট খালি রয়েছে। একটা জানলার ধারে এসে বসি। তৃপ্তিবাবু পাশে বসেন।

উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে আবার টার্মিন্যাল বিল্ডিংস-য়ের দিকে তাকাই। ওদের দেখতে পাচ্ছি না তো! ওরা কি এরই মধ্যে চলে গেল?

কেন? এখনও বিমানের ইঞ্জিন গর্জে ওঠে নি! আমি যে আরও কয়েক মিনিট থাকব আসামের মাটিতে!

"না, না।" তৃপ্তিবাবু বলে ওঠেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন ওদের।

ইসারা করে দেখিয়ে দেন আমাকে। বলেন, "ঐ দেখুন, ছাদে উঠে এদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।"

আমিও দেখতে পাই। কিন্তু আমি যে বিমানে বন্দী! আমি হাত নাড়ব কেমন করে? আমি তাই হাতের চেটো মেলে উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর রাখি। মুখ বাড়িয়ে থাকি।

হ্যাঁ। আমার হাতখানি দেখতে পেয়েছে ওরা, আমাকে দেখতে পেয়েছে ওরা। জোরে জোরে হাত নাড়ছে। আমি ওদের কতো কাছে···কতো দূরে?

বোয়িং ৭৩৭ গর্জে উঠল।

এখুনি সে রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করবে। ওদের সঙ্গে আমার দূরত্ব যাবে বেড়ে। ওরা যাবে হারিয়ে।

আর আমি? আমি আসামের মাটি ছেড়ে আকাশে উঠব। আসামের আকাশ থেকে বাংলার আকাশে পৌঁছব।

অমরাবতী-আসাম! আমি আজ বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু এ বিদায় চিরবিদায় নয়। আমি আবার আসব ফিরে। ফিরে আসব তোমার কোলে।

অমরাবতী-আসাম! তোমাকে প্রণাম। তুমি আমার প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করো।